ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই:

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী

চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র

কাব্যবাণী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব

ভবতোষ দত্ত ডি. লিট
সম্পাদিত

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা ৯ । কলিকাতা ২৯

উ ৎ স র্গ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন

পূজনীয়েষু

সম্পাদকের নিবেদন

এই বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমার অনেক দিন আগে আরব্ধ একটি কর্ম সমাপ্ত হল। আজ থেকে প্রায় চোদ্দ বছর আগে আমি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে কাজ সুরু করি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রবর্তনায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তখন ছিলেন আমার গবেষণানির্দেশক। এতদিন পর এই গ্রন্থ-রচনা যখন সম্পূর্ণ হল, তখন তিনি আর মর্ত্যালোকে নেই।

এই বিষয়ের সূত্রেই ১৯৫৮ সালে আমি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সংগৃহীত কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলাম। এটি আমার মূল পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল না; তবু পুরনো সংবাদপ্রভাকর পত্রিকা পড়তে পড়তে গ্রন্থাকারে অনিবদ্ধ এই লুপ্তপ্রায় মূল্যবান রচনাগুলি উদ্ধার করা কর্তব্য বলেই মনে করেছিলাম। আমার পরম সৌভাগ্য, আমার অধ্যাপক সুশীলকুমার দের মতো পণ্ডিতের নির্দেশ আমি লাভ করেছিলাম। পরে ১৯৬৭ সালে এই বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. লিট ডিগ্রির জন্য গৃহীত হয়। আচার্যদেব আজ লোকান্তরিত। ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে আমার গবেষণা সমাপ্ত করার মুহূর্তে স্বভাবতই এঁদের পুণ্যস্মৃতি আমার কৃতজ্ঞ চিত্তকে পূর্ণ করেছে।

যে-কাজ এতো দীর্ঘকাল ধরে করা হয়েছে, তার প্রত্যাশিত সম্পূর্ণতা ও উৎকর্ষ লাভে বর্তমান গ্রন্থ সমর্থ হয়নি, এ ত্রুটি স্বীকার করতে বাধা নেই। আমি যে অব্যাহত ভাবে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে পারি নি, সেকথা বলা বাহুল্য মাত্র। ইতিমধ্যে আমাকে অন্য নানা কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে। তবে মূল লক্ষ্য হারিয়ে যায় নি। 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' বইটি যখন প্রস্তুত করছিলাম, তখনই অনুভব করেছিলাম যে সাহিত্যিক কৃতিত্বে বঙ্কিমচন্দ্রের সমপর্যায়ের না হলেও ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যজীবনের যে প্রাথমিক যোগ আছে সেটিকে যথাযথভাবে পরিস্ফুট না করলে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাবগত ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ হয় না। এ যোগ যে কেবল সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠায় বঙ্কিমের বাল্যলীলাতেই অবসিত এবং বিস্মৃত তা নয়, বঙ্কিম বাংলাদেশের যে নবীন চিন্তাধারার নায়কতা করেছিলেন তাও আভাসিত ছিল ঈশ্বর গুপ্তের কর্মে ও কীর্তিতে। নতুন যুগের ধর্ম রাজনীতি সাহিত্য ও ভাষা-

চিন্তা প্রভৃতি তাঁর রচনায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। কোনো কোনো দিক দিয়ে বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংবাদপ্রভাকরের মিল ছিল। অথচ পুরনো বাংলার প্রতিও ঈশ্বর গুপ্তের ছিল মমত্ববোধ এইজন্য সাহিত্যে ও সমাজে তাঁর ভূমিকা হয়েছে বিচিত্র রকমের।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাসংগ্রহের ভূমিকায় সাহিত্যশিক্ষাগুরুর জীবনী ও কবিত্ব আলোচনা করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে বঙ্কিমের এই মূল্যনির্ণয়ই আজ পর্যন্ত মূলত গ্রাহ্য। দ্বিতীয়ত সমালোচনার উচ্চ আদর্শ হিসাবে এই রচনাটি বাংলা সাহিত্যের অগ্রগামী তো বটেই একটি শ্রেষ্ঠ রচনা বলেও গণ্য হওয়ার যোগ্য। এই মূল্যবান রচনাটিকে অবলম্বন করেই ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে আমার সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য ও চিন্তাকে সমাহৃত ও বিন্যস্ত করে দিলাম। আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনীর সঙ্গে এই বইটি মিলিয়ে দেখলেই এই বিচিত্র ব্যক্তিটির একটি পূর্ণ রূপ আপাতত পাওয়া যাবে বলে মনে করি।

বঙ্কিমের এই লেখার বৈশিষ্ট্য এই যে এতে ঈশ্বর গুপ্তের যুগটি অপেক্ষাকৃত গৌণ হয়ে ব্যক্তিটি হয়েছে উজ্জ্বল। বঙ্কিমের উদ্দেশ্য অবশ্য তাই, কিন্তু যুগের পটটি সম্পূর্ণ হলে ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়টি আজকের পাঠকের কাছে স্পষ্টতর হবে সন্দেহ নেই; সম্পাদনার সময় সেই দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। হিন্দু কলেজের সঙ্গে তাঁর বিরোধে, নানা সভাসমিতির সঙ্গে তাঁর যোগের বিবরণে, কবির দলে তাঁর সোৎসাহ গান বাঁধায়, কবিতা প্রতিযোগিতা ও কবিতাযুদ্ধ প্রবর্তনে— ঈশ্বর গুপ্তের জীবনকাহিনীতে সেকালের কলিকাতার একটি কলরবমুখর চিত্র আমাদের কাছে ফুটে ওঠে। বলা প্রয়োজন সেকালের কলিকাতার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এখানে দেওয়া হয় নি। ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে যোগ ছিল এমন সব ঘটনাই একমাত্র উল্লিখিত হয়েছে। সাধারণভাবে রক্ষণশীল বলে পরিচিত ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে নব্যবঙ্গের সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা এবং কিশোরীচাঁদ মিত্রের একেশ্বরবাদী সভা হিন্দু থিয়ফিলানথ্রপিক সভার যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল—এই তথ্য এবং অনুরূপ অন্যান্য তথ্য কি ঈশ্বর গুপ্তকে নতুনভাবে যথার্থ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিকায় স্থাপন করবে না? দ্বারকানাথ অধিকারী এবং কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী কি বাংলা সাহিত্যের একটি অলক্ষিত কোণেও স্থান পাবেন না? এ ধরণের নানা সংবাদ যা পাওয়া গিয়েছে সে-সবই যথাসাধ্য সাজিয়ে দিলাম। জানি না সাহিত্যবিধাতা এর কতোটুকু গ্রহণ করবেন।

'ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব'র লেখক একজন অসামান্য স্রষ্টা সাহিত্যিক। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনাপদ্ধতির বিশ্লেষণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়েছে ভূমিকায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণই জীবনচরিতকে তথ্য-তালিকা মাত্রে পর্যবসিত না করে রক্তমাংসের মানুষের ঘনিষ্ঠ কাহিনীতে পরিণত করেছে। জীবনচরিত হিসাবে রচনাটির অনন্যসাধারণত্ব এবং সমালোচনা-তত্ত্বের নতুন রীতির প্রবর্তন — এই দুই দিক দিয়েই এর মহত্ত্ব অবশ্যস্বীকার্য। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনকাহিনী সম্পাদনা করা হয়েছে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের সতর্ক বিশ্লেষণের দায়িত্ব আশা করি উপেক্ষিত হয় নি।

বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্তদিলীপকুমার বিশ্বাস আমাকে হিন্দু থিয়ফিলানথ্রপিক সোসাইটির দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধ-সংকলনখানি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীযুক্তঅমল ভট্টাচার্যের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বাল্যরচনার ইংরেজি মূল নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছি। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের সৌজন্যে দীনেশচন্দ্র সেনের একটি পুরনো রচনার সন্ধান পেয়েছি। আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীহারাধন দত্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে দিয়ে আমার ত্রুটি নিরসনে সাহায্য করেছেন। বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি সাহিত্যসাধকদের জীবনী উদ্ধারকার্যে তাঁর প্রয়াস ইতিমধ্যেই সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায়ের সাগ্রহ সহযোগিতাও আমার শ্রম লাঘবে সহায়তা করেছে।

এই প্রসঙ্গে দিল্লির ন্যাশনাল আরকাইভস্-এর ডেপুটি ডিরেকটর শ্রীযুক্ত সৌরীন রায় এবং পশ্চিমবঙ্গের স্টেট আরকাইভস্-এর সহ-অধিকর্তা শ্রীযুক্ত তড়িৎ-কুমার মুখোপাধ্যায় আমার অনুরোধে পুরাতন তথ্য সন্ধানে যে পরিশ্রম স্বীকার করেছেন তাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। বারাসত সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চন্দ মহাশয় আমার অনুরোধে পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে স্কুলের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের সংযোগের (বর্তমান বইয়ের ১২৬ পৃ) প্রমাণ উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। দুঃখের বিষয় সে-সময়ের কোনো দলিল পাওয়া যায় নি বলে তিনি জানিয়েছেন।

বর্তমান সম্পাদনা-কার্যে আমি প্রধানত ব্যবহার করেছি প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রন্থাগারের 'কবিতাসংগ্রহ' বইটি। কিন্তু বইটি জীর্ণ হওয়ায় এর আখ্যাপত্রের চিত্রটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সেমিনার গ্রন্থাগারের বই থেকে গৃহীত হল। রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

মহাশয়ের আনুকূল্যে বইখানি পেয়েছি এবং যাদবপুর প্রিন্টিং টেকনলজি বিদ্যায়তনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন সেন ছবিটি নিপুণভাবে তুলে দিয়েছেন। দ্বারকানাথ অধিকারীর 'সুধীরঞ্জন' বইখানি অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। আমার স্নেহ-ভাজন ছাত্র বর্তমানে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুধীর চক্রবর্তী ওই কলেজের গ্রন্থাগার থেকে বইটি আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরের শ্রীসত্যেন মণ্ডল এই বইটির বাংলা এবং ইংরেজি দুটি আখ্যাপত্রেরই ছবি তুলে দিয়েছিলেন। এখানে একটিই মুদ্রিত হল।

এই গ্রন্থের নির্দেশিকা প্রস্তুত করার কাজে আমার ছাত্রী কল্যাণীয়া শ্যামলী মুখোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ সাহায্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীগার্গী দত্ত এবং কন্যাদ্বয় শ্রীমতী কাকবাকী এবং শ্রীমতী বিপাশার সহযোগিতায় এই কাজটি যথাসাধ্য সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও বইতে দু-একটি মুদ্রণ-প্রমাদ পরিহার করা যায় নি। ২০৯ পৃষ্ঠায় ১৫৬ সংখ্যক পাদটীকায় নরনারীর পরিবর্তে নরনারী ছাপা হয়েছে। প্রথম সংস্করণ বোধেন্দুবিকাশের আখ্যাপত্রে বানান ছিল 'বোধেন্দুবিকাস'। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত অন্যত্র বোধেন্দুবিকাশ লিখেছেন অতএব এই বানান ইচ্ছা করেই রাখলাম।

শ্রীভবতোষ দত্ত

সূচি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ যখন প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের একটি পর্ব শেষ হয়েছে। তিনি তখন ধর্ম ও তত্ত্বালোচনায় মনোনিবেশ করেছেন। যে-কয়টি উপন্যাস তিনি লিখেছেন, তাও তত্ত্বচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। এই সময়ে তিনি তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যগুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহ এবং কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র চাকরিসূত্রে হাবড়াতে ছিলেন। এখানে থাকবার সময়েই তিনি তাঁর জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত প্রচার এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত নবজীবন পত্রিকায় হিন্দুধর্ম বিষয়ে রচনাগুলি প্রকাশ করেন। প্রচারে বের হয় সীতারাম এবং নবজীবনে বের হয় ধর্মতত্ত্ব। প্রচারে ধারাবাহিক ভাবে কৃষ্ণচরিত্রও বের হতে থাকে। তাছাড়া বঙ্গদর্শন থেকে পুনর্মুদ্রিত হয় মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত। অংশত প্রকাশিত দেবী চৌধুরানীও সম্পূর্ণ হয়ে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র তখন বিশুদ্ধ আর্ট রচনা ছেড়ে মানুষের ধর্মনীতি ও কর্মনীতি নিয়ে দুরূহ দার্শনিক আলোচনায় মগ্ন। এই সময়ে রচিত 'ধর্ম ও সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি বলছেন,

'সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে, কিন্তু যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে। কেন না সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। যদি এমন কুসাহিত্য থাকে যে তাহা অসত্যমূলক ও অধর্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা একাংশ মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্ত্বের অংশ এই সাহিত্য সেই ধর্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।'[১]

---

১ প্রচার ১২৯২ পৌষ

ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই সময়ের চিন্তার প্রতিফলন দুর্লক্ষ্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত ঈশ্বর গুপ্তের এই জীবনীতে দুটি প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়: একটি ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী থেকে কিছু শিক্ষা পাওয়া, দ্বিতীয় ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার প্রকৃষ্ট মূল্য নিরূপণ করা। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার মূল্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামতে বিশেষ পরিবর্তন কখনও হয়েছিল বলে মনে হয় না। ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম আলোচনা করেছিলেন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় Bengali Literature প্রবন্ধে।[২] তখন ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর বারো বছর মাত্র অতিক্রান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন

> As a writer of light satiric verse, he occupies the first place, and he owed his success both as a poet and as an editor to this special gift. But there his merits ended. Of the higher qualities of a poet he possessed none, and his work was extremely rude and uncultivated. His writings were generally disfigured by the grossest obscenity. His popularity was chiefly owing to his perpetual alliteration and play upon words. We have purposely noticed him here in order to give the reader an idea of the literary capacity and taste of the age in which a poetaster like Iswar Chandra Gupta obtained the highest rank in public estimation.

ব্যঙ্গপরায়ণতা, অশ্লীলতা এবং শব্দক্রীড়া— এই তিনটি মূল বক্তব্য অবলম্বন করেই বর্তমান আলোচ্য প্রবন্ধটি তিনি লিখেছেন। কবিত্ব আলোচনার সূচনাতেই তিনি সৃষ্টিপ্রতিভার অভাবের কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করেছেন, এ-কথা তিনি ইংরেজি রচনাটিতেও আভাসে বলেছেন এবং দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব বিষয়ক পরবর্তী রচনাটিতেও (১৮৮৬) লিখেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত যে তাঁর যুগেরই সৃষ্টি, তাঁর কবিতায় অশ্লীলতা যে যুগেরই প্রভাব— এ-কথা কাব্য আলোচনাপ্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দোষমুক্ত করেছেন, কিন্তু ইংরেজি প্রবন্ধে তিনি তা করেন নি। ইংরেজি প্রবন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গকেও বিশ্লেষণ করে দেখেন নি। বাংলা প্রবন্ধে তাকে বলেছেন বিদ্বেষহীন এবং খাঁটি

২ এই প্রবন্ধটি কবিচরিতের (১৮৬৯) সমালোচনাসূত্রে লেখা হয়েছিল। মনে হয় কবিচরিতে প্রকাশিত ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যসমালোচনায় তুষ্ট না হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই তীব্র কথাগুলি লিখেছিলেন। কবিচরিতের 'আলোচনা' পরে দ্রষ্টব্য।

দেশীয়। কবিওয়ালাদের সঙ্গে তুলনা করে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গের এই প্রকৃতিকে বুঝিয়েছেন।

ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের সম্বন্ধে বঙ্কিম যে সমালোচনা করেছেন, বাংলায় লেখা ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিতের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখলে নিঃসংশয়ে বলা যায় পরবর্তী প্রবন্ধে সাহিত্যবিচার অনেক গভীরতা অর্জন করেছে, যদিও মূল বক্তব্যের হয়তো খুব পরিবর্তন ঘটে নি। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যকে আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝবার, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার এবং কার্যকারণের যুক্তিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস সুস্পষ্ট।

এ-কথা মনে হতেই পারে যাঁর কবিতাই সরস্বতীর শ্রেষ্ঠ প্রসাদ থেকে বঞ্চিত, তাঁর কাব্যের এত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং তাঁর জীবনচরিত রচনা করবার দরকারই বা কি? ইংরেজি প্রবন্ধে তিনি সোজাসুজি বলছেন,

> A dozen years have not elapsed since Iswar Gupta lived, yet we speak of him as belonging to a past era.[৩]

— সেই ঈশ্বর গুপ্তেরই জীবনচরিত এবং কবিত্বের নিপুণ সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রবৃত্ত হয়েছেন আরো প্রায় পনেরো বছর পরে। ত্রিশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বিশুদ্ধ রসের কারবারী, স্পর্শকাতর, মতামতে কিছু উগ্র, নবলব্ধ মহৎ ইংরেজি সাহিত্যের রসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলতে গেলে

ছিলাম সে দিন স্নেরস্মিত
উচ্চকণ্ঠ, ধর্মে অবিশ্বাসী, গর্বস্ফীত
উচ্ছৃঙ্খল। আজি হইয়াছি চিন্তানত,
জীবনের গূঢ়তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নিয়ত।[৪]

৩ জন বীমস-এর মত বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়—

A species of Fescennine verse called *Kavi* (probably for Kabit) was also highly popular in the last generation; these verses were recited by two companies of performers; who lavished the most pungent abuse and satire on each other, to the great delight of their audience. Following upon the poets of their school comes Iswar Chandra Gupta, a sort of Indian Rebelaise who enjoyed considerable reputation fifty years or even less ago. But Bengal has advanced so fast during the last generation that all these old-world authors are already left far behind in the dimness of a premature antiquity.

— A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, Vol I, 1872,

৪ 'সমুদ্র', ত্রিবেণী (১৯১২)

বঙ্কিমচন্দ্রও এখন হয়েছেন 'চিন্তানত, জীবনের গূঢ়তত্ত্ব জিজ্ঞাসু'। তাঁর ধর্মতত্ত্ব 'এই জীবন লইয়া কি করিব' এই মৌলিক প্রশ্ন নিয়েই লেখা। শুধু জীবন-যাপন নয় জীবনের অর্থ সন্ধান, শুধু রসাস্বাদের বর্ণনা নয় তার বিশ্লেষণ বঙ্কিমের এই যুগের রচনার বড়ো লক্ষণ। এ সময়ের লেখা উপন্যাস আনন্দমঠ সীতারাম দেবী চৌধুরানীতেও তত্ত্বজিজ্ঞাসার ছায়া আছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাসংকলন ও কবিত্ব সমালোচনা বঙ্কিমের এই সময়ের প্রধান সাহিত্যকর্মধারায় পড়ে না। কারণ সাহিত্যের চেয়েও বড়ো জিনিসের আলোচনায় তিনি তখন ব্যাপৃত। সম্ভবত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ প্রবর্তনায় তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যগুরুর জীবনী আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তখন সে-আলোচনার ভঙ্গি গেল বদলে। ঈশ্বর গুপ্তকে তিনি কেবল একজন সাধারণ কবি বা সাহিত্যিক হিসাবে দেখলেন না; তাঁর জীবনীতে তিনি গূঢ় তাৎপর্য দেখতে পেলেন যেগুলি থেকে বাঙালি পাঠক শিক্ষণীয় বিষয় পাবেন— সে শিক্ষা শুধু সাহিত্যের শিক্ষা নয়— জীবন-যাপনের শিক্ষা। এই আদর্শ ও কর্তব্যনীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বঙ্কিম করেছেন এ-সময়ের প্রধান রচনাগুলিতে।

কবিজীবনী কবিচরিত জীবনচরিত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ সম্পাদনা উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যা করছিলেন— জীবনী-রচনা, কবিত্ববিচার এবং কবিতাসংকলন— সে-কাজ বস্তুত তাঁর সাহিত্য-শিক্ষাগুরুর আরব্ধ কাজের অনুবর্তন ছাড়া কিছু নয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্তে'র ভূমিকায় ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন,

'ইহার পূর্বে কোন মহাশয় এতদ্দেশীয় কোন কবির জীবনচরিত প্রকাশ করেন নাই— এবং এতৎ প্রকাশের কি ফল তাহাও কেহ জ্ঞাত হয়েন নাই— আমরা প্রথমেই ইহার পথপ্রদর্শক হইলাম।'

ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠায় কবি ও কবিওয়ালার জীবনী ও কাব্য-সংকলন করে যে পথ প্রদর্শন করলেন বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সেই পথেরই পথিক। ঈশ্বর গুপ্ত আশঙ্কা করেছিলেন পুরনো বাংলা গান, যার সঙ্গে তাঁর নিজের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ— সেই গানগুলি নতুনতর রুচিতে অনাদৃত হয়ে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, তাদের রচয়িতারাও ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছেন। এই সাহিত্যসম্পদগুলির প্রতি মমতাবশত ঈশ্বর গুপ্ত এগুলির সংরক্ষণে উদ্যোগী

হয়েছিলেন। লুপ্ত যদি তারা কালের নিয়মে হয়েই যায় তবু তাদের ইতিহাস থাকবে— এই ছিল তাঁর আশা। এই মমতা এবং ইতিহাস-চেতনা ছিল ঈশ্বর গুপ্তের প্রয়াসের মূলে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনিও বলতে পারতেন,

'বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভাল বাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিসগুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ।'[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো দ্ব্যর্থহীন সাহিত্যিক ভাষায় ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর মনোভাব প্রকাশ করে বলতে পারেন নি বটে, কিন্তু তাঁর জীবনী-সংগ্রহের বহু স্থলেই তাঁর এই আশা এবং বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। ইংরেজি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন ঈশ্বর গুপ্তকে লোকে ভুলে যেতে বসেছে, বাংলা প্রবন্ধে তিনি তাঁর চরিত রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের কবিজীবনী এবং বঙ্কিমচন্দ্রকৃত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতের মধ্যে আর একখানি বইয়ের উল্লেখ অবশ্যকর্তব্য।

কবিজীবনী রচনার আদর্শ অনুসরণ করেই ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কবি হরিশচন্দ্র মিত্রের কবিকলাপ প্রকাশিত হয়। কিন্তু কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিচরিতে। কবিচরিতে সাত জন কবির জীবনচরিত ছিল, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায়, মদনমোহন তর্কালংকার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

কবিচরিতে প্রকাশিত ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের তুলনা করে দেখলে কিছু কিছু ঐক্য এবং বিপুল অনৈক্য চোখে পড়ে। কবিচরিতের দশ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের জীবনের কয়েকটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। বাল্যকালের বর্ণনায় হরিমোহন লিখেছেন—

'বাল্যকালে ঈশ্বরচন্দ্র কোন বিখ্যাত বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই, সুতরাং পরিণামে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভোপযোগী কোন সংস্থানই ছিল না কিন্তু শৈশবাবধি কবিতারচনাবিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সেই অনুরাগ বলেই তিনি পরিণামে দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বশক্তির পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। এরূপ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে যখন কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার মাতুলালয়ে বাস করেন, সেই সময়ে নিম্নলিখিত দুই পংক্তি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—

রাতে মশা দিনে মাছি
এই নিয়ে কলকাতায় আছি।

এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার নৈসর্গিক রচনাশক্তি পরিবর্ধিত হইয়া উঠে। যৌবনকালে তাঁহার সেই কবিত্বশক্তির প্রতিভা প্রভাবশালিনী হইলে সকলেই তাঁহাকে দৈবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া জ্ঞান করিত।'

বাল্যকালের আর যে-সব কিংবদন্তী, ঘটনা, মাতৃবিয়োগ, বিমাতাসম্ভাষণ, বিবাহ, রোমান্স প্রভৃতির বিবরণ বঙ্কিম দিয়েছেন, হরিমোহনের রচনায় তার কোনো উল্লেখ নেই। ঈশ্বর গুপ্ত-পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির কথা, গৌরীশংকরের সঙ্গে বিবাদ ও অশ্লীলতার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। এ ছাড়া কবিওয়ালাদের জীবনী-সংকলন প্রবোধপ্রভাকর হিতপ্রভাকর বোধেন্দুবিকাশ এবং ভারতচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্তের কথাও হরিমোহন বলেছেন ; সেই সঙ্গে কলি নাটক নামে একখানি অসমাপ্ত অভিনব নাটকের কথাও তিনি বলেছেন। এটা শেষ বয়সের রচনা, সম্পূর্ণ হবার আগেই ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হয়।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার যেটুকু সমালোচনা কবিচরিতে আছে, বলা বাহুল্য, তা নেহাৎই অপ্রচুর এবং অগভীর। বঙ্কিম-কৃত সমালোচনা এর থেকে কত এগিয়েছিল সেটা বোঝা সহজ হবে বলে কবিচরিতের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্‌ধৃত করলাম—

'তিনি অতি উত্তম গীত রচনা করিতে পারিতেন। হাপ-আকড়াই দলে উত্তর প্রত্যুত্তর বাঁধিতেন, অতম্ভিন্ন [sic] অনেক পাচালীওয়ালারাও তাঁহার নিকট হইতে নূতন পালা বাঁধিয়া লইত। কবিতা রচনায় তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, একেবারে অবিশ্রান্ত লিখিয়া যাইতেন, একবার লিখিলে আর সংশোধন করিবার আবশ্যকতা হইত না। তাঁহার কবিতা পাঠ করিলে বোধ হয় যেন ঐ সকল তাঁহার রসময়ী লেখনী হইতে অনর্গল বহির্গত হইয়াছে, কোন স্থান ভাবিয়া লিখিতে হয় নাই। গুপ্ত কবি নানাবিধ নূতন ছন্দের সৃষ্টি ও নামকরণ করিয়া গিয়াছেন। যথা বীরবিলাসিনী, তরঙ্গলহরী, প্রকৃতি, রণরঙ্গিণী, সুরঞ্জিকা উন্মাদিনী, মোহিনী, পঞ্চাল, সুধাতরঙ্গিণী, মালতীমালা, চপলাগতি, আমোদ্বিনী, শাসক, সেফালিকা, হিল্লোল, স্বেচ্ছা ইত্যাদি। এই নামগুলি তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত। তাঁহার রচনামধ্যে অনেক স্থলেই অনুপ্রাসচ্ছটা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রচনা সম্পূর্ণরূপে সুললিত ও প্রাঞ্জল। হাস্যরস বর্ণনায় তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবান কবি বঙ্গদেশে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই, যেথানে পরিহাসাদি

প্রমোদকর বিষয় পাইয়াছেন সেইখানেই রচনায় একশেষ করিয়াছেন। স্বভাব-বর্ণনে যেমন কবিকঙ্কণ পরমার্থ কালী বিষয়ে যেমন কবিরঞ্জন আদিরসে যেমন রায়গুণাকর স্ব স্ব উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন হাস্যরসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তেমন অদ্বিতীয় ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি অন্যান্য রসবর্ণনায় বিষয়ে তদনুরূপ ক্ষমতাশালী হইলে বঙ্গদেশে কবিকুলচূড়ামণি হইতেন সন্দেহ নাই। অন্যান্য রসাত্মক কবিতা যদিও তাদৃশী মনোহারিণী হইত না, তথাপি তাহা যে কবিলেখনীপ্রসূত ইহা পাঠমাত্র প্রতীত হয়। ঈশ্বর ও ধর্মবিষয়ে যে সকল শাস্ত্ররসাশ্লিষ্ট কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাদৃশ গাম্ভীর্য দেখা যায় না। তাঁহার কবিত্বশক্তির অনুযায়ী বিদ্যাবত্তা থাকিলে বোধহয় এরূপ দোষ ঘটিত না; তদংশে তিনি পূর্ববর্ত্তী অধিকাংশ কবিগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি একজন প্রকৃত কবি ছিলেন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার গ্রন্থে যে সকল গদ্য আছে তাহার এমন কোন গুণ নাই যে তদ্দ্বারা বিশেষ প্রশংসা-ভাজন হইতে পারেন।'

কবিচরিতের কয়েকটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের মিল লক্ষণীয়। ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা শিক্ষার অভাবে অসম্পূর্ণ, বঙ্কিমচন্দ্রের এই মতটি কবিচরিতেও দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের মতো হরিমোহনও মনে করেন ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কবিতায় গভীরতার অভাব আছে। কবিচরিতের লেখক ঈশ্বর গুপ্তকে হাস্যরসের কবি বলেছেন, বঙ্কিম বলেছেন ব্যঙ্গের কবি। কবিতার একটা শ্রেণী হিসাবে ব্যঙ্গ বাংলাভাষায় প্রচলিত ছিল না— কবিচরিতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত রচনাকালে যেমন অধিকতর তথ্যের সংকলন করেছেন, তেমনি তথ্যগুলিকে তাঁর জীবনের গূঢ়তর অভিপ্রায়ের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করে দেখিয়েছেন। কবিচরিতকার কয়েকটি ঘটনামাত্র সংগ্রহ করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনাগুলিকে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বের দ্যোতক হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত যুগস্রষ্টা নন, যুগের ফল; কিন্তু শুধু সেইটুকু হলে তাঁর জীবনবৃত্তান্তের কোনোদিক দিয়ে চিত্তাকর্ষকতা থাকত না। বস্তুত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে একটি প্রতিভার বিকাশের কৌতূহলোদ্দীপক তাৎপর্যই বঙ্কিমকে আকর্ষণ করেছিল। তিনি এই জীবনকাহিনীতে অনেক অর্থ খুঁজে পেলেন, যা দিয়ে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের জীবন-বৃত্তান্তকে বিশেষভাবে বিন্যস্ত করলেন। কবিচরিতকার ঈশ্বর গুপ্তের ভাবজীবন আবিষ্কার করতে পারেন নি, সাহিত্যরীতি, ধর্মনীতি, দেশবাৎসল্য, রাজনীতি

প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে তাঁর চিন্তামূল্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যেমন ধরা দিয়েছিল হরিমোহনের কাছে তেমন করে ধরা দেয় নি।

ব্যক্তির অন্তর্জগৎকে ফুটিয়ে তুলবার যে নৈপুণ্য বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, ঈশ্বর গুপ্ত বা হরিমোহন কেউই জীবনচরিত রচনাকালে সেই শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নি*। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে চরিতরচনায় আধুনিক পদ্ধতির অনুসরণ করছিলেন। বস্তুত এ বিষয়ে তাঁর আদর্শ সম্ভবত ছিল জনসনের Lives of the most Eminent English Poets (১৭৮১)। এই জীবনচরিতগুলি কেবল ঘটনার তালিকা নয়, ব্যক্তির রূপটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা। এই ব্যক্তি দোষ-গুণে যেমনই হক, চরিত-রচনাতে তাকে নিষ্ঠার সঙ্গেই উপস্থাপিত করতে হবে। জনসন বলেছিলেন, মৃতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে, তা বলে জ্ঞান ধর্ম এবং সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের কম নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিতে এই মনোভাব সুস্পষ্ট। স্পষ্টতই দেখা যায়, ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেকালের রুচি ইত্যাদি কতকগুলি জিনিস তিনি পছন্দ করেন নি, কিন্তু সেজন্য অসহিষ্ণুতা প্রকাশ না করে তিনি শ্রদ্ধাভরে বিচার করেছেন, তবু ধর্ম ও সত্যের খাতিরে এগুলিকে মেনেও নিতে পারেন নি।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয়ও স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের একটি জীবন্ত চরিত্রই রচনা করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে জনসনের থেকে তাঁর উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল না। সেইজন্য ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে ঈশ্বর গুপ্তের চরিত্রের এবং আচরণের নানা উল্লেখের দ্বারা তাঁকে ইতিহাসের মানুষ অপেক্ষা একটি সজীব মানুষরূপেই এঁকে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দর্শনের চিত্রটি যেমন উজ্জ্বল করে রেখেছেন বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিকে উজ্জ্বল রেখেছেন। এ বিষয়ে জনসনের উদ্দেশ্য ও বঙ্কিমের উদ্দেশ্য অভিন্ন—

> History may be formed from permanent monuments and records, but 'lives' can only be written from personal knowledge.

জীবনচরিতের বিন্যাসরীতি

ঈশ্বর গুপ্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেই একই ধরনের কাজে প্রবৃত্ত হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনাপদ্ধতি নিপুণতর। তাঁর বিষয়বিন্যাস সুপরিচ্ছন্ন, তাঁর

* যদিও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে জীবনচরিত রচনার একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠছিল। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, 'বাংলা চরিত-সাহিত্য' ১৯৬৪।

সমালোচনাবুদ্ধি প্রখর। ঈশ্বর গুপ্ত কবিদের সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তথ্যবিচার করেছেন, কিন্তু তাঁর রচনায় বিন্যাস নেই, পরিবেশনে কোনো সুচিন্তিত ভাগ নেই। তিনি শুধু ঘটনা এবং গানই সংকলন করেছেন কিন্তু এগুলিকে কোনো অন্তর্লীন যুক্তির দ্বারা গেঁথে পাঠকের মনে কোনো ধারণা তৈরি করতে পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র ছেচল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী রচনাটিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। 'উপক্রমণিকা'য় (পৃ ১-৩) তিনি ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী ও কবিতাসংগ্রহের কারণ বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি জীবনীর তাৎপর্য কিছু বলেন নি, শুধু খাঁটি বাঙালী মনোভাবের প্রকাশক বাংলা কবিতাকে নব্য কবিতার যুগে পুনঃপ্রচারিত করার আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করেছেন। জীবনীর তথ্যসংগ্রাহক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে তিনি অকুণ্ঠ ঋণ স্বীকার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন 'গোপালচন্দ্রের নোটগুলি এরূপ পরিপাটী যে আমি তাহাতে কাটাকুটি বড় কিছু করি নাই, কেবল নিজের বক্তব্যের সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছি।' এই উক্তি বিশেষ অর্থপূর্ণ। নিজের বক্তব্য থাকাতে তথ্যগুলি অর্থমণ্ডিত হল এবং তাতে একটা দৃষ্টিভঙ্গি এল। এই পরিবর্তন গুরুতর। প্রত্নতাত্ত্বিকের সঙ্গে যুক্ত হল শিল্পী।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগ 'বাল্য ও শিক্ষা' (পৃ ৪-১১)। বিশেষ ভাবে এই প্রথম পরিচ্ছেদটিতেই তিনি নিজের বক্তব্য জুড়ে দিয়েছেন। কলকাতায় স্থায়িভাবে বাস করার পূর্ব পর্যন্ত ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভাবিকাশের পটভূমি এই পরিচ্ছেদটিতে বর্ণিত। দরিদ্র পরিবারের সন্তান ঈশ্বর গুপ্তের জীবনে বস্তুত এসময়ে তেমন কিছু চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে নি। পিতা তাঁর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন নি; তাঁর স্বভাবটিও ছিল দুরন্ত, সাহস ছিল দুর্জয় এবং মনটি ছিল সরল। স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর ছিল। তাঁর স্বভাবে এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যেগুলি উপযুক্ত শিক্ষা এবং অনুকূল সুযোগের সহায়তা পেলে ঈশ্বর গুপ্ত একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারতেন। কিন্তু তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো হতে না পারলেও সমাজে তিনি যেটুকু শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করেছিলেন সে সম্পূর্ণই তাঁর নিজের চেষ্টায়। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনের এই ক্রমপ্রতিষ্ঠালাভের সূত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনাচয়নের দ্বারা স্পষ্ট করে তুলেছেন। সুতরাং পরবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত কর্মজীবনের যে মানস বৈশিষ্ট্য সক্রিয় ছিল তার প্রাথমিক বিবরণ পাচ্ছি এখানে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদে ঈশ্বর গুপ্তের জীবনের আর-একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যা তাঁর কবিতার প্রকৃতিকেই নিয়ন্ত্রিত করেছিল। তাঁর বিবাহ-জীবন সুখের হয় নি; তাছাড়া ছিল অচরিতার্থ ভালোবাসার দুঃখ। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র একটি অপূর্ব মন্তব্য করেছেন যা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কবিই করতে পারেন।—

'যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে-আগুন তাঁহার [দুর্গামণির] হৃদয়ে ছিল কিনা জানি না। ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল— কবিতায় দেখিতে পাই। অনেক দাহ করিয়াছে দেখিতে পাই। যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই।'

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বর গুপ্তের জীবনের এই শূন্যতাই তাঁর কবিতার ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক মনোভাবের জন্য দায়ী। জীবনদেবতা তাঁকে শ্রেষ্ঠ সম্পদেই বঞ্চিত করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের তৃতীয় ভাগ 'কর্ম' (পৃ ১২-২৭)। এই পরিচ্ছেদটি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন 'গোপালবাবুর নোটগুলি বজায় রাখিয়াছি— আর কিছুই গাঁথিতে হয় নাই।' এই পরিচ্ছেদে বিশেষভাবেই পরিচয় দেওয়া হয়েছে ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনা-কীর্তির। তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যকীর্তি, ভ্রমণকাহিনী, কবির দলে এবং সভাসমিতিতে যোগ, শিষ্যসম্প্রদায়গঠন, কবিতাযুদ্ধ প্রভৃতির তথ্যগত বিবরণ এতে পাই। ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে বঙ্কিমের নিজের যোগের বিবরণ তিনি দিয়েছেন সবশেষে। তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয়ের উজ্জ্বল বর্ণনা পাঠকের চিত্তপটে মুদ্রিত হয়ে থাকবার যোগ্য।

বস্তুত ১৮৩০ থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতায় ঈশ্বর গুপ্তের জীবনকালটি বাংলা দেশের আধুনিক যুগের আরম্ভকাল। সে যুগে অনেকগুলি আন্দোলন বাংলা দেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। হিন্দু কলেজ ও নব্যবঙ্গের আন্দোলন দিয়ে বাংলাদেশে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটল। এই ঘোর সামাজিক সংঘর্ষে ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কিছু ভূমিকা ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সে-সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নি। অতঃপর সাধারণজ্ঞানোপার্জিকা সভা তত্ত্ববোধিনী সভা এবং হিন্দু থিয়ফিলানথ্রপিক সভা ধর্ম শিক্ষা এবং রাজনীতিতে বাংলাদেশের প্রগতিমূলক ভাবধারাকে খরতর করে তোলে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ্রীষ্টধর্মান্তরণবিরোধী আন্দোলনও এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইংলণ্ড থেকে জর্জ টমসন এসে এ দেশের নব্যদলকে রাজনৈতিক চেতনায়

উদ্বুদ্ধ করে তুললেন, এই ঘটনারও সুদূরপ্রসারী ফল ছিল। ১৮৫০ থেকেই স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন, ধর্মান্তরিতগণের পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের লেক্স লোসাই আইন কলকাতার সমাজে যথেষ্ট আলোচনার সৃষ্টি করে, হিন্দু কলেজের প্রেসিডেনসি কলেজে রূপান্তরণও একটি স্মরণীয় ঘটনা। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও আইন পাশের গুরুত্ব কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার করে না। তারপরেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুপরিচিত সর্বজ্ঞাত সিপাহি-বিদ্রোহ এবং নীলকর-হাঙ্গামা।

ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এইসব অতি গুরুতর ঘটনাগুলির কোনো উল্লেখই করেন নি। অথচ ঈশ্বর গুপ্ত এমন একটি কাজে জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন— একটি প্রতিপত্তিশালী সংবাদপত্রের সম্পাদনায়, যাতে এই সব ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী[৬]। সেই সূত্রে ঈশ্বর গুপ্তের মতামতের গুরুত্বও কম ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনকাহিনীতে এই ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত থাকলে এই রচনাটির প্রকৃতিই পরিবর্তিত হত সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইটির উল্লেখ করা যায়। বইটিতে রামতনু লাহিড়ী ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনার অজস্রতার আড়ালে পড়ে গিয়েছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর এই বইটি একটি নির্ভরযোগ্য সামাজিক ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। স্পষ্টতই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনাকে ইতিহাসের তথ্যসমারোহে পর্যবসিত করতে চান নি।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন মানুষটিকে। সেই মানুষটির জীবনের যেটুকু চিরন্তন সত্যের ভাণ্ডারে তুলে রাখবার যোগ্য, সেটুকু উদ্ধারেই তিনি তাঁর চিন্তা-শক্তি ব্যয় করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত সংরক্ষিতব্য কেন? যে সব ঘটনা অতীতের স্তূপে চাপা পড়ে গিয়েছে, যাদের আর কোনো স্থায়িত্ব নেই বঙ্কিম যেন সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চান নি, তাতে কারোই কোনো লাভ হবে না। কিন্তু তাঁর জীবনকাহিনীতে এমন কতকগুলি শাশ্বত ভাবসত্য আছে সেগুলির প্রয়োজনীয়তা কখনই ফুরায় নি। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যগুণ, ধর্মবিশ্বাস, দেশবাৎসল্য, সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিচরিত্রগুণে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের চিন্তা-কর্ষক আদর্শকেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রধান আলোচ্য করে তুলেছেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদটি

৬ সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদকীয় রচনাগুলি অধিকাংশই সহকারী সম্পাদক শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত মাসিক সংখ্যা নিজে সম্পাদনা করতেন, অন্যগুলির ভার সহকারীর উপর ন্যস্ত ছিল। মতামত অবশ্যই ঈশ্বর গুপ্তের বলে ধরা যায়।

বহন করছে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টি এবং দার্শনিক তত্ত্বসন্ধানী প্রবৃত্তিকে।

এই তৃতীয় পরিচ্ছেদটি হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের চতুর্থ ভাগ (পৃ ২৮-৪৬)। এটি সম্পূর্ণই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা। এতে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের মূল্য নির্ধারণ করেছেন। এই উপলক্ষে এমন কতকগুলি সাহিত্যিক আলোচনাসূত্র দিয়েছেন, যার গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া আধুনিক বাংলার ভাবজীবনের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এই আলোচনা ও বিশ্লেষণের মূল্য কথনোই অস্বীকৃত হবার নয়।

সাহিত্যসমালোচনার নূতন সূত্র

ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তা দুর্লভ এবং অভ্রান্ত। এই আলোচনার দুটি মূল বৈশিষ্ট্যের প্রতিই আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া কর্তব্য— ব্যক্তি ও যুগকে নির্ধারণ। বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত উক্তি— কবিতা বুঝে লাভ আছে বটে, কিন্তু কবিকে বুঝলে আরও লাভ— আধুনিক সাহিত্যপাঠের একটি প্রধান সূত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের কথাটি এই—

'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র— তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্তি— তাহা তো-আমাদের হাতেই আছে— পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তিনি কি গুণে কি প্রকারে এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন তাহাই বলিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা, জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।'

প্রাচীন সাহিত্যে স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টিই ছিল প্রধান। আমরা প্রাচীন কবিদের ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী কিছুই জানি না, কাব্য বুঝবার পক্ষে তার প্রয়োজনীয়তাও কখনও অনুভূত হয় নি। তার কারণ কাব্যের রস বাক্য অর্থ এবং ব্যঞ্জনাতেই নিহিত থাকত এবং তাতেই কাব্যপাঠের চরিতার্থতা। কাব্য তখনও ব্যক্তিগত আত্মকেন্দ্রিকতায় বদ্ধ হয়ে পড়ে নি। সেকালের সমালোচনাতত্ত্বেও কাব্যের এই বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত। আমাদের প্রাচীন অলংকার কাব্যের নানা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছে সত্য, কিন্তু কখনোই কবির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে সন্ধান করবার কথা বলে নি। কারণ কাব্যে কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উগ্র হয়ে দেখা দেয় নি। এই

আত্মবিলোপ শুধু এ দেশের নয়, য়ুরোপীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কাব্যকলারই বিশেষত্ব। স্রষ্টার মনের খোঁজ না নিয়ে কাব্যের গঠনবিচার দ্বারা কাব্যের উৎকর্ষ নির্ণয়ের পদ্ধতি অ্যারিসটটলের সময় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অ্যাডিসনের সময় পর্যন্ত যেমন চলে এসেছে তেমনি আমাদের দেশে ভরত থেকে ভারতচন্দ্র এবং রঙ্গলাল[৭] পর্যন্ত চলে এসেছে। সেইজন্যই

> The test of symmetry which was laid down by Aristotle in the *Poetics* was found by Addison to be inadequate and a new test, that of the power to appeal to the imagination was substituted in its place. The former was a material test and its use implied that the form of literature was prior in importance to the thought : the latter is a spiritual test, and its use implies that the thought of literature has been recognised as prior in importance to its form.[৮]

অ্যাডিসন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ Essay on the Pleasures of the Imagination (১৭১২)-এ নিছক গঠনরীতির উপরেও স্থান দিলেন কল্পনাবৃত্তিকে। অ্যাডিসনের এই নতুন সূত্র তৎকালীন দার্শনিক ডেকার্ট হব্‌স এবং লকের চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে কোলরিজ-এর সময়ে 'কল্পনা' কথাটি আরও সূক্ষ্মতর অর্থ জ্ঞাপন করেছিল সত্য, কিন্তু কাব্যসৃষ্টিতে কল্পনাবৃত্তির তত্ত্বটাই একটি স্রষ্টা-মনকে স্বীকার্য করে তুলল। এই ব্যক্তিমনটিকে না জানলে একালের কাব্যকে ভালো বোঝা যায় না।

আমাদের দেশেও যিনি প্রথম পূর্ণাঙ্গ আধুনিক কাব্য লিখেছেন সেই মধুসূদন দত্ত পণ্ডিতী সমালোচনা-পদ্ধতিতে অধীরতা প্রকাশ করেছেন তাঁর পত্রে। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা কেবল শব্দালংকার অর্থালংকারই খোঁজেন, এজন্য তাঁদের কাব্যাস্বাদনরীতিতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। যে অনুপ্রেরণায় কাব্য রচিত হয়, তাকে বোঝবার চেষ্টা না করলে কাব্যপাঠ কখনই সার্থক হতে পারে না। এজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরচরিতের সমালোচনায় (১৮৭২) আলংকারিকদের নমস্কার করে নতুনভাবে কাব্যসমালোচনা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন। একালের একজন মনীষী পণ্ডিত আলংকারিক পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেন,

৭ পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৮ W. B. Worsfold, *The Principles of Criticism*, 1923. p 144

> The theorists never bother themselves about the poetic imagination, which gives each a distinct and unique shape by fusion of impressions into an organic, and not a mechanic, whole. No doubt they solemnly affirm the necessity of Pratibha or poetic imagination but in their theories the Pratibha does not assume any important or essential role. But it is forgotten that a work of art is the expression of individuality and that individuality never repeats itself nor conforms to a prescribed mould. It is hardly recognised that what appeals to us in a poem is the poetic personality.[৯]

ক্লাসিকাল সমালোচনাপদ্ধতি এবং আধুনিক সমালোচনাপদ্ধতির এই পার্থক্য বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ধরিয়ে দিয়েছিলেন নানা উপলক্ষে। বঙ্গদর্শন সম্পাদনার সময়ে (১৮৭২-১৮৭৬) বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত বিভিন্ন সাহিত্য-প্রবন্ধগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় তিনি পুরনো গঠনগত বিচারের রীতি বর্জন করে কবি-মনের কল্পনাসন্ধানী বিচাররীতি অনুসরণ করেছেন। সেইজন্য 'শকুন্তলা মিরান্দা, দেসদিমোনা'য় (১৮৭৬) তিনি শেকসপীয়র এবং কালিদাসের ভিন্ন ভিন্ন মানসিক প্রবণতা এবং তাঁদের পারিপার্শ্বিককে বুঝিয়েছেন। 'উত্তরচরিতে' (১৮৭২) ভবভূতির কল্পনারীতির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন; 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে (১৮৭৩) দুই কবির ভিন্ন পরিবেশ এবং ভিন্ন কল্পনাভঙ্গিকে স্পষ্ট করেই যুক্তিবদ্ধরূপে দেখিয়েছেন। অবশেষে 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' প্রবন্ধটিতে স্পষ্ট করেই কবিকে জানবার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। বঙ্কিমের এই মন্তব্য থেকেই নতুন সমালোচনাপদ্ধতি যেন নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে গেল।[১০]

৯ Sushil K. De, *History of Sanskrit Literature*, Calcutta University, 1947. p 30.

১০ সাহিত্যসৃষ্টি' (১৩১৪) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কালিদাসের উপমা ভালো বা ভাষা সরস বা কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের বর্ণনা সুন্দর বা অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ সর্গে করুণ রস প্রচুর আছে, এ আলোচনা যথেষ্ট নহে। কিন্তু কালিদাসের সমস্ত কাব্যে মানবহৃদয়ের একটা বিশেষ রূপ বাঁধা পড়িয়াছে। তাঁহার কল্পনা একটা বিশেষ কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া আকর্ষণ-বিকর্ষণ গ্রহণ-বর্জনের নিয়মে মানুষের মনোলোকে কোন্ অব্যক্তকে একটা বিশেষ সৌন্দর্যে ব্যক্ত করিয়া তুলিল, সমালোচকের তাহাই বিচার্য।' এ-সমালোচনা আসলেই ব্যক্তিসন্ধানী রসবিচার। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রবন্ধগুলি, 'শিক্ষা'-বইয়ের অন্তর্গত 'তপোবন' প্রবন্ধে এবং Religion of Man-এ দ্বাদশ অধ্যায়ে কালিদাসের আলোচনা এর দৃষ্টান্ত।

তথাপি প্রশ্ন হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র যে-কবিকে জানতে বলেছেন এবং কাব্যে আমরা যে-কবিমনটিকে জানতে চাই— দুইই কি এক ? বঙ্কিম কি ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীতে সেই কবিকেই জানবার কথা বলেছিলেন যার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

যে আমি স্বপনমূরতি গোপনচারী
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি—
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে।
মানুষ-আকারে বদ্ধ যেজন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জরে
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য থেকে মনে হয় তিনি 'মানুষ আকারে বদ্ধ যেজন ঘরে' সেই ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী সন্ধান করবার প্রসঙ্গই উত্থাপন করেছেন।

তবু বঙ্কিমের চিন্তা সাংসারিক মানুষ এবং ভাবের মানুষকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখে নি। 'যে আগুন ভিতর হইতে পুড়ায়' সেই অগ্নিদহনে কবিসত্তাটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বঙ্কিম তারই কথা বলেছেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত গুণগত বৈশিষ্ট্যে বা শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় নন— তাঁর সে-রকম কোনো ভাবজীবন ছিল না ; তাই মনে হয় উৎকৃষ্ট কাব্যবিচারে যে poetic personality-র কথা বলা হয়ে থাকে, ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যবিচারে সে প্রসঙ্গ অনাবশ্যক। কিন্তু তাতে বঙ্কিমের তত্ত্বসন্ধান কিছুমাত্র ব্যর্থ হয় না। ঈশ্বর গুপ্তের মতো কবির কবিতা বোঝবার জন্যে যা দরকার তাঁর কবিজীবনী ততোখানিই প্রয়োজনীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে তিনি কবিজীবন দিয়ে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অর্থ-তাৎপর্য পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। তাঁর কয়েকটি মন্তব্য এ বিষয়ে খুবই পরিষ্কার। ঈশ্বর গুপ্ত ভাবাবেগময় কবিতা লিখতে পারেন নি। তাঁর কবিতা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পরিহাসময়, আবেগ যেন তাঁর কাছে উপহসিত। বঙ্কিম এর মূল নির্দেশ করেছেন তাঁর ব্যক্তিজীবনে—

'সংসারের উপর সমাজের উপর ঈশ্বর গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা তাহা তাঁহার নিকট হইতে

কাড়িয়া লইল। খাঁটি সোনা কাড়িয়া লইয়া তাহার পরিবর্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল—মার বদলে বিমাতা। তার পর যৌবনের যে অমূল্য রত্ন—শুধু যৌবনের কেন, যৌবনের প্রৌঢ় বয়সের বার্ধক্যের তুল্যরূপেই অমূল্য রত্ন যে ভার্যা তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যদি গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তারপর অল্পবয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকষ্টে পড়িলেন।'

পত্নীর ভালোবাসা তাঁর জীবনে আসে নি তাই তিনি যথার্থ প্রেমের কবিতা লিখতে পারেন নি যদিও আদিরসের কবিতা তাঁর যথেষ্টই আছে।—

'এক একবার স্ত্রীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান—কিন্তু সাধ মিটে না। তাঁহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা বানরীতে পরিণত হয়।'

ঈশ্বর গুপ্তের নৈতিক এবং পারমার্থিক বিষয়ের কবিতার প্রসঙ্গেও তিনি বলছেন 'মানুষটা কে আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক—কবিতা না হয় এখন থাক।' কাব্যরসের দিক দিয়ে এই কবিতা উৎকৃষ্ট না হলেও এর মধ্যে দিয়ে মানুষটিকে চেনা যায়। পারমার্থিক বিষয়ের কবিতার মূল্য বস্তুত সাহিত্য-স্রষ্টার হিসাবে নয়, তার বিচার হবে অন্য ভাবে।

এর থেকে মনে হতে পারে কবিমন সম্পূর্ণ পরিবেশনিরপেক্ষ ভাবেই কাব্য সৃষ্টি করে। আপন কল্পনা অনুভূতিকে মাত্র অবলম্বন করে বলে বাইরের জগতের সঙ্গে তার যোগ আবশ্যিক নয়। প্রতিভার এই অলৌকিকত্ব বঙ্কিমচন্দ্র হয় তো স্বীকার করতেন কিন্তু সমালোচনাতে কখনই তিনি এই বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেন নি। সেকালের চিন্তাপ্রকৃতির সাধারণ লক্ষণ-অনুযায়ী জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগ তিনি স্বীকার করেছেন। ম্যাথ্যু আরনলড বলতেন **for the creation of a master work of literature two powers must concur, the power of the man and the power of the moment.**[১১] এই যোগাযোগে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। যুগের প্রভাবহীন প্রতিভার দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন বায়রণ এবং গ্রে-কে; আবার প্রতিভার প্রভাবহীন যুগের কবির দৃষ্টান্ত জার্মাণ কবি

---

১১ *The Study of Poetry*, Essays in Criticism, 1888.

হাইনে। ম্যাথু আরনলড সাহিত্যের শ্রেষ্ঠগুণান্বিত হওয়ার কারণ হিসাবেই যুগ এবং প্রতিভার সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন।

কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব লাভের মাপকাঠির কথা ছেড়ে দিলেও সাহিত্য মাত্রেরই বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি অর্জনের মূলে থাকে যুগ, জাতি এবং পরিপার্শ্বের প্রভাব। টেন তাঁর সুবিখ্যাত ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে (১৮৬৪) সাহিত্যপাঠের সূত্র নির্দেশ করেছিলেন race, milieu এবং moment ; বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের ইতিহাস ব্যাখ্যায় তাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। দীনেশচরণ বসুর মানসবিকাশের সমালোচনায় (১২৮০-১৮৭৩ খ্রী) তিনি বলেছেন,

'সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন ইতিহাস-সম্পর্কিত রচনায় এই সূত্রটি অনুসৃত হয়েছে যেমন ভারতকলঙ্ক (১২৭৯) বঙ্গদেশের কৃষক (১২৭৯) বাঙ্গালির বাহুবল (১২৮১) A Popular Literature of Bengal (১৮৭০) প্রভৃতি প্রবন্ধে। সাহিত্য-বিষয়ক রচনাতেও এই নীতির প্রয়োগ করেছেন। উত্তরচরিত প্রবন্ধে (১২৭৯) রামায়ণ এবং ভবভূতির রামচরিত্রের তুলনায় বঙ্কিম বলছেন,

'বাস্তবিক সর্বত্রই রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমলপ্রকৃতি। ইহার এক কারণ এই, উভয় চরিত্র, গ্রন্থরচনার সময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ, কেহ কেহ বলেন যে উত্তরকাণ্ড বাল্মীকিপ্রণীত নহে। তাহা হউক বা না হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তখন আর্যজাতি বীরজাতি ছিলেন। আর্য রাজগণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাঁহার চরিত্র গাম্ভীর্য এবং ধৈর্যপরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি— তখন ভারতবর্ষীয়েরা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙ্ক্ষা অলসাদির দ্বারা, তাঁহাদের চরিত্র কোমলপ্রকৃত হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ। তাঁহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য এবং ধৈর্যের বিশেষ অভাব।'

অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের সমালোচনাতে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন,

'ভারতীয় সমাজের যে অবস্থার উক্তি রামায়ণ, মহাভারত সে অবস্থার নহে ;

মহাভারত যে অবস্থার উক্তি কালিদাসাদির কাব্য সে অবস্থার নহে। তথায় দেখান গিয়াছে যে বঙ্গীয় গীতিকাব্য বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্রকৃতি নিশ্চেষ্টতা এবং গৃহসুখনিরতির ফল। অদ্য সেই কথা স্পষ্টীকরণে প্রবৃত্ত হইব।'

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতেও এই তত্ত্বের বিস্তৃত দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন। তিনি এতে কবিকে জানবার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন সেই কবি বস্তুত তাঁর সমাজ এবং কালের সৃষ্টি।[১২] বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের অশ্লীলতার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন— এর জন্য তিনি দায়ী করেছেন সেকালের সমাজ ও রুচিকে। ঈশ্বর গুপ্ত উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেন নি, এজন্য তাঁর কাব্য অনেকখানি বঞ্চিত হয়েছে মার্জিত রুচির অভাবে ; ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। বাল্যকালে মাতৃহীন হয়ে এবং পিতার অনাদরে মানুষ হয়ে তিনি কবির দলে যোগদান করেন। সেকেলে বাঙালি সমাজের দোষ-গুণ তাঁর স্বভাবে সঞ্চারিত হতে থাকে। তখন দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটছিল, নতুন রুচি এবং আদর্শ বাঙালি সমাজ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত এই শিক্ষা আহরণে কোনো সহায়তাই পান নি। কলকাতাতে বাস করতে এসেও তিনি সেই কবির দলের সঙ্গই পেলেন কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা পেলেন না, যদিও শোনা যায় সেই জন্যই তিনি কলকাতায় প্রেরিত হয়েছিলেন। সেইজন্য হিন্দু কলেজের নবশিক্ষা-আন্দোলনে এবং সামাজিক প্রগতিমূলক আন্দোলনে তিনি বিরোধী ভূমিকাই গ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁর কবিতাতে যে রঙ্গরস ব্যঙ্গ ইয়ারকি এবং স্থূল আদিরসের ছড়াছড়ি দেখা যায়, তার মর্মমূল ছিল তাঁর বাল্যের পরিবেশে। তাঁর রঙ্গরসের প্রকৃতি ছিল খাঁটি বাঙালি, যে-বাঙালি প্রকৃতি বস্তুত নতুন সাহিত্যে পরিবর্তিত হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের কল্পনাপ্রকৃতিকে বুঝতে গেলে সেই বাঙালি স্বভাব এবং প্রকৃতিকে বোঝা দরকার। তা না হলে ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করতে পারব না। একদা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এই ভুল করতে গিয়েছিলেন তাঁর ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধ **Bengali Literature**-এ।

১২ বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-আলোচনার যে সূত্রটির ইঙ্গিত এখানে করেছেন, পরবর্তীকালে দীনেশচন্দ্র সেন সেই সূত্র অবলম্বনেই 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক বিখ্যাত বইটি লেখেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধ (সাহিত্য-গ্রন্থে সংকলিত) দ্রষ্টব্য। এই সূত্রটি অগ্রাহ্য করে ব্যক্তি-প্রতিভাকে সর্বজয়ী রূপে দেখিয়ে সমালোচনা করেন প্রমথ চৌধুরী। দ্রষ্টব্য তাঁর 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধ (১৯২৯)। অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ'ও এই রীতির।

তবু এ কথাও সত্য, কবিকে কেবল যুগ এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ফল মাত্র মনে করলে সাহিত্যসৃষ্টি একটা যান্ত্রিক নিয়মপদ্ধতিতে মাত্র পর্যবসিত হয়। সত্য বটে বঙ্কিম বলেছিলেন 'সকলই নিয়মের ফল, সাহিত্যও নিয়মের ফল', কিন্তু তিনিই আবার বলেছিলেন,

'কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বকল্ ভিন্ন কেহ বিশেষ রূপে পরিশ্রম করেন নাই এবং হিতবাদ মতপ্রিয় বক্লের সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প। মনুষ্যচরিত্র হইতে ধর্ম এবং নীতি মুছিয়া দিয়া তিনি সমাজতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত।'[১৩]

যুগ এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ব্যক্তিমন সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিভার লক্ষণ সম্পূর্ণ হয়।

প্রাকৃতিক নিয়মের তত্ত্বে বিশ্বাসী হলেও, বাক্ল টেন মণ্টেস্কুর অনুগামী হলেও বঙ্কিমচন্দ্র জন স্টুয়ার্ট মিলের মতোই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তা না হলে কৃষ্ণের মতো সমাজনেতার কল্পনা তিনি করতেন না কিংবা ধর্মতত্ত্বেও প্রতি ব্যক্তিকে বিকাশ পেতে দেবার (যদিও সংযত বৃত্তিতে) তত্ত্ব প্রচার করতেন না। অন্তত সাহিত্যে 'সৃষ্টিপ্রতিভা'র উল্লেখ করে কবিচেতনার স্বতন্ত্র সৃষ্টিগৌরবের পূর্ণ মর্যাদা তিনি স্বীকার করে গিয়েছেন। সমাজ এবং কালের জড় নিয়মের মধ্যে থেকেও দুর্নিবার প্রতিভা নিজের বিকাশের পথ নিজেই রচনা করে। তা না হলে কাব্য-সাহিত্যে কোনো দিনই বৈচিত্র্য দেখা যেত না। ভবভূতি এবং বাল্মীকির সৃষ্টি শুধু কালের বিভিন্নতার জন্যই পৃথক প্রকৃতির নয়, তাঁদের ব্যক্তি-প্রতিভাও সৃষ্টির বিভিন্নতার কারণ। তেমনি মূলত একই ধরনের নায়িকা আঁকতে গেলেও শেকসপীয়র এবং কালিদাসের সৃষ্টি আলাদা—'শকুন্তলা মিরান্দা দেসদিমোনা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তা দেখিয়েছেন।

ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা এঁদের মতো নয় বলাই বাহুল্য, সেইজন্যই দেশ এবং কালের প্রভাব তাঁর ব্যক্তিপ্রতিভাকে অনেকখানি গ্রাস করে নিয়েছিল সে কথাও সত্য। তবু বঙ্কিম তাঁকে কেবল যুগসন্ধিক্ষণের ফল মাত্র বলেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি একটি আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তির সূচনা বিশ্বাস এবং পরিণামকে ঈশ্বর গুপ্তের জীবনকাহিনীতে দেখিয়েছেন।

১৩ বিদ্যাপতি ও জয়দেব (১২৮০), বিবিধ প্রবন্ধে সংকলিত।

'ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে একজন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় আসিয়া, সাহিত্যে ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে? তাহাও দেখিতে পাই— নিজ প্রতিভাগুণে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই। প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে। এখন ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম যে প্রতিভা ও সুরুচি পরস্পর সখী—প্রতিভার অনুগামিনী সুরুচি। ঈশ্বর গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে হইবে।'

ঈশ্বর গুপ্তের এই প্রতিষ্ঠালাভের মূলে ছিল তাঁর সহজাত প্রতিভা। এই প্রতিভা যদি ভাগ্যের অধিকতর অনুকূলতা পেত তবে হয়তো আরো বড়ো হয়ে উঠতে পারত। তাঁর বাল্যের এবং প্রথম জীবনের পরিবেশ তাঁর প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করে নি কিন্তু সে জন্য তা বিনাশ পায় নি, যথোপযুক্ত না হলেও সে বিকশিত হয়েছিল নিজস্ব শক্তিতে। শিক্ষা-হীনতার বাধাকে অতিক্রম করে তিনি ক্রমে ক্রমে উচ্চতম চিন্তাজগতের সান্নিধ্যে এসে নিজেকে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিলেন; লৌকিক গ্রাম্য আচার-মূলক ধর্মান্ধতার প্রাচীর ভেঙে নবধর্মের অনুগামী হয়েছিলেন; বেদান্ত এবং তন্ত্রের সঙ্গে সহজ পরিচয়সাধন করে বোধেন্দুবিকাশ, প্রবোধপ্রভাকর এবং হিতপ্রভাকরের মতো গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেকালের শিক্ষিত বাঙালির মনোজগতে যে-ধরনের জীবনজিজ্ঞাসায় স্পন্দিত হয়েছিল, ঈশ্বর গুপ্তের এই রচনাগুলি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। কবিজীবনী-রচনাও নবজাগ্রত ইতিহাসবুদ্ধির প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সভাসমিতিতে তিনি সভ্য নিযুক্ত হতেন, যন্ত্রালয়ে আহূত সভায় আসতেন মান্যগণ্য ব্যক্তিরা। বাংলাদেশের দূরে দূরাঞ্চলে তিনি শ্রদ্ধা পেয়েছেন।

অজ্ঞাতপরিচয় এক গ্রাম্য বালক যে এইভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেন —এ-কাহিনী যে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক এবং শিক্ষাপ্রদ তাতে সন্দেহ নেই। এ যেন একটি উপন্যাসের নায়ক ব্যক্তিত্বের জোরে ভাগ্যের প্রতিকূলতা ঠেলে সমাজের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। বঙ্কিম একেই বলেছেন প্রতিভা, এ-প্রতিভা বিধাতার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে বঞ্চিত, কিন্তু সুনিশ্চিত।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত এবং কবিত্ব আলোচনা করতে প্রণোদিত হয়েছিলেন কেন, এ-প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন সংবাদপ্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক; তিনি আদি সম্পাদকের কবিতাসংগ্রহ ও জীবনী প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং সেই উপলক্ষেই বঙ্কিমচন্দ্রকে কাব্যালোচনা করতে অনুরোধ করেছিলেন, এমন অনুমান সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় দুরূহ আলোচনায় নিমগ্ন, সেই সময় তিনি ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব বিচারে ব্যাপৃত হলেন, এটা একটু বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তখন কৃষ্ণচরিত্রের মতো গুরুগম্ভীর গবেষণামূলক গ্রন্থরচনার মাঝখানে হঠাৎ অন্য ধরনের কাজ করতে দেখে স্বভাবতই মনে হয়, হয় তো একাজটির সঙ্গে তাঁর সেকালের ভাবনার কোনো গূঢ় যোগ ছিল। কিঞ্চিৎ নীরস হলেও ঈশ্বর গুপ্তের পারমার্থিক কবিতাগুলিতে বঙ্কিমের মতে যে আন্তরিকতা আছে, তা দুর্লভ। ঈশ্বরের জন্য এই ব্যাকুলতা তাঁর গভীর ছিল বলেই ঈশ্বর গুপ্ত জাগতিক বিষয়ে ছিলেন নির্লিপ্ত প্রকৃতির। অথচ বঙ্কিম দেখিয়েছেন আপাতদৃষ্টিতে তিনি ছিলেন বিলাসী ধরনের। কিন্তু তাঁর বিলাসিতা ছিল নেহাৎই বাইরের, তাঁর অন্তর ছিল মুক্ত। বঙ্কিম যে আদর্শ মনুষ্যধর্মের কল্পনা তাঁর দার্শনিক রচনায় করেছিলেন, এটি তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। অতুল ঐশ্বর্য এবং বিপুল ভোগের প্রলোভন থাকলেও দেবী চৌধুরানী ছিলেন এমনি নির্লিপ্ত। দেবী চৌধুরানীতে বঙ্কিম গীতার কর্মসন্ন্যাসের নবরূপ রচনা করেছেন।[১৪] এই বইখানি প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। একই সময়ের বঙ্কিমচন্দ্র নবজীবনে ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করছিলেন। তার উনবিংশতিতম অধ্যায়ে গুরু বলছেন,

'যাহারা মুক্ত বা মুক্তিপথের পথিক, তাঁহারা সংসারে নির্লিপ্ত হয়েন, কিন্তু তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া যাবতীয় অনুষ্ঠেয় কর্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের কর্ম নিষ্কাম বলিয়া তাঁহাদের কর্ম স্বদেশের এবং জগতের মঙ্গলকর হয়।'

ধর্মতত্ত্ব ছিল তত্ত্ব আর দেবী চৌধুরানী ছিল কল্পনা। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন বাস্তব। তিনি দেবী চৌধুরানীর মতো চমকপ্রদ কর্মভারগ্রস্ত ব্যক্তি ছিলেন না, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের চরিত্রের মধ্যে একটি ঈশ্বরপরায়ণ নির্লিপ্ত অথচ সংসারে কর্তব্যশীল মানুষ আবিষ্কার করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের এই চরিত্রটি

১৪ 'লেখক-প্রণীত দেবী চৌধুরানী নামক গ্রন্থে প্রফুল্লকে অনুশীলনের উদাহরণ স্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে।'—ধর্মতত্ত্ব অষ্টম অধ্যায়, পাদটীকা

নিশ্চয়ই তাঁর মনের কল্পনা মাত্র নয়; হয় তো তাঁর কল্পিত তত্ত্বের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের চরিত্রের একটি ঐক্য তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। সামান্য দরিদ্র ঘরে জন্ম গ্রহণ করে পরে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে তিনি যেমন সমাজে সম্মানিত হয়েছিলেন তেমনি বিত্তও অর্জন করেছিলেন। এ রকম ক্ষেত্রে ভোগের প্রতি আসক্তি স্বাভাবিক; কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাবে কোনো আসক্তি জন্মে নি।

'ব্যয় করিয়া যে সময়ে যত টাকা বাঁচিত, তাহা কলিকাতার কোন না কোন ধনীলোকের নিকট রাখিয়া দিতেন। তাহার রসিদপত্র লইতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করেন।'

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব-আসক্তিহীনতার আরও উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় ভোজনরসিকতার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 'হেমন্তে বিবিধ খাদ্য' কবিতাটি একটি সরস উপভোগ্য রচনা। তাতে মনে হয় ঈশ্বর গুপ্ত খেতে ভালোবাসতেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এজন্য তাঁকে বিলাসী বলে গণ্য করেন না। তিনি এই প্রসঙ্গে গীতার উক্তি উদ্ধৃত করছেন। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম গীতার তত্ত্বের উপরেই তাঁর কল্পিত জীবনদর্শনের প্রতিষ্ঠা করেছেন—এ কথা সুবিদিত। ধর্মতত্ত্বের অষ্টম অধ্যায়ে বঙ্কিম ভক্তের খাদ্যনীতি সম্বন্ধে বলছেন,

'আহার সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ধর্মোপদেশ—যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনির্গত—গীতা হইতে তাহাই তোমাকে শুনাইয়া আমি নিরস্ত হইব।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

যে আহার আয়ুর্বৃদ্ধিকারক, উৎসাহবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকারক, স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকারক, সুখ বা চিত্তপ্রসাদবৃদ্ধিকারক এবং রুচিবৃদ্ধিকারক, যাহা রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, যাহার সারাংশ দেহে থাকিয়া যায় (অর্থাৎ Nutritious) এবং যাহা দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই সাত্ত্বিকের প্রিয়।'

গীতার এই উক্তিটি বঙ্কিম ঈশ্বর গুপ্তের ভোজনরসিকতার প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর পানদোষের সমর্থন করেন নি। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মাত্র মদ্যপান সমর্থন করেছেন, ঈশ্বর গুপ্তের এরকম কোনো সমর্থন ছিল না।[১৫]

---

১৫ 'মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই যে (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার, (২) পীড়াদিতে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে সেবন করিতে পার (৩) অন্য কোন সময় সেবন করা অবিধেয়।'—ধর্মতত্ত্ব, অষ্টম অধ্যায়

ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত আলোচনার সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের মূল বক্তব্যের আর এক দিক দিয়ে সাদৃশ্য আছে। ব্যক্তিচরিত্রের কথা বলতে গিয়ে বঙ্কিম ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বরপরায়ণতার কথা বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন। তাঁর ভক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন রামপ্রসাদের ভক্তির। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মচেতনাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাতে অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে দ্বৈতবাদী দৃষ্টি। এ বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনায় কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের অদ্বৈতবাদী বিশ্বাসের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। ধর্মতত্ত্বের বিস্তৃত ধর্মব্যাখ্যাতেও তিনি ভক্তিবাদকেই সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলছেন—

'জ্ঞানবাদীরা মায়া নামে ঈশ্বরের একটি শক্তি কল্পনা করেন। সেই মায়াই এই জগৎসৃষ্টির কারণ। এই মায়ার জন্যই আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং ব্রহ্মে লীন হইতে পারা যায়। অতএব ঈশ্বর তাঁহাদের কাছে কেবল জ্ঞেয়। এই জ্ঞান ঠিক "জানা" নহে। সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা, এই ছয় সাধনা। ... অতএব জ্ঞানবাদীরও উপাসনা আছে। উহা অনুশীলন বটে। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে উপাসনাও অনুশীলন। অতএব জ্ঞানবাদীর ঈদৃশ অনুশীলনকে তুমি উপাসনা বলিতে পার। কিন্তু সে উপাসনা যে অসম্পূর্ণ, তাহাও পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে। যথার্থ উপাসনা ভক্তিপ্রসূত।'[১৬]

ঈশ্বর গুপ্তকে সম্পূর্ণরূপে ভক্তিবাদীরূপে ব্যাখ্যা করলেও বঙ্কিম তাঁকে কোনো পৌরাণিক ভক্তচরিত্রের সঙ্গে তুলনীয় করে বলেন নি। হনুমান শ্রীদাম নন্দ-যশোদা, গোপীগণ প্রভৃতির ভক্তিসাধনা পৌরাণিক কাহিনী বলেই যেন আমাদের নিকট থেকে অনেক দূরের। শাক্তসাধক রামপ্রসাদের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মিল আমাদের অনেক পরিচিত জগতের বাস্তব-সান্নিধ্যের। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম অবশ্য শাক্তধর্মের ভক্তিবাদ বা উপাসনার কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। তাঁর সমগ্র বক্তব্য তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন পৌরাণিক দৃষ্টান্ত ও প্রমাণের উপর।

১৬ ধর্মতত্ত্ব, দ্বাদশ অধ্যায়।

ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী ও কবিত্ব প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্রের আর যে উদ্দেশ্য ছিল, তার কথা তিনি নিজেই উপক্রমণিকায় বলেছেন। আজকের সাহিত্য লোকজীবন থেকে দূরে সরে গিয়েছে। বাঙালির লোকজীবনের যে-স্পর্শ আমাদের পুরনো সাহিত্যে পড়েছিল, আধুনিক সাহিত্যে তার অভাব। ফলে এ-সাহিত্যের দ্বারা ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি লোকজীবনের অনুভূতি ও স্বাদ যেন ক্রমেই হারিয়ে ফেলছে। বঙ্কিমচন্দ্র এজন্য উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন।

এই উদ্‌বেগ বস্তুত একটি গূঢ়তর জীবনভাবনা থেকেই এসেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ'[১৭]। আধুনিক শিক্ষার সর্বোত্তম সম্পদ তিনি আহরণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রাণদায়িনী রসধারায় মৃতপ্রায় দেশের উজ্জীবনের নামই নবজাগরণ। এই ভাবের আন্দোলন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁর রচনার নানা স্থানেই তিনি পাশ্চাত্য-সংস্পর্শে দেশীয় জীবনাদর্শের রূপান্তরণের কথা বলেছেন।

কিন্তু নবজাগরণের চাঞ্চল্য আমাদের দেশের কতটুকু অংশে ছড়িয়ে পড়েছে? বস্তুত এই নতুন আদর্শ আমাদের সমগ্র দেশের লোকের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে নি। ফলে ইংরেজি শিক্ষা দেশকে সমগ্রভাবে উজ্জীবিত করবার পরিবর্তে দেশকে বিভক্ত করেছে মাত্র ইংরেজিজানা এবং ইংরেজি-না-জানা সমাজে।[১৮] দেশের নবলব্ধ জ্ঞান এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সম্পদ ভোগ করছে ইংরেজি-জানা সমাজ—

'দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।'

এ তো গেল অর্থনৈতিক অসাম্যের কথা। এ ছাড়াও আছে গুরুতর অসাম্য—

১৭ আধুনিক সাহিত্যে সংকলিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ (১৩০১)

১৮ তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ, 'ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশের সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।' শিক্ষার বিকিরণ। আধুনিক কালে বাঙালি সমাজে এই দীর্ণতার' চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ঐক্য বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বইয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধে আছে এই দুশ্চিন্তা। বাংলা ভাষার সাহায্যে এই বিভেদ দূর থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

'শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা লাঙ্গল চষে, আমার কাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্ধ মনে স্থান দেয় নয় না। বিলাতে কাণা ফসেট সাহেব এ দেশে সার অসলি ইডেন, ইহারা তাহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা।'[১৯]

এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব যথার্থভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রাণশক্তি যা সর্বমানবের গ্রহণোপযোগী বঙ্কিমচন্দ্র তার মহত্ত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাঁদের কোন কোন বস্তু অর্থাৎ 'বহির্বিষয়ক জ্ঞান' এবং অনেক নতুন ভাবসম্পদ আমাদের জাতীয় জীবনে বরণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন স্থানে তার উল্লেখ করেছেন।[২০] আলোচ্য জীবনচরিতের উপক্রমণিকাতেও তিনি বলেছেন—

'মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই।'

ইংরেজি-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্য আমাদের জাতীয় উন্নতির অনুকূল। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো সংশয় ছিল না যদিও ইংরেজি প্রভাববর্জিত বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব সৌন্দর্য ও মাধুর্য বঙ্কিমচন্দ্রকে সমভাবেই আকর্ষণ করে। এটা আপাতদৃষ্টিতে একটা দ্বিধাগ্রস্ততার লক্ষণ। একালের অভিনব উন্নতি এবং সেকালের বিশুদ্ধ বাঙালী জীবনযাত্রা দুটির কোনোটিকেই বঙ্কিম যেন ত্যাগ করতে চান না। এখানে বঙ্কিমের স্বাদেশিক আবেগ প্রবল হলেও যুক্তিবোধও কম প্রবল নয়। এই দ্বিধার মীমাংসাও বঙ্কিমমানসে ছিল সেটাই লক্ষ্য করবার বিষয়।

আধুনিক সভ্যতার উৎকৃষ্ট সম্পদ যা একালে ইংরেজি শিক্ষার সাহায্যে এদেশে এসেছে, সেগুলি যদি খাঁটি দেশীয় জীবনধারার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত হয়, তবে তার চেয়ে শুভ পরিণাম আর কিছুতেই হতে

১৯ 'লোকশিক্ষা', বঙ্গদর্শন, ১২৮৫ অগ্রহায়ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির সঙ্গে ইংরেজিশিক্ষিতদের সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের মন্তব্য তুলনীয়। দ্র. বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১১১

২০ দ্র. 'অনুকরণ' 'ভারত-কলঙ্ক' 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং ধর্মতত্ত্বে অষ্টম, পঞ্চদশ একবিংশতিতম অধ্যায়।

পারে না। এই সম্পদ যদি মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সমগ্র লোকসমাজকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তবে সে-সংস্কৃতি পরিণামে সমগ্র দেশের পক্ষে অকল্যাণকর ছাড়া আর কিছুই নয়। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন আধুনিক সংস্কৃতি সারা দেশে ছড়িয়ে যাক। বাঙালির চাষীজীবনে পল্লীসংসারে নৌকার মাঝিদের মধ্যে হাসিম সেখ এবং রামা কৈবর্তের মধ্যে এই সভ্যতার দান ব্যাপ্ত হক। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস থেকে রাজা-মহারাজার কাহিনী লিখেছেন সত্য, সংস্কৃত শাস্ত্র পুরাণ থেকে আদর্শ সংগ্রহ করেছেন সত্য, কোমৎ মিল তাঁর চিন্তাধারাকে পুষ্ট করেছিল, সে কথাও ঠিক, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল বাংলার জনসমাজ সে-কথাও সত্য। হুগলিতে একদিন সন্ধ্যাবেলায় যে অপূর্ব গানটি তাঁর কানে মধু বর্ষণ করেছিল, সে গান তাঁর মনের সদাস্পন্দমান একটি সুকুমার তন্ত্রীতে ঘা দিয়েছিল। তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেন, তার কিছু পূর্বে শম্ভুচন্দ্র মুখার্জিকে একটি পত্রে লিখেছিলেন,

> I think that we ought to disanglicise ourselves, so to speak to a certain extent and to speak to the masses in the language which they understand.[২১]

লোকজীবনের প্রতি তাঁর যে গভীর আকর্ষণ ছিল বলতে গেলে তারই ফল ছিল 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ। তিনি পত্রসূচনায় লিখেছিলেন,

'যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উন্নত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত, তাঁহাদিগেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ কখন কোনো দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তাসম্পন্ন। যতদিন এই ভাব ঘটে নাই—যতদিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, ততদিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ।[২২]

ইতর এবং ভদ্র সমাজে সামঞ্জস্য যিনি আধুনিক পুনরুজ্জীবন-যুগে নিয়ে আসবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সংবাদপ্রভাকর পত্রিকা

২১ বঙ্কিমচন্দ্রের English Works-এ সংকলিত।

২২ বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা, বিবিধ প্রবন্ধ।

ক্রমপরিবর্তমান দৃষ্টিভঙ্গিকে বাংলাভাষার সাহায্যে সহজবোধ্যরূপে সাধারণ বাঙালির ঘরে ঘরে দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে দেয়। যে কালে ইংরেজি ভাষার চর্চা নব্যদলের মধ্যে বক্তৃতার সৃষ্টি করে তুলেছিল সেকালে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলাভাষার মর্যাদার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি করে তুলেছিলেন। মধ্যযুগে সমাজের উচ্চস্তরে সংস্কৃত এবং মধ্যস্তরে ফারশি বাঙালির মাতৃভাষাকে সংকুচিত করে রেখেছিল; আধুনিক যুগে ইংরেজি ভাষা হয়ে উঠল সর্বেসর্বা। কোটি কোটি বাঙালির আত্মপ্রকাশ এবং আত্মোপলব্ধির স্বাভাবিক ভাষাবাহনটির কথা কেউ চিন্তা করে নি। অথচ এই স্বাভাবিক পথেই জনসমাজ জাতীয় জাগরণ-উৎসবে যোগ দিতে পারত, তা না হয়ে সে রইল দূরে। প্রাণদায়িনী চিন্তা এবং রসদায়িনী কল্পনা তার মনকে অভিষিক্ত করল না। এই ব্যবধান দূর করবার স্বপ্ন দেখে-ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সাহায্যে যে-কাজ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদপ্রভাকরের সাহায্যে তার আরম্ভ করে গিয়েছিলেন —গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সেখানেই ছিল প্রাণের যোগ।

কবিতাসংগ্রহ।

সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত

কবিতাবলী।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা।

১০১ নং মসজিদবাটী ষ্ট্রীটে সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রালয়ে
শ্রীকেদারনাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।

মূল্য ২, দুই টাকা

উপক্রমণিকা

বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট কবিতারও অভাব নাই— বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেক সুকবি বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অনেক উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন, বলিতে গেলে বরং বলিতে হয়, যে বাঙ্গালা সাহিত্য, কাব্যরাশি ভারে কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি করি কেন? সেই কথাটা আগে বুঝাই।

প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটা কি এ? বহুকষ্টে পিসীমা তাঁহাকে সামগ্রীটা বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে এ "কেলা কা ফুল।" রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়, যে এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলা কা ফুল বলিতে শিখিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।

একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়া ছিলাম। প্রদোষকাল— প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী— মৃদু পবন-হিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতে-ছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না— ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

"সাধো আছে মা মনে
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী-জীবনে।"

তখন প্রাণ জুড়াইল— মনের সুর মিলিল— বাঙ্গালা ভাষায়— বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম— এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে,

তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল— এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেইরূপ, আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের— আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি— ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না— জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা "বৃত্রসংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্ব্বণ" চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্ব্বণে যে একটা সুখ আছে— বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠা পুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না ; দেশশুদ্ধ জোন্‌স্, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভাল বাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিসগুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ। মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি— কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না। এই কবিতাগুলি মার প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম।

এই সংগ্রহের জন্য বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই পাঠকের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার উদ্যোগ ও পরিশ্রম ও যত্নেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে যে পরিশ্রম আবশ্যক তাহা আমাকে করিতে হইলে, আমি কখন পারিয়া উঠিতাম না।

এক্ষণে পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে জীবনী উপহার দিতেছি, তাহার জন্যও ধন্যবাদ গোপালবাবুরই প্রাপ্য। তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া গোপালবাবু আমাকে কতকগুলি নোট দিয়াছিলেন। আমি সেই নোটগুলি অবলম্বন করিয়া এই জীবনী সঙ্কলন করিয়াছি। গোপালবাবু নিজে সুলেখক, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। তাঁহার নোটগুলি এরূপ পরিপাটী, যে আমি তাহাতে কাটাকুটি বড় কিছু করি নাই, কেবল আমার নিজের বক্তব্যের সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছি। প্রথম পরিচ্ছেদটি বিশেষতঃ এই প্রণালীতে লিখিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, গোপাল বাবুর

নোটগুলি প্রায় বজায় রাখিয়াছি—আর কিছুই গাঁথিতে হয় নাই। তৃতীয় পরিচ্ছেদের জন্য আমি একাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

এই কথাগুলি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে গোপাল বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনী জন্য আমার ও সাধারণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্য ও শিক্ষা

প্রয়াগে যুক্তবেণী—বাঙ্গালার ধান্যক্ষেত্র মধ্যে মুক্তবেণী—কলিকাতার ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন। যেখানে এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার পশ্চিম পারস্থ গ্রামের নাম "ত্রিবেণী"—পূর্ব পারস্থিত গ্রামের নাম "কাঞ্চনপল্লী" বা কাঁচরাপাড়া।

কাঁচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারহট্ট, কুমারহট্টের দক্ষিণে গৌরীভা বা গরিফা। এই তিন গ্রামে অনেক বৈদ্যের বাস। এই বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। গরিফার গৌরব রামকমল সেন, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কুমারহট্টের গৌরব, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। কাঁচরাপাড়ার একটি অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।*

কাঁচরাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাস একটি বৈদ্যবংশের আদি পুরুষ। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের দুই পুত্র, (১) বিজয়রাম, (২) নিধিরাম। বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার একটি টোল ছিল, তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

কনিষ্ঠ নিধিরাম, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কবিভূষণ উপাধি পাইয়াছিলেন। নিধিরামের তিনটী পুত্র জন্মে,—(১) বৈদ্যনাথ, (২) ভোলানাথ, এবং (৩) গোপীনাথ।

গোপীনাথের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র হরিনারায়ণ দাসের ঔরসে শ্রীমতী দেবীর গর্ভে (১) গিরিশচন্দ্র, (২) ঈশ্বরচন্দ্র, (৩) রামচন্দ্র, (৪) শিবচন্দ্র এবং একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র, পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১৭৩৩ শকের (বাঙ্গালা ১২১৮ সালে) ২৫এ ফাল্গুনে শুক্রবারে কাঁচরাপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

* এই প্রদেশের বৈদ্যগণ রাজকার্য্যেও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। নাম করিলে অনেকের নাম বাদ যাইতে পারে।

গুপ্তেরা তাদৃশ ধনী ছিল না; মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পৈত্রিক ধান্যক্ষেত্র, পুষ্করিণী, উদ্যান, এবং বাইরতি জমির আয়ে এই একান্নভুক্ত পরিবারের কোন অভাব ঘটিত না। সমাজ মধ্যে এই গৃহস্থেরা মান্য গণ্য ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, স্বগ্রামের নিকট শেয়ালডাঙ্গার কুটিতে মাসিক ৮৲ আট টাকা বেতনে কাজ করিতেন।

কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহাশ্রম। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীয় জননীর সহিত কাঁচরাপাড়া, এবং মাতামহাশ্রমে বাস করিতেন। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কানপুরে বিষয় কর্ম্ম করিতেন। মাতামহের অবস্থা বড় ভাল ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের যে দুই একটা কথা জানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর বড় দুরন্ত ছেলে ছিলেন। সাহসটা খুব ছিল। পাঁচ বৎসর বয়সে কালীপূজার দিন, অমাবস্যার রাত্রে, একা নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। অন্ধকারে, একজন কেহ পথে তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। সে ঘোর অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে রে?—কে যায়?"

"আমি—ঈশ্বর।"

"একেলা এই অন্ধকারে অমাবস্যার রাত্রিতে কোথায় যাইতেছিস্?"

"ঠাকুর মশায়ের বাড়ী লুচি আনিতে।"

দেশকাল গুণে এ সাহসের পরিণাম—হোগল কুঁড়িয়ায় বসিয়া কবিতা লেখা!

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম যৎকালে ১০বর্ষ, সেই সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

স্ত্রীবিয়োগের কিছু দিন পরেই তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তিনি বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয় হইতে বাটী না আসিয়া কার্য্যস্থলে গমন করেন। নব বধূ একাকিনী কাঁচরাপাড়ার বাটীতে আসিলে, হরিনারায়ণের বিমাতা (মাতা জীবিতা ছিলেন না) তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের উপযোগী বটে। ঈশ্বরচন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল, যে তিনি খাঁটি জিনিস বড় ভালবাসিতেন, মেকির বড় শত্রু। এই সংগ্রহস্থিত কবিতা গুলি পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে কবি মেকির বড় শত্রু—সকল রকম মেকির উপর তিনি গালিবর্ষণ করিতেছেন—গবর্ণর জেনরল হইতে কলিকাতার মুটে পর্য্যন্ত কাহারও মাফ নাই। এই বিমাতার আগমনে কবির সঙ্গে মেকির প্রথম সম্মুখ সাক্ষাৎ। খাঁটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে একটা মেকি মা আসিয়া

দাঁড়াইল। মেকির শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ্য হইল না, এক গাছা রুল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। কবিপ্রযুক্ত রুল সৌভাগ্যক্রমে, বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল—বিমাতা ত্যাগ করিয়া একটা কলা গাছে বিঁধিয়া গেল।

অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া কিরাতপরাজিত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু বরদানার্থ পিনাকহস্তে পশুপতি না আসিয়া, প্রহারার্থ জুতাহস্তে জ্যেঠামহাশয় আসিয়া উপস্থিত। জ্যেঠা মহাশয় দ্বার ভাঙ্গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে পাদুকা প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিলেন, এ সংসার মেকি চলিবার ঠাঁই—মেকির পক্ষ হইয়া না চলিলে এখানে জুতা খাইতে হয়। ইহার পর, যখন তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র তীব্র জ্বালাবিশিষ্ট বক্রোক্তি সকল নির্গত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক রকম মেকি তাঁহার নিকট জুতা খাইল। কবিকে মারিলে, কবি মার তুলিয়া রাখেন। ইংরেজ সমাজ বায়রণকে প্রপীড়িত করিয়াছিল—বায়রণ, ডন জুয়ানে তাহার শোধ লইলেন।

পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আসিয়া সান্ত্বনা করিয়া বলেন, "তোদের মা নাই, মা হইল, তোদেরই ভাল। তোদেরি দেখিবে শুনিবে।"

আবার মেকি! জ্যেঠা মহাশয যা হৌক খাঁটি রকম জুতা মারিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহের নিকট এ স্নেহের মেকি ঈশ্বরচন্দ্রের সহ্য হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র পিতামহের মুখের উপর বলিলেন,—"হাঁ। তুমি আর একটা বিয়ে করে যেমন বাবাকে দেখ্‌ছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখ্‌বেন।"

দুরন্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখা পড়ায় বড় মন দিলেন না। বুদ্ধির অভাব ছিল না। কথিত আছে. ঈশ্বরচন্দ্রের যখন তিন বৎসর বয়স, তখন তিনি একবার কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিয়া পীড়িত হয়েন। সেই পীড়ায় তাঁহাকে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হয়। কলিকাতা তৎকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং মশা মাছির বড়ই উপদ্রব ছিল। প্রবাদ আছে, ঈশ্বরচন্দ্র শয্যাগত থাকিয়া সেই মশা মাছির উপদ্রবে একদা স্বতঃই আবৃত্তি করিতে থাকেন—

"রেতে মশা দিনে মাছি,
এই তাড়্যে কল্‌কেতায় আছি।"

I lisped in numbers, for the numbers came!

তাই নাকি? অনেকে কথাটা না বিশ্বাস করিতে পারেন—আমরা বিশ্বাস

করিব কি না জানি না। তবে যখন জন ষ্টুয়ার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে গ্রীক শেখার কথাটা সাহিত্যজগতে চলিয়া গিয়াছে, তখন এ কথাটা চলুক।

ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই তৎকালে সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালী, কবি প্রভৃতিতে যোগদান এবং সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ও পিতৃব্যদিগের সংগীত রচনা শক্তি ছিল। বীজগুণে নাকি অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে।

কিন্তু পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়া শিখিতে ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগী ছিলেন না। কখনও পাঠশালায় যাইতেন, কখনও বা টো টো করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। এ সময়ে মুখে মুখে কবিতা-বচনায় তৎপর ছিলেন। পাঠশালার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা পারস্য ভাষায় যে সকল পুস্তক অর্থ করিয়া পাঠ করিত, শুনিয়া, ঈশ্বর তাহার এক এক স্থল অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গলা ভাষায় কবিতা বচনা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখা পড়া শিক্ষায় অমনোযোগী দেখিয়া, গুরুজনেরা সকলেই বলিতেন, ঈশ্বর মূর্খ এবং অপবেব গলগ্রহ হইবে। চিরজীবন অন্নবস্ত্রের জন্য কষ্ট পাইবে।

সেই অনাবিষ্ট বালক সমাজে লব্ধপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত প্রথানুসারে লেখা পড়া না শিখিলেই ছেলে গেল স্থির করা যায়। কিন্তু ক্লাইব বালককালে কেবল পরের ফলকরা চুবি করিয়া বেড়াইতেন, বড় ফ্রেড্রিক বাপের অবাধ্য বয়াটে ছেলে ছিলেন, এবং আর আর অনেকে এইরূপ ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে, স্বয়ং কালিদাস নাকি বাল্যকালে ঘোর মূর্খ ছিলেন।

মাতৃহীন হইবার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মাতুলালয়ে অবস্থান করিতে থাকেন। কলিকাতায় আসিয়া সামান্য প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ কবিতা রচনায় বিশেষ মনোযোগ থাকায়, শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, আজ কাল অনেক ছেলেকে সেই ভ্রমে পতিত হইতে দেখি। লিখিবার একটু শক্তি থাকিলেই, অমনি পড়া শুনা ছাড়িয়া দিয়া কেবল রচনায় মন। রাতারাতি যশস্বী হইবাব বাসনা। এই সকল ছেলেদের দুই দিক নষ্ট হয়—রচনাশক্তি যে টুকু থাকে, শিক্ষাব অভাবে তাহা সামান্য ফলপ্রদ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যে পড়া শুনায়, অমনোযোগী হউন, শেষে তিনি কিছু শিখিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য রচনায় তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড দুঃখেরই বিষয়। তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে,

তাঁহার কবিত্ব, কার্য্য, এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত। আমার বিশ্বাস যে তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত। তাঁহার রচনায় দুইটি অভাব দেখিয়া বড় দুঃখ হয়—মাৰ্জ্জিত রুচির অভাব, এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেকটাই ইয়ারকি। আধুনিক সামাজিক বানরদিগের ইয়ারকির মত ইয়ারকি নয়—প্রতিভাশালী মহাত্মার ইয়ারকি। তবু ইয়ারকি বটে। জগদীশ্বরের সঙ্গেও একটু ইয়ারকি—

কহিতে না পার কথা— কি রাখিব নাম?
তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম॥

ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, তাহা আমরা ছাড়িতে রাজি নই। বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা আছে বলিয়া, বাঙ্গলা সাহিত্যে একটা দুর্লভ সামগ্রী আছে। অনেক সময়েই এই ইয়ারকি বিশুদ্ধ, এবং ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা বা পরের প্রতি বিদ্বেষশূন্য। রত্নটি পাইয়া হারাইতে আমরা রাজি নই, কিন্তু দুঃখ এই যে—এতটা প্রতিভা ইয়ারকিতেই ফুরাইল।

একজন দেউলেপড়া শুঁড়ী, মতিশীলের গল্প শুনিয়া, দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, "কত লোকে খালি বোতল বেচিয়া বড় মানুষ হইল— আমি ভরা বোতল বেচিয়া কিছু করিতে পারিলাম না?" সুশিক্ষার অভাবে ঈশ্বর গুপ্তের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। তাই এখনকার ছেলেদের সতর্ক করিতেছি—ভাল শিক্ষা লাভ না করিয়া কালির আঁচড় পাড়িও না। মহাত্মাদিগের জীবনচরিতের সমালোচনায় অনেক গুরুতর নীতি আমরা শিখিয়া থাকি। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সমালোচনায় আমরা এই মহতী নীতি শিখি--সুশিক্ষা ভিন্ন প্রতিভা কখন পূর্ণ ফলপ্রদা হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। কঠিন সংস্কৃত ভাষার দুর্ব্বোধ শ্লোক সমূহের ব্যাখ্যা একবার শুনিয়াই তাহা অবিকল কবিতায় রচনা করিতে পারিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার একজন বাল্যসখা, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের সংবাদ প্রভাকরে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

"ঈশ্বর বাবু দুগ্ধপোষ্যাবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধিশালিতা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। যৎকালীন পাঠশালার প্রথম শিক্ষায় অতি শৈশবকালে প্রবর্ত্ত হইয়া-

ছিলেন, তখন তাঁহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালকেরা পারস্য শাস্ত্র পাঠ করিত। তাহাতেই যে দুই একটী পারস্য শব্দ শ্রুত হইত, তাহার অর্থ শ্রুতি মাত্রেই বিশেষ বিদিত হইয়া, বঙ্গ শব্দের সহিত সংযোজনা করিয়া, উভয় ভাষায় মিলিত অথচ অর্থবিশিষ্ট কবিতা অনায়াসেই প্রস্তুত করিতেন। ১১।১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই অভ্রমে অত্যল্প পরিশ্রমে ঈদৃশ মনোরম বাঙ্গালা গান প্রস্তুত করিতে পারগ হইয়াছিলেন যে, সখের দলের কথা দূরে থাকুক, উক্ত কাঞ্চনপল্লীতে বারোইয়ারী প্রভৃতি পুজোপলক্ষে যে সকল ওস্তাদী দল আগমন করিত, তাহাদের সমভিব্যাহারী ওস্তাদলোক উত্তর গান ত্বরায় প্রস্তুত করিতে অক্ষম হওয়াতে ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি শীঘ্রই অতি সুশ্রাব্য চমৎকার গান পরিপাটী প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন।”

লেখক পরে লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাতেই ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস এবং জীবিকান্বেষণ জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। আমার সহিত সন্দর্শন হইয়া প্রথমতঃ যখন তাঁহার সহিত প্রণয় সঞ্চার হয়, তখন আমারও পঠদ্দশা, তিনি যদিও আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক ছিলেন, তথাপি উভয়েই অপ্রাপ্ত বয়স্ক, কেবল বিদ্যাভ্যাসেই আসক্ত ছিলাম। আমি সে সময় সর্ব্বদা তাঁহার সংসর্গে থাকিতাম, তাহাতে প্রায় প্রতিদিনই এক একটী অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ হইত। অর্থাৎ প্রত্যহই নানা বিষয়ে অবলীলাক্রমে অপূর্ব্ব কবিতা রচনা করিয়া সহচর সুহৃৎ সমূহের সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান করিতেন। কোন ব্যক্তি কোন কঠিন সমস্যা পূরণ কবিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা যাদৃশ সাধু শব্দে সম্পূরণ করিতেন, তদ্রূপ পূর্ব্বে কদাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।”

উক্ত বাল্যসখা শেষ লিখিয়া গিয়াছেন,“ঈশ্বর বাবু যৎকালীন ১৭।১৮ বর্ষবয়স্ক, তৎকালীন দিবা রাত্রি একত্র সহবাস থাকাতে, আমার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অনুমান হয়, একমাস কি দেড়মাস মধ্যেই মিশ্র পর্য্যন্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। শ্রুতিধরদিগের প্রশংসা অনেক শ্রুতিগোচর আছে, ঈশ্বর বাবুর অদ্ভুত শ্রুতিধরতা সর্ব্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতা তাঁহার স্বপ্রণীতই হউক বা অন্যকৃতই হউক, একবার রচনা এবং সমক্ষে পাঠ মাত্রই হৃদয়ঙ্গম হইয়া, একেবারে চিত্রপটে চিত্রিতের ন্যায় চিত্রস্থ হইয়া চিরদিন সমান স্মরণ থাকিত।”

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মাতামহ-বংশের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াই ঠাকুর বাটিতে পরিচিত হয়েন।

পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ সখ্য জন্মে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার নিকট নিয়ত আবস্থান পূর্ব্বক কবিতা রচনা করিয়া সখ্যবৃদ্ধি করিতেন। যোগেন্দ্র-মোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। লেখা পড়া শিক্ষা এবং ভাষানুশীলনে তাঁহার অনুরাগ ও যত্ন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে তাঁহার রচনাশক্তিও জন্মিয়াছিল। যোগেন্দ্রমোহনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী সৌভাগ্যের এবং যশকীর্ত্তির সোপানস্বরূপ।

ঠাকুর বাটীতে মহেশচন্দ্র নামে ঈশ্বরচন্দ্রের এক আত্মীয়ের গতিবিধি ছিল। মহেশচন্দ্রও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মহেশের কিঞ্চিৎ বাতিকের ছিট থাকায় লোকে তাঁহাকে "মহেশা পাগলা" বলিত। এই মহেশের সহিত ঠাকুর-বাটীতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রায়ই মুখে মুখে কবিতা-যুদ্ধ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্রের যৎকালে ১৫ বর্ষ বয়স, তৎকালে গুপ্তীপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

দুর্গামণির কপালে সুখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, আবার মেকি! দুর্গামণি দেখিতে কুৎসিতা। হাবা। বোবার মত। এ ত স্ত্রী নহে, প্রতিভাশালী কবির অর্দ্ধাঙ্গ নহে— কবির সহধর্ম্মিণী নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন না।

ইহার ভিতর একটু Romance-ও আছে। শুনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, কাঁচরাপাড়ার একজন ধনবানের একটী পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়েন। কিন্তু তাঁহার পিতা সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া, গুপ্তীপাড়ার উক্ত গৌরহরি মল্লিকের উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ দেন। গৌরহরি, বৈদ্যদিগের মধ্যে একজন প্রধান কুলীন ছিলেন, সেই কুল-গৌরবের কারণ এবং অর্থদান করিতে হইল না বলিয়া, সেই পাত্রীর সহিতই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা পুত্রের বিবাহ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় নিতান্ত অনিচ্ছায় বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের পরই তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি আর সংসার ধর্ম্ম করিব না। কিছু কাল পরে ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয় মিত্রগণ তাঁহাকে আর একটী বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলেন যে, দুই সতীনের ঝগড়ার মধ্যে পড়িয়া মারা যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ না করাই ভাল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী হইতে আমরা এই আর একটি মহতী নীতি শিক্ষা করি। ভরসা করি আধুনিক বর কন্যাদিগের ধনলোলুপ পিতৃমাতৃগণ এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

ঈশ্বর গুপ্ত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না করুন, চিরকাল তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া ভরণ পোষণ করিয়া, মৃত্যুকালে তাঁহার ভরণ-পোষণ জন্য কিছু কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুর্গামণিও সচ্চরিত্রা ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, দুর্গামণি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

এখন আমরা দুর্গামণির জন্য বেশী দুঃখ করিব, না ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য বেশী দুঃখ করিব? দুর্গামণির দুঃখ ছিল কি না তাহা জানি না। যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে আগুন তাঁহার হৃদয়ে ছিল কি না জানি না। ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল—কবিতায় দেখিতে পাই। অনেক দাহ করিয়াছে দেখিতে পাই। যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই। যে উন্নতি স্ত্রীলোকের সংসর্গে হয়, স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহ ভক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই। স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাদের দিগে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন, মুখ ভেঙ্গান, গালি পাড়েন, তাঁহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর, তাহা নানা প্রকার অশ্লীলতার সহিত বলিয়া দেন—তাহাদের সুখময়ী, রসময়ী, পুণ্যময়ী করিতে পারেন না। এক একবার স্ত্রীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান—কিন্তু সাধ মিটে না। তাঁহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা বানরীতে পরিণত হয়। তাঁহার প্রণীত "মানভঞ্জন" নামক বিখ্যাত কাব্যের নায়িকা ঐরূপ। উক্ত কবিতা আমরা এই সংগ্রহে উদ্ধৃত করি নাই। স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় কথা বড় অল্পই উদ্ধৃত করিয়াছি। অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় মুক্তকণ্ঠ—অতিকদর্য্য ভাসায় ব্যবহার না করিলে, গালি পূরা হইল মনে করেন না। কাজেই উদ্ধৃত করিতে পারি নাই।

এখন দুর্গামণির জন্য দুঃখ করিব, না ঈশ্বর গুপ্তের জন্য? ভরসা করি, পাঠক বলিবেন, ঈশ্বর গুপ্তের জন্য।

১২৩৭ সালের কার্ত্তিক মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যু হয়।

মাতার মৃত্যুর পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া, মাতুলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুর বাটীতেই প্রতিপালিত হইতেন। পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ শিবচন্দ্র পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের লালন পালন ভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই অর্পিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কর্ম্ম

প্রবাদ আছে, লক্ষ্মী সরস্বতীতে চিরকাল বিবাদ। সরস্বতীর বরপুত্রেরা প্রায় লক্ষ্মীছাড়া ; লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর বিষনয়নে পতিত। কথাটা কতক সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে লক্ষ্মীর বড় অপরাধ নাই। বিক্রমাদিত্য হইতে কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাই লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর পুত্রগণের বিশেষ সহায়। লক্ষ্মী, চিরকাল সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া খাড়া করিয়া রাখিতেন ; নহিলে বোধ হয়, সরস্বতী অনেক দিন, বিষ্ণুপার্শ্বে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া, ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন হইতেন— তাঁহার পালিত গর্দ্দভগুলি সহস্র চীৎকার করিলেও উঠিতেন না। এখন হয়ত সে ভাবটা তেমন নাই। এখন সরস্বতী কতকটা আপনার বলে বলবতী , অনেক সময়েই আপনার বলেই পদ্মবনে দাঁড়াইয়া বীণায় ঝঙ্কার দিতেছেন দেখিতে পাই। হয়ত দেখিতে পাই, দুই জনে একাসনে বসিয়াই সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছেন— সতীনের মত কোন্দল ঝকড়া নাক কাটাকাটি কিছু নাই , অনেক সময়ে দেখি সরস্বতী আসিয়াছেন দেখিয়াই লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হন কিন্তু যখন ঈশ্বর গুপ্ত সরস্বতীর আরাধনায় প্রথম প্রবৃত্ত, তখন সে দিন উপস্থিত হয় নাই। লক্ষ্মীর একজন বরপুত্র তাঁহার সহায় হইলেন। লক্ষ্মী সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন।

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তি এবং রচনাশক্তি দর্শনে এই সময়ে অর্থাৎ ১২৩৭ সালে বাঙ্গালা ভাষায় এক খানি সংবাদপত্র প্রচার করিতে অভিলাষী হয়েন। ইহার পূর্বে ৬ খানি মাত্র বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়াছিল।

(১) "বাঙ্গালা গেজেট"— ১২২২ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। ইহাই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র। (২) "সমাচার দর্পণ"— ১২২৪ সালে শ্রীরামপুরের মিশনরিদিগের দ্বারা প্রকাশ হয়। (৩) ১২২৭ সালে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে "সংবাদ-কৌমুদী" প্রকাশ হয়। (৪) ১২২৮ সালে "সমাচার চন্দ্রিকা", (৫) "সংবাদ তিমির নাশক" এবং (৬) বাবু নীলরত্ন হালদার কর্ত্তৃক "বঙ্গদূত" প্রকাশ হয।

ঈশ্বরচন্দ্র, যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে উৎসাহে এবং উদ্যোগে সাহসী হইয়া, সন ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘে "সংবাদ প্রভাকর" প্রচারারম্ভ করেন। তৎকালে প্রভাকর সপ্তাহে একবার মাত্র প্রকাশ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে প্রভাকরের জন্মবিবরণ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, "৺বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন আমাদিগের যন্ত্রালয় ছিল না। চোরবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত। ৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যায়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি সম্ভ্রমের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।"

কিঞ্চিদধিক ১৯ বর্ষ বয়স্ক নবকবি-সম্পাদিত নব প্রভাকর অল্পদিনের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কলিকাতার যে সকল সম্ভ্রান্ত ধনবান এবং কৃতবিদ্য লেখক, সাপ্তাহিক প্রভাকরের সহায়তা করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিগের নামের নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

"শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ৺বাবু নন্দলাল ঠাকুর, ৺বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ৺বাবু রামকমল সেন, শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৺হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুকন, শ্রীযুক্ত জয় গোপাল তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, বাবু ব্রজমোহন সিংহ, ৺কৃষ্ণচন্দ্র বসু, বাবু রসিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ধর্ম্মদাস পালিত, বাবু শ্যামাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলাল ও অন্যান্য। শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয়* অদ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভূষণ রহিয়াছে। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম গদ্য পদ্য লিখিয়া প্রভাকরের শোভা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।"

এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। মধ্যে একবার প্রভাকর

---

* সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ
সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।
উদেতি ভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ।
সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ।
নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু
কচিত্ত্বমং ভ্রাম মতভ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ
অদ্যোত্তদ্বিমল প্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে
স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরাশ্চাত্তদ্বিরেফারসং॥

মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার পুনরুদিত হইয়া অদ্যাপি কর বিতরণ করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন আমরা আর সে ঋণের কথা বড একটা মুখে আনি না। কিন্তু এক দিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যান। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে— অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্ব্বণ, আজ মিশনরি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু আর একজন। ইহার জন্য ও বাঙ্গালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনা গুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।

১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন প্রাণত্যাগ করায়, সংবাদপ্রভাকরের তিরোধান হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "এই সময়ে (১২৩৯ সালে) জগদীশ্বর আমাদিগের কর্ম্ম এবং উৎসাহের শিরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ মহোপকারী সাহায্যকারী বহুগুণধারী আশ্রয়দাতা বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সাংঘাতিক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের দন্তে পতিত হইলেন। সুতরাং ঐ মহাত্মার লোকান্তরগমনে আমরা অপর্য্যাপ্ত শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া এককালীন সাহস এবং অনুরাগশূন্য হইলাম। তাহাতে প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।"

প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯

সালের ১০ শ্রাবণে "সংবাদ রত্নাবলী" প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।

১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বব চন্দ্র বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমূহের যে ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে এই রত্নাবলী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, "বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে "সংবাদ রত্নাবলী" আবির্ভূত হইল। মহেশ চন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্ম্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্বতন সম্পাদক ৺রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।"

ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "ফলতঃ গুণাকর প্রভাকরকব বহুকাল বত্নাবলীর সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না, তাহা পবিত্যাগ করিযা দক্ষিণ প্রদেশে শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া, কটকে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামামোহন বায় পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে কিছু দিন অবস্থান করিয়া, একজন অতি সুপণ্ডিত দণ্ডীর নিকট তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। এবং তাহাব কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন।"

১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন কবেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়াই প্রভাকবের পুনঃ প্রচার জন্য চেষ্টিত হয়েন। তাঁহার সে বাসনাও সফল হয়। ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র, প্রভাকরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রকাশ সূত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, "১২৪৩ সালের ২৭-এ শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বাব বারত্রয়িক রূপে প্রকাশ করি, তখন এই গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি, আমাদিগের এমত সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, পাতুরেঘাটা-নিবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর এবং তদনুজ বাবু গোপাল-লাল ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন, এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যক ক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ক্রটী করেন না। এ কারণ আমরা উল্লিখিত ভ্রাতাদ্বয়ের পরোপকারিতা গুণের ঋণের নিমিত্ত জীবনের স্থায়ীত্ব কাল পর্য্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলাম।"

অল্পকালের মধ্যেই প্রভাকরের প্রভা আবার সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। নগর এবং গ্রাম্যপ্রদেশের সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কৃতবিদ্যগণ এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে থাকেন। কযেক বর্ষেব মধ্যেই প্রভাকর এতদূর উন্নতি লাভ করে যে, ঈশ্বচন্দ্র ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকরকে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত করেন। ভাবতবর্ষের দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে এই প্রভাকরই প্রথম প্রাত্যহিক।

প্রভাকর প্রাত্যহিক হইলে, যে সকল ব্যক্তি লিপি সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৪ সালেব ২রা বৈশাখেব প্রভাকরে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগেব মধ্যে যে যে মহোদয জীবিত আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম ,—

শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিবোমণি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, গঙ্গাধব তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপাল কৃষ্ণ মিত্র, বিশ্বম্ভর পাইন, গোবিন্দ চন্দ্র সেন, ধর্ম্মদাস পালিত, বাবু কানাই লাল ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায, উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীশম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুব, হরিমোহন সেন, জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক।"

"সীতানাথ ঘোষ, গণেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায, যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গোপালচন্দ্র দত্ত, শ্যামাচরণ বসু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ শীল, এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ইহাঁরা কেহ তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রভাকরের লেখক বন্ধুব শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হইযাছেন।"

"শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ন্যাযরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমাদিগের সম্প্রদায়েব একজন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায সহকাবী সম্পাদকের ন্যায় তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, অতএব ইহাঁদিগেব বিষয় প্রকাশ করা আতিরেক মাত্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন আমরা সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণ করি, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন।"

"রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু, ইহাঁর সদ্গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব। এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্ন চন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেল স্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহাব ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং

কবিত্ব ব্যাপারে ইঁহার অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা নর্ত্তকীর ন্যায় অভি-প্রায়ের বাদ্য তালে ইঁহার মানসরূপ নাট্যশালায় নিযত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।"

"ঠাকুরবংশীয় মহাশযদিগের নামোল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র, যেহেতু প্রভাকরের উন্নতি সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু তাহা কেবল ঐ ঠাকুরবংশের অনুগ্রহ দ্বারাই হইযাছে। মৃত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাললাল ঠাকুর, ৺চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ৺নন্দলাল ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত বাবু দ্বারকা-নাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায, বাবু মথুরানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশযেরা আমাদিগের আশার অতীত কৃপা বিতরণ করিযাছেন, এবং ইঁহাদিগের যত্নে অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমা-দিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ করিযা থাকেন।"

"এই প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরিশ চন্দ্র দেব মহাশযের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্য আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি। বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায মহাশয প্রভাকরের প্রতি অতিশয স্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্য-বর্দ্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিযা থাকেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশী প্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদা-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায, রায বৈকুণ্ঠ নাথ চৌধুরী, রায হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশযেরা আমাদিগের পত্রে সমাদর করিযা, উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ যত্নশীল আছেন।"

প্রভাকরের বর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং সাহায্যকারী সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। বঙ্গদেশের প্রায সমস্ত সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কলিকাতার প্রায সমস্ত ধনবান এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রভাকরের গ্রাহক ছিলেন। মূল্যদানে অসমর্থ অনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিনামূল্যে প্রভাকর দান করিতেন। তাহার সংখ্যাও ৩।৪ শত হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালীগণও গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিয়ত স্থানীয প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইতেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা সংবাদ প্রেরণে প্রভাকরের বিশেষ উপকার করেন। প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালার সংবাদপত্র সমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লয়।

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ডপীড়ন" নামে একখানি পত্রের সৃষ্টি করেন। ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, "১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ডপীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধ-পুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ড-পীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনেক কৃতঘ্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্ম্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগ দান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।"

সম্বাদ ভাস্কর-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক দিন হইতেই মিত্রতা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাস্কর-সম্পাদক তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্ব্বে বন্ধুরূপে এই প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন, এক্ষণে সময়াভাবে আর সেরূপ পারেন না।"

১২৫৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় লেখেন, "ভাস্কর-সম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইক্ষণে যে গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকারে লিপি দ্বারা অস্মৎ পত্রের আনুকূল্য করিতে পারেন? তিনি ভাস্কর পত্রকে অতি প্রশংসিত রূপে নিষ্পন্ন করিয়া বন্ধুগণের সহিত আলাপাদি কবেন, ইহাতেই তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করি। বিশেষতঃ সুখের বিষয় এই যে, সম্পাদকের যে যথার্থ ধর্ম্ম, তাহা তাঁহাতেই আছে।"

এই ১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশেব সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ডপীডন" এবং তর্কবাগীশ "রসরাজ" পত্র অবলম্বনে কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি, এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। দেশের সর্ব্বসাধারণে সেই লড়াই দেখিবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে। সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্রেরই জয় হয়।

কিন্তু দেশের রুচিকে বলিহারি! সেই কবিতা যুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আমি এক সংখ্যা মাত্র রসরাজ একদিন দেখিয়াছিলাম। চারি পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়া

গেল না। মনুষ্য ভাষা যে এত কদর্য্য হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানে না। দেশের লোকে এই কবিতা যুদ্ধে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিহারি রুচি! আমার স্মরণ হইতেছে, দুই পত্রের অশ্লীলতায় জ্বালাতন হইয়া, লং সাহেব অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্নবান্ ও কৃতকার্য্য হয়েন। সেই দিন হইতে অশ্লীলতা পাপ আর বড় বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যায় না।

অনেকের ধারণা যে, এই বিবাদ সূত্রে উভয়ের মধ্যে বিষম শত্রুতা ছিল। সেটী ভ্রম। তর্কবাগীশ গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে সময়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হন, তর্কবাগীশও সে সময়ে রুগ্নশয্যায় পতিত ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে আসিতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তর্কবাগীশ সেই রুগ্নশয্যায় শয়ন করিয়া ভাস্করে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল,—

"প্রশ্ন। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোথায়?

উত্তর। স্বর্গে।

প্র। কবে গেলেন?

উ। গত শনিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়াছিলেন, রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টাকালে গমন করিয়াছেন।

প্র। তাঁহার গঙ্গাযাত্রা ও মৃত্যুশোকের বিষয়, শনিবাসরীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন?

উ। কে লিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত।

প্র। কতদিন?

উ। একমাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুইটী নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও প্রভাকর-সম্পাদকের মৃত্যুশোক স্বহস্তে লিখিবেন, আর যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন বিবরণ ও মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল।"

তর্কবাগীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক একপক্ষ পরেই অর্থাৎ ১২৬৪ সালের ২৪এ মাঘ প্রাণত্যাগ করেন।

পাষণ্ডপীড়ন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এখানিতে তাঁহার ছাত্র-

মণ্ডলির কবিতা ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইত। "সাধুরঞ্জন" ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর [পর] কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।

অল্প বয়স হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফস্বলের অনেকগুলি সভায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিনী সভা, দর্জ্জিপাড়ার নীতিসভা প্রভৃতির সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিতেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই, তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামরঙ্গিণী, শ্যামতরঙ্গিণী, নববাহিনী, ভবদাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায়, তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই। কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামবক্ষিণী সভা, হাটে হাটভঞ্জিনী, মাঠে মাঠসঞ্চারিণী, ঘাটে ঘাটসাধনী, জলে জলতরঙ্গিণী, স্থলে স্থলশায়িনী, খানায় নিখাতিনী, ডোবায় নিমজ্জিনী, বিলে বিলবাসিনী, এবং মাচার নীচে অলাবুসমপহারিণী সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।

সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাদুর্ভাব। এ কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নানা স্কুল কমিটির মেম্বর ইত্যাদি ছিলেন—আবার ও দিগে কবির দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিতেন। নগর এবং উপনগরের সখের কবি এবং হাফ আখড়াই দল সমূহের সংগীতসংগ্রামের সময় তিনি কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত হইয়া সংগীত রচনা করিয়া দিতেন। অনেক স্থলেই তাঁহার রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় তাঁহারই জয় হইত। সখের দল সমূহ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত, তাঁহাকে পাইলে আর অন্য কবির আশ্রয় লইত না।

সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটী নূতন অনুষ্ঠান করেন। নববর্ষে অর্থাৎ প্রতিবর্ষের ১লা বৈশাখে তিনি স্বীয় যন্ত্রালয়ে একটি মহতী সভা সমাহূত করিতে আরম্ভ করেন। সেই সভায় নগর, উপনগর, এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এবং সে সময়ের সমস্ত বিদ্বান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইতেন। কলিকাতার ঠাকুরবংশ, মল্লিকবংশ, দত্তবংশ, শোভাবাজারের দেববংশ প্রভৃতি সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা সেই সভায় উপস্থিত হইতেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সভায় মনোরম পবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিয়া, সভাস্থ সকলকে তুষ্ট করিতেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহাদিগের রচনা

উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা তাহা পাঠ করিতেন। যে সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা নগদ অর্থ পুরস্কার স্বরূপ পাইতেন। নগর ও মফস্বলের অনেক সম্ভ্রান্তলোক ছাত্রদিগকে সেই পুরস্কার দান করিতেন। সভাভঙ্গের পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমন্ত্রিত প্রায় চারি পাঁচ শত লোককে মহাভোজ দিতেন।

প্রাত্যহিক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র, এবং তাহাতে সম্পাদকীয় উক্তি এবং সংবাদাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিতে হইত, এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে মনের সাধে কবিতা লিখিতে পারিতেন না। সেই জন্যই তিনি ১২৬০ সালের ১লা তারিখ হইতে এক এক খানি স্থূলকায় প্রভাকর প্রতিমাসের ১লা তারিখে প্রকাশ করিতেন। মাসিক প্রভাকরে নানাবিধ খণ্ড কবিতা ব্যতীত গদ্যপদ্যপূর্ণ গ্রন্থও প্রকাশ করিতে থাকেন।

প্রভাকরের দ্বিতীয়বার অভ্যুদয়ের কয়েক বর্ষ পর হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র দৈনিক প্রভাকর সম্পাদনে ক্ষান্ত হয়েন। কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন এবং বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনা হইলে, তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন। সহকারী সম্পাদক বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন। মাসিক পত্র সৃষ্টির পর হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, তাহা সম্পাদন করিতেন। শেষ অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের দেশ পর্য্যটনে বিশেষ অনুরাগ জন্মে, সেই জন্যই তিনি সহকারীর হস্তে সম্পাদনভার দান করিয়া, পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন। কলিকাতায় থাকিলে, অধিকাংশ সময়ে উপনগরের কোন উদ্যানে বাস করিতেন।

শারদীয়া পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তিনি পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশ দর্শনে কবিতা প্রণয়ন পূর্ব্বক প্রভাকরে প্রকাশ করেন। আদিশূরের যজ্ঞস্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌড় দর্শন করিয়া তাহার ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে কবিতা রচনা করেন। গয়া, বারানসী, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণে বর্ষাধিক কাল অতিবাহিত করেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেই খানেই সমাদর এবং সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন না, তাঁহারাও তাঁহার মিষ্টভাষিতায় মুগ্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই ভ্রমণসূত্রে স্বদেশের সকল প্রান্তের সম্ভ্রান্ত লোকের সহিতই তাঁহার আলাপ পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, মফস্বলের ধনবান জমীদারগণ মহানন্দ প্রকাশ করিতেন এবং অযাচিত হইয়া পাথেয়স্বরূপ পর্য্যাপ্ত অর্থ এবং নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিতেন। যাঁহার সহিত একবার

আলাপ হইত, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের মিত্রতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেন। মিষ্টভাষিতা এবং সরলতার দ্বারা তিনি সকলেরই হৃদয় হরণ করিতেন। ভ্রমণকালে কোন অপরিচিত স্থানে নৌকা লাগিলে, তীরে উঠিয়া পথে যে সকল বালককে খেলিতে দেখিতেন, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া, তাহাদিগের বাটীতে যাইতেন। তাহাদিগের বাটীতে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কোন ফল মূল দেখিতে পাইলে চাহিয়া আনিতেন। ইহাতে কোন হীনতা বোধ করিতেন না। বালকদিগের অভি-ভাবকগণ শেষ ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, যথাসাধ্য সমাদর করিতে ক্রটী করিতেন না। ভ্রমণকালে বালকদিগকে দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে ডাকিয়া গান শুনিতেন এবং সকলকে পয়সা দিয়া তুষ্ট করিতেন।

প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাঁহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ষকাল নানা স্থান পর্য্যটন, এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া, শেষ সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন। বাঙ্গালীজাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগী। সর্ব্বাদৌ ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকষ্টে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তৎপ্রণীত "কালীকীর্ত্তন" ও "কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে পর্য্যায়-ক্রমে প্রতি মাসের প্রভাকরে রামনিধি সেন (নিধুবাবু), হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাসু ও নৃসিংহ এবং আরও কয়েকজন প্রাচীন খ্যাতনামা কবির জীবনচরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল. কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

মৃত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং তৎপ্রণীত অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা এবং পদাবলী বহুপরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া, সন ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে প্রকাশ করেন। সেই সনের আষাঢ় মাসে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ।

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে "প্রবোধ প্রভাকর" নামে গ্রন্থ প্রকাশারম্ভ হইয়া, সেই সনের ১লা ভাদ্রে তাহা শেষ হয়। পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন সেই পুস্তক প্রণয়ন কালে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন। উক্ত সনের ১লা চৈত্রে "প্রবোধপ্রভাকর" স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়।

তৎপরে প্রতিমাসের মাসিক প্রভাকরে ক্রমান্বয়ে "হিতপ্রভাকর" এবং

"বোধেন্দুবিকাশ" প্রকাশ ও সমাপ্ত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অনুজ বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত পরে পুস্তকাকারে "হিতপ্রভাকর" ও "বোধেন্দুবিকাশের" প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। তিনখানি পুস্তকেরই দ্বিতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত আছে।

কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস এবং নীতিবিষয়ক অনেক গুলি কবিতা "নীতিহার" নামে প্রভাকরে প্রকাশ করেন।

১২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাসিক প্রভাকর সম্পাদনের পর ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মঙ্গলাচরণ এবং পরবর্ত্তী কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ করিয়াই তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন।

অবিশ্রান্ত মস্তিষ্ক চালনাসূত্রে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইত। সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে জলপথে এবং স্থলপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রম বৃদ্ধি হয়। মাসিক পত্র সম্পাদন এবং উপর্য্যুপরি কয়খানি গ্রন্থ এই সময় হইতে লিখেন। কিন্তু এই সময়টীই তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্নকালস্বরূপ সমুজ্জ্বল।

১২৬৫ সালের মাঘের মাসিক প্রভাকর সম্পাদন করিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন। শেষ তাহা বিকারে পরিণত হয়। উক্ত সনের ৮ই মাঘের প্রভাকরের সম্পাদকীয় উক্তিতে নিম্নলিখিত কথা প্রকাশ হয়,—

"অদ্য কয়েক দিবস হইতে আমারদিগের সর্ব্বাধ্যক্ষ কবিকুলকেশরী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় জ্বরবিকার রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আছেন। শারীরিক গ্লানি যথেষ্ট হইয়াছিল, সদ্রূপযুক্ত গুণযুক্ত এতদ্দেশীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন। তদ্দ্বারা শারীরিক গ্লানি অনেক নিবৃত্তি পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে রোগ নিঃশেষ হয় নাই।"

ঈশ্বরচন্দ্রের রোগের সংবাদ প্রকাশ হইবামাত্র দেশের সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং মিত্রমণ্ডলী দুঃখিতান্তঃকরণে ঈশ্বর চন্দ্রকে দেখিতে যান। অনেকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট অবস্থান, তত্ত্বাবধান এবং চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দান করিতে থাকেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পীড়ায় সাধারণকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন এবং বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, পরদিনের অর্থাৎ ৯ই মাঘের প্রভাকরে তাঁহার অবস্থার ও চিকিৎসার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

তৎপর দিন অর্থাৎ ১০ই মাঘের প্রভাকরে তাহার পর বৃত্তান্ত লিখিত হয়। পীড়ায় সকল মনুষ্যেরই দুঃখ সমান— সকল চিকিৎসকেরই বিদ্যা সমান এবং সকল ব্যাধিরই পরিণাম শেষ এক। অতএব সে সকল কিছুই উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

১০ই মাঘ শনিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া আসিলে, হিন্দুপ্রথামত তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। ১২ই মাঘ সোমবারের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র লেখেন,—

"সংবাদ প্রভাকরের জন্মদাতা ও সম্পাদক আমার সহোদর পরমপূজ্যবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় গত ১০ই মাঘ শনিবার রজনী অনুমান দুই প্রহর এক ঘটিকা কালে ৺ ভাগিরথীতীরে নীরে সজ্ঞানে অনবরত স্বীয়াভিষ্টদেব ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক এতন্মায়াময় কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারে গমন করিয়াছেন।"

এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্য তাঁহার স্বহস্তগঠিত।

তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া, অনুজ রামচন্দ্রের সহিত পরান্নে প্রতি-পালিত হইয়াছিলেন। একদা সেই সময়ে রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "ভাই! আমাদিগের মাসিক ৪০৲ টাকা আয় হইলে, উত্তমরূপে চলিবে।" শেষ প্রভাকরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের দৈন্যদশা বিদূরিত হইয়া, সম্ভ্রান্ত ধনবানের ন্যায় আয় হইতে থাকে। প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা আসিত। তদ্ব্যতীত সাধারণের নিকট হইতে সকল সময়েই বৃত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। একদা অনুজ রামচন্দ্রকে অর্থোপার্জ্জনে উদাসীন দেখিয়া বলিয়াছিলেন "আমি একদিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি, তোর দশা কি হইবে?" বাস্তবিক ঈশ্বরচন্দ্রের সেইরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র মমতা ছিল না। পাত্রাপাত্র ভেদ জ্ঞান না করিয়া সাহায্যপ্রার্থী মাত্রকেই দান করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রতিনিয়তই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন, ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহাদিগকে নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি দান ব্যতীত সময়ে সময়ে অর্থসাহায্য করিতেন। পরিচিত বা সামান্য পরিচিত ব্যক্তি, ঋণ প্রার্থনা করিলে, তদ্দণ্ডেই তাহা প্রদান করিতেন। কেহ সে ঋণ পরিশোধ না করিলে, তাহা আদায় জন্য ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করিতেন না। এই

সূত্রে তাঁহার অনেক অর্থ পরহস্তগত হয়। সমধিক আয় হইতে থাকিলেও তাহার রীতিমত কোন হিসাবপত্র ছিল না। ব্যয় করিয়া যে সময়ে যত টাকা বাঁচিত, তাহা কলিকাতার কোন না কোন ধনীলোকের নিকট রাখিয়া দিতেন। তাহার রসিদপত্র লইতেন না। তাহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (!!) সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করেন। রসিদ অভাবে তদীয় ভ্রাতা তৎসমস্ত আদায় করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাটীর দ্বার অবারিত ছিল। দুই বেলাই ক্রমাগত উনুন জ্বলিত, যে আসিত, সেই আহার পাইত। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া, আত্মীয় মিত্র এবং ধনী লোকদিগকে আহার করাইতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিবৎসর বাঙ্গালার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট হইতে মূল্যবান শাল উপহার পাইতেন। তৎসমস্ত গাঁটরি বাঁধা থাকিত। একদা একজন পরিচিত লোক বলিলেন, "শালগুলা ব্যবহার করেন না, পোকায় কাটিবে, নষ্ট হইয়া যাইবে কেন , বিক্রয় করিলে, অনেক টাকা পাওয়া যাইবে। আমাকে দিউন, বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দিব।" ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েক শত টাকা মূল্যের এক গাঁটরি শাল তাহাকে দিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি আর টাকাও দেয় নাই, শালও ফিরিয়া দেয় নাই, ঈশ্বরচন্দ্রও তাহার আর কোন তত্ত্বও লয়েন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে যদিও উদ্ধত, অবাধ্য এবং স্বেচ্ছানুরক্ত ছিলেন, বয়োবৃদ্ধিসহকারে সে সকল দোষ যায়। তিনি সদাই হাস্যবদন, মিষ্ট কথা, রসের কথা, হাসির কথা নিয়তই মুখে লাগিয়া থাকিত। রহস্য এবং ব্যঙ্গ তাহার প্রিয় সহচর ছিল। কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ছিলেন। কথায় হউক, বক্তৃতায় হউক, বিবাদে হউক, কবিতায় হউক, গীতে হউক, লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। সামান্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন। শত্রুরাও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত।

চরিত্রটী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিল না। পানদোষ ছিল। প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তিনি সুরাপান করিতেন, সে সময়ে লেখনী অনর্গল কবিতা প্রসব করিত। যে কোন শ্রেণীর যে কোন পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি যে কোন সময়ে তাঁহাকে যে কোন প্রকার কবিতা, গীত বা ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিতে অনুরোধ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তাহাদিগের আশা পূর্ণ করিতেন। কাহাকেও নিরাশ করিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সুরাপান করিতেন।—

এক (১) দুই (২) তিন (৩) চারি (৪) ছেড়ে দেহ ছয় (৬)।
পাঁচেরে (৫) করিলে হাতে রিপু রিপু নয়।
তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটি।
বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি ॥
পাত্র হোয়ে পাত্র পেয়ে ঢোলে মারি কাটি।
ঝোলমাখা মাছ নিয়া চাটি দিয়া চাটি ॥

তিনি সুরাপান করিতেন, এ জন্য লোকে নিন্দা করিত। তাই ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যে মধ্যে কবিতায় তাহাদিগের উপর ঝাল ঝাড়িতেন। ঋতু কবিতার মধ্যে পাঠক এই সংগ্রহে দেখিতে পাইবেন।

যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক, স্কুলের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্মৃতিপথে বড় সমুজ্জ্বল। তিনি সুপুরুষ, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন। কথার স্বর বড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একটু গম্ভীরভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন— তাঁহার কতকগুলা নন্দীভৃঙ্গী থাকিত—রসাভাষের ভার তাহাদের উপর পড়িত। ফলে তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পারিতেন না। স্বপ্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভালবাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদিগকেও শুনাইতে ঘৃণা করিতেন না। কিন্তু হেমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার আবৃত্তিশক্তি পরিমার্জ্জিত ছিল না। যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কবিতা রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়া ছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র— তিনিই প্রথম প্রাইজ পান। তাঁহার রচনা প্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল— সরল স্বচ্ছ— দেশী কথায়, দেশী ভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়সেই

(১) কাম
(২) ক্রোধ,
(৩) লোভ,
(৪) মোহ,
(৬) মাৎসর্য্য
(৫) মদ। "রিপু রিপু নয়" অর্থাৎ "মদ শব্দ এখানে রিপু অর্থে বুঝিবে না।

তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধহয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র, সকলেই গিয়াছে—তাঁহাদের কথাগুলি লিখিবার জন্য আমি আছি।

সুরাপান করুন, আর পাঁটার স্তোত্র লিখুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না। সামান্য বেশে সামান্য ভাবে অবস্থান করিতেন। যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও ধনী ব্যক্তির উপযোগী সাজ সজ্জা কিছুই করিতেন না। বৈঠকখানায় একখানি সামান্য গালিছা বা মাতুর পাতা থাকিত, কোন প্রকার আসবাব থাকিত না। সম্ভ্রান্ত লোকেরা আসিয়া তাহাতে বসিয়াই ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কবিত্ব

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি?

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে জ্ঞানীমাত্রকেই কবি বলিত। শাস্ত্রবেত্তারা সকলেই "কবি।" ধর্ম্মশাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষশাস্ত্রকারও কবি।

তার পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। "কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ" এখানে অর্থটা ইংরেজি Poet শব্দের মত। তার পর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে "কবির লড়াই" হইত। দুই দল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম "কবি।"

আবার আজকাল কবি অর্থে Poet, তাহাকে [বুঝিতে?] পারা যায়, কিন্তু "কবিত্ব" সম্বন্ধে আজকাল বড় গোল। ইংরেজিতে যাহাকে Poetry বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি না আমরা বিচার করিতে বাধ্য।

পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না, যে এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইতে বসিব। অনেক ইংরেজ বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এই মাত্র বক্তব্য যে সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরামালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না, কাশী-রামের মত সুভদ্রাহরণ কি শ্রীবৎসচিন্তা, কীর্ত্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, মুকুন্দ-রামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণায় ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম, এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে, যে তার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত

অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ সকল, আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া, আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা পারিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা মধুসূদনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্নশ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল না?

রহিল বৈকি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈকি। ঈশ্বর গুপ্ত, সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্ব্বণে পিটাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও— তিনি চালের দরটি কষিয়া দেখিয়া তার ভিতর একটু রস পান।

মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে
ভাঙ্গা মন আর গড়ে না কো।

তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উনুন গোড়ায় বসাইয়া, শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের সংসারের এক রকম খাঁটী কাব্যরস বাহির করেন,—

বধুর মধুর খনি, মুখশতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছলছল।

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধূঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপ্সেমাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বীভাব

দেখেন, পাটায় বোকা গন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, "তোমাদের এদেশ, এ সমাজ বড় রঙ্গভরা। তোমরা মাথা কুটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি— তোমরা এ ওকে ফাঁকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী, বড় মনোমোহিনী— প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার,— তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি উহারা বড় রঙ্গের জিনিস। মানুষে যেমন রূপী বাঁদর পোষে, আমি বলি পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ পোষে— উভয়কে মুখ ভেঙ্গানতেই সুখ।" স্ত্রীলোকের রূপ আছে— তাহা তোমার আমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন, উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে— উহা দেখিয়া হাসিবার কথা। তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময় যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য, যুবতিগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়ত, সেই নীহারশীতল স্বচ্ছসলিল-ধৌত কম্পিতকান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, "দেখ— দেখি! কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময় পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাহাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর।" তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া, বলিবে, "ধন্য স্বামীপুত্রসেবাব্রত! ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য!" ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন, রন্ধনের চাল চর্ব্বণেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামী ভোজন করাইবার সময়ে শাশুড়ী ননদের মুণ্ড ভোজন হইল, এবং কুটুম্বভোজনের সময় লজ্জার মুণ্ড ভোজন হইল। স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ, এবং পরশ্রীকাতরতাপরিপূর্ণ। পড়িয়া বোধ হয়, ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে— দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে— এই নরঘাতিনী রসিকতাও এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে। হুতোম পেঁচার নকসা বিদ্বেষপরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি

দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি। গৌরীশঙ্করকে গালি দিবার সময়েও রাগ করিয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিগীষা— ব্রাহ্মণকে কুভাষায় পরাজয় করিতে হইবে এই জিদ। কবির লড়াই, ঐ রকম শত্রুতাশূন্য গালাগালি। ঈশ্বর গুপ্ত "কবির লড়াইয়ে" শিক্ষিত— সে ধরণটা তাঁহার ছিল।

অন্যত্র তাও না—কেবল আনন্দ। যে যেখানে সমুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে একটা কানমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন—কারণ আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য। কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, কৌন্‌সিলের মেম্বর হইতে, মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা কেহ ছাড়া নাই। এক একটি চড় চাপড় এক একটি বজ্র—যে মারে, তাহার রাগ নাই, কিন্তু যে খায়, তার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাতে আবার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন,—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল—

সিন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।
নসী যশী ক্ষেমী বামী, রামী শ্যামী গুল্‌কী॥

মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitatorদের কাণ ধরিয়া টানাটানি—

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙ্গে না।
আমরা ভুসি পেলেই খুসী হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না॥

সাহেব বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণমলা খাইয়াছেন— একটা নমুনা—

যখন আসবে শমন, করবে দমন,
কি বোলে তায় বুঝাইবে।

বুঝি হুট্ বোলে বুট পায়ে দিয়ে
চুরট ফুঁকে স্বর্গে যাবে?

এক কথায়, সাহেবদের নৃত্যগীত—

গুড়ু গুড়ু গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥

সখের বাবু বিনা সম্বলে,—

তেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হন, পচাশাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটোকাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে॥

কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঐ ধরণ নাই। অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গরস, কেবল আনন্দ। তপসে মাছ লইয়া আনন্দ—

কষিত কনক কান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপদাড়ি, তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥

অথবা আনারসে—

লুন মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিনি তায় ভরি॥

অথবা পাঁটা—

সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি ক'রেন বাদ্য আপনার নাশে॥
হাড়কাটে ফেলে দিই, ধোরে দুটি ঠ্যাঙ্গ।
সে সময়ে বাদ্য করে, ছ্যাডাঙ্গ ছ্যাডাঙ্গ॥
এমন পাঁটার নাম, যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা॥

তবে ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন। মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি সাহেবেরা গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, "নস্যলোসা দধিচোসার" দল, গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি খ্রীষ্টিয়ান হইতে চলিল

দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনরিদিগের ধর্ম্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিক্সের উপর রাগ। যথাস্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাইবেন, এ জন্য এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না।

অনেক সময় ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধসম্ভূত। অশ্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোষ। উহা বাদ দিতে গিয়া, ঈশ্বর গুপ্তকে Bowdlerize করিতে গিয়া, আমরা তাঁহার কবিতাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি কাব্যরসে যথার্থ রসিক, তিনি আমাদিগকে নিন্দা করিবেন। কিন্তু এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কোনরূপেই অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র রাখিতে পারি না। ইহাও জানি যে, ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা, প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইন্দ্রিযাদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্য-ভাবের অভিব্যক্তির জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহাসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। ঋষিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্ম্মাত্মা, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সভ্য, সুশীল, সজ্জন, এমন সকল লোকও, কুকাজ দেখিয়াই রাগিলেই "বদ্‌জোবান" আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে সে সময় ধর্ম্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা উভয়কেই অশ্লীলতায় সুপটু দেখিতাম— প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্ম্মাত্মা। যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল তিনি পাপাত্মা। সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটী সোনা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল— মার বদলে বিমাতা। তার পর যৌবনের যে অমূল্যরত্ন— শুধু যৌবনের কেন, যৌবনের, প্রৌঢ়বয়সের, বার্দ্ধক্যের তুল্যরূপেই অমূল্যরত্ন যে ভার্য্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যদি গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর অল্পবয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকষ্টে

পড়িলেন। কত বানরে, বানরের অট্টালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর সর পায়সান্ন ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া, শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত। কত কুক্কুর বা মর্কট বরুষে জুড়ী জুতিয়া, তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্দেবী ধারণ করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙ্গিযা উঠিতে পারেন না। দুর্ব্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিযা, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলাযন করিযা, দুঃখের গহ্বরে লুকাইযা থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালীরা প্রায়ই বলবান।

ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে সমাজকে, স্বীয বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায করিযা লইলেন। কিন্তু অত্যাচারজনিত যে ক্রোধ তাহা মিটিল না। জোঠা মহাশযের জুতা তিনি সমাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইযা বিলক্ষণ উত্তম-মধ্যম দিতে লাগিলেন। সেকেলে বাঙ্গালির ক্রোধ কদর্য্যের উপর কদর্য্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধ হয ইহাদের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদ্বিজাদি প্রভৃতি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র, তাহারই প্রতি ব্যবহার্য্য যে দুরাত্মা, তাহার জন্য এই কদর্য্য ভাষা। এইরূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায অশ্লীলতা আসিযা পড়িযাছে।

আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, তাহা ছাড়া অন্য বিষয়ে অশ্লীলতাও তাঁহার কবিতায আছে। কেবল রঙ্গদারির জন্য, শুধু ইযারকির জন্য এক আধটু অশ্লীলতাও আছে। কিন্তু দেশ-কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায। সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিযা গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিযা গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোরকবি, চোরপঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইযা লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা-পার্ব্বণ অশ্লীল— উৎসবগুলি অশ্লীল— দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্র বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী হাফ-আকড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত সেই বাতাসে জীবন প্রাপ্ত ও বর্দ্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনাযাসে একটুখানি মার্জ্জনা করিতে পারি।

আর একটা কথা আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্যসমাজেই ঘৃণিত। তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার।

এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজেরা করেন না। ইংরেজের কাছে, প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল —ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, পায়জামা বা উরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা, ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষে মুখ-চুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার। কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য্য— মাতৃপিতৃ সমক্ষেই উহা নির্ব্বাহ পাইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা দেশী জিনিস সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতি জিনিস সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন, যে তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখচুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ! আলতা পরা মলপরা পা! দর্শনে বিশেষ আপত্তি। ইহাতে আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতি রুচিবিরুদ্ধ। স্তন বিলাতি রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্যবাবু হয় ত ইহা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রী মুখচুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা-কীর্ত্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদিগের জননী। তাই তাঁকে ভক্তিভাবে, স্নেহ করিয়া "মাতা বসুমতী" বলি; আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে মাতৃস্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই— থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহে,— এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে— দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতি রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মসুর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা-শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল। এই শিক্ষা আমরা

ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিতে রাজি। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, যে আর অনেক স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্য্য, যথার্থ অশ্লীল, এবং বিরক্তিকর। তাহার মার্জ্জনা নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের যে অশ্লীলতার কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়া মুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অশ্লীলতাদোষ জন্যই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে তাঁহার কবিতার এই দোষের এত বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে এই দোষ তাঁহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে, তাহার দোষ গুণ দুই বুঝাইতে হয়। শুধু তাই নাই। তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিস পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র— তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্ত্তি— তাহা ত আমাদের হাতেই আছে— পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, একজন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় আসিয়া, সাহিত্যে ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে? তাহাও দেখিতে পাই— নিজ প্রতিভাগুণে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই। প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে। এখন ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম, যে প্রতিভা ও সুরুচি পরস্পর সখী— প্রতিভার অনুগামিনী সুরুচি। ঈশ্বর গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে

হইবে। তাই আমি দেশের রুচি বুঝাইলাম, কালের রুচি বুঝাইলাম, এবং পাত্রের রুচি বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে পাত্রের রুচির অভাবের কারণ, (১) পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্ম্মিণী, অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম্ম শিক্ষা করি, তাঁহার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার, এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে প্রভাকরের তেজোহ্রাস করিয়াছিল এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশ্লীল, তখন কুরুচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় কোথাও কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ প্রতিবিম্বের সাহায্যে প্রতিবিম্বধারী সত্বাকে বুঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতা দোষ এত সবিস্তারে সমালোচনা করিলাম। ব্যাপারটা রুচিকর নহে। মনে করিলে, নমঃ নমঃ বলিয়াই দুই কথায় সারিয়া যাইতে পারিতাম। অভিপ্রায় বুঝিয়া বিস্তারিত সমালোচনা পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

মানুষটা কে, আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক— কবিতা না হয় এখন থাক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেখিতে পাই, মুখের আটক পাটক কিছুই নাই। অশ্লীলতায় ঘোর আমোদ, ইয়ারকি ভরা,— পাঁটার স্তোত্র লেখেন, তপসে মাছের মজা বুঝেন, লেবু দিয়া আনারসের পরম ভক্ত, সুরাপান* সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠ— আবার বিলাসী কারে বলে? কথাটা বুঝিয়া দেখা যাউক।

এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত কতকগুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতা পাইবেন। অনেকের পক্ষে ঐ গুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু যদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে সেগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। দেখিবেন সেগুলি ফরমায়েশি কবিতা নহে। কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে। অনেকগুলির মধ্যে ঐ কয়টী বাছিয়া দিয়াছি— আর বেশী দিলে রসিক বাঙ্গালী পাঠকের বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে পদ্যে যত লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ পদ্যসংগ্রহ বলিয়া, আমরা

* সুরাপানের মার্জ্জনা নাই। মার্জ্জনার আমিও কোন কারণ দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির এই উক্তিটী স্মরণ করিতে বলি— একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

তাঁহার গদ্য কিছুই উদ্ধৃত করি নাই, কিন্তু সে গদ্য পড়িয়া বোধ হয়, যে পদ্য অপেক্ষাও বুঝি গদ্যে তাঁহার মনের ভাব আরও সুস্পষ্ট। এই সকল গদ্য পদ্যে প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব, যে ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম্ম, একটা কৃত্রিম ভান ছিল না। ঈশ্বরে তাঁর আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি মদ্যপ হউন, বিলাসী হউন, কোন হবিষ্যাশী নামাবলীধারিতে সেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই না। সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বরভক্তের মত তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন, যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ পিতা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন। কখনও বাপের আদর খাইবার জন্য কোলে বসিতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত আদর করিতেন— উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটা বাধাইতেন। বলিতে কি, তাঁহার ঈশ্বরে গাঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই, যে মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বর সম্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া, তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া ফাটাইয়া দিতেছেন। বাপ নিরাকার নির্গুণ চৈতন্য মাত্র, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বাপ নহেন, একথা মনে করিতেও অনেক সময়ে কষ্ট হইত।*

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান।
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কান॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে, কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হোয়ে তুমি হলে কালা॥
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।
অধীর হ'লেম ভেবে, বধির জানিয়া॥

এ ভক্তের স্তুতি নহে—এ বাপের উপর বেটার অভিমান। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নহি।

* এই সংগ্রহের ৫৯ পৃষ্ঠায় কবিতাটি পাঠ কর।

ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরভক্তির যথার্থ স্বরূপ যিনি অনুভূত করিতে চান, ভরসা করি তিনি এই সংগ্রহের উপর নির্ভর করিবেন না। এ সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ত ও পাঠ্য করিবার জন্য ইহা নানা দিকে সঙ্কীর্ণ করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কতকগুলি গদ্য পদ্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তি বুঝিতে পারিবেন। সেগুলি যাহাতে পুনর্মুদ্রিত হয়, সে যত্ন পাইব।

বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুমদাদি দাস্যভাবে, শ্রীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দযশোদা পুত্রভাবে, এবং গোপীগণ কান্তভাবে সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার সকল আমাদিগের হইতে এতদূর সংস্থিত, যে তদালোচনায় আমাদের যাহা লভনীয়, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না। যদি হনুমান, উদ্ধব, যশোদা বা শ্রীরাধাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে সাধনা বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত। বাঙ্গালার দুইজন সাধক, আমাদের বড় নিকট। দুইজনই বৈদ্য, দুইজনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পুত্র, বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন— ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার॥
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি।
জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বসেছি॥
তুমি গুপ্ত, আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্ত ভাবে ভাব গুপ্ত রয়?

পুনশ্চ— আরও নিকটে—

তোমার বদনে যদি, না সরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন॥
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়॥

যার এই ঈশ্বরভক্তি— যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্ব্বদা নিকটে, অতি নিকটে দেখে— ঈশ্বর-সংসর্গতৃষ্ণায় যাহার হৃদয় এইরূপে দগ্ধ— সে কি বিলাসী হইতে

পারে? হয় হউক। আমরা এরূপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই না।

তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাশী বা অভোক্তা ছিলেন না। পাঁটা, তপ্‌সে মাছ বা আনারসের গুণ গায়িতে ও রসাস্বাদনে, উভয়েই সক্ষম ছিলেন। যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন। তাঁহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ;—

লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে।
কিছু মাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার, মন নাহি সরে।
প্যাঁচা লিয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে॥

শাকান্নমাত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসী-মধ্যে গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি না। গীতায় ভগবদুক্তি এই—

আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
স্নিগ্ধারস্যাস্থিরাহৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

স্থূলকথা এই, আগে যাহা বলিয়াছি— ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু, এবং মেকি ধর্ম্মের শত্রু। লোভী, পরদ্বেষী অথচ হবিষ্যাশী ভণ্ডের ধর্ম্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। ভণ্ডের ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া তিনি জানিতেন না। তিনি জানিতেন ধর্ম্ম ঈশ্বরানুরাগে, আহার ত্যাগে নহে। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়া পানাহারত্যাগকে ধর্ম্মের স্থানে খাড়া করিতে চাহিত— তিনি তাহার শত্রু। সেই ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ পাঁটার স্তোত্র, আনারসের গুণগানে এবং তপ্‌সের মহিমা বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত। মানুষটা বুঝিলাম, নিজে ধার্ম্মিক, ধর্ম্ম খাঁটি, মেকির উপর খড়্গহস্ত। ধার্ম্মিকের কবিতায় অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয়, তাহা বুঝিয়াছি। বিলাসিতা কেন দেখি বোধহয় তাহা এখন বুঝিলাম।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথায়, ব্যঙ্গের কথা হইতে তাঁহার অশ্লীলতার কথায়, অশ্লীলতার কথা হইতে তাঁহার বিলাসিতার কথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায়, তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়। অনুপ্রাস যমকের অনুরোধে

অর্থের ভিতর কি ছাই ভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না— দেখিয়া অনেক সময়ে রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ, দেশ কাল পাত্র! সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ী। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বেই— কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে, ইহার বেশী বাড়াবাড়ী। দাশরথি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পটু— তাই তাঁর পাঁচালী লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমন নহে, কিন্তু অনুপ্রাস যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; পাঁচালিওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই। এই অলঙ্কার প্রয়োগের পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই— এত অনুপ্রাস যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে না। এখানেও মার্জ্জিত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়।

অনুপ্রাস যমক যে সর্ব্বত্রই দূষ্য এমত কথা আমি বলি না। ইংরেজিতে ইহা বড় কদর্য্য শুনায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে— অনুপ্রাস যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া, পরিমিতভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে। বাঙ্গালাতেও তাই। মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন,— বড় বুঝিয়া সুঝিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া, ব্যবহার করেন— মধুর হয়। শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন, দুই এক বুঁদ অনুপ্রাস ছাড়িয়া দেন— রস উছলিয়া উঠে। ঈশ্বর গুপ্তেরও এক একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে—

বিবিজান চলে যান লবেজান করে।

ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা সরহদ্দ নাই— একবার অনুপ্রাস যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোনদিগে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এইরূপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগীশূন্য অধিপতি। এই দোষ-গুণের উদাহরণস্বরূপ দুইটি গীত বোধেন্দুবিকাশ হইতে উদ্ধৃত করিলাম ;—

রাগিণী বেহাগ— তাল একতালা

কেরে, বামা, বারিদবরণী,
তরুণী, ভালে, ধরেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।

হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয় ॥
বামা, হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কাররবে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয়। ১
বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে ছলিছে ভুবনময় ॥ ২
কে রে, ললিতরসনা, বিকটদশনা,
করিযে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয় ॥ ৩

রাগিণী বেহাগ— তাল একতালা।
কে রে বামা, ষোড়শী রূপসী,
সুরেশী, এ, যে, নহে মানুষী,
ভালে শিশুশশী, করে শোভে অসি, রূপমসী, চারু ভাস।
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প,
গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি, চরণে কৃত্তিবাস ॥ ১
কে রে, করাল-কামিনী, মরালগামিনী,
কাহার স্বামিনী, ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী, দামিনীজড়িত হাস। ২
কে রে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে,
রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির অঙ্গে, করিছে তিমির নাশ। ৩
আহা, যে দেখি পর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব,
হইল খর্ব্ব, গেল রে সর্ব্ব,
চরণসরোজে, পড়িয়ে শর্ব্ব, করিছে সর্ব্বনাশ ॥ ৪
দেখি, নিকট মরণ, কর রে স্মরণ,
মরণহরণ, অভয় চরণ,
নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ ॥ ৫

ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া, তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে—যখন অনুপ্রাস যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা—দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলাকা ফুল নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্যোগী—তাহার বিশেষ কারণ তাঁহার ভাষার এই গুণ। খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড় মিঠে লাগে—ভরসা করি, পাঠকেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না, যে ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত না হয়, তাহাও দেখিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। একদিগে সংস্কৃতের স্রোতে মরাগাঙ্গে উজান বহিতেছে—কত "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাড়্‌বিপাক্ মলিম্লুচ" গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না—আর একদিগে ইংরেজির ভরাগাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে—মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষারজান, ইবোলিউশন, ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বজরা, ক্ষুদে লঞ্চের জ্বালায় দেশ উৎপীড়িত; মাঝে স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোতঃ বড় ক্ষীণ বহিতেছে। ত্রিবেণীর আবর্ত্তে পড়িয়া লেখক পাঠক তুল্যরূপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে।

ঈশ্বর গুপ্তের আর একগুণ, তাঁহার কৃত সামাজিক ব্যাপার সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি যে সকল রীতি নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা, অনেক

বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরসা করি।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব বর্ণনা নবজীবনে বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে, তাঁহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন। "বর্ষাকালের নদী", "প্রভাতের পদ্ম" প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাইবেন।

স্থূল কথা, তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী, তাঁহারা প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী। ঈশ্বর গুপ্ত আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। আমরা দুই একটা উদাহরণ দিই।

প্রথম, দেশবাৎসল্য। বাৎসল্য পরমধর্ম্ম, কিন্তু এ ধর্ম্ম অনেকদিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কি না বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে, দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে, ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় উদার নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্ন কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন,—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয়জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের, কথায় যা কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন। ২৮৪ পৃষ্ঠায় মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে কবিতাটি আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি। "মাতৃসম মাতৃভাষা" সৌভাগ্যক্রমে এখন

অনেকে বুঝিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা বলে ? "বাঙ্গালা বুঝিতে পারি" এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও না কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে, যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজিনবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া, আপনার গৌরববৃদ্ধির চেষ্টা পায়। যখন এই মহাত্মারা সমাজে আদৃত, তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে।

দ্বিতীয়, ধর্ম্ম। ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মেও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিতেন না। এখন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গৃহীত করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিশুদ্ধ, পরমমঙ্গলময় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইবার জন্য, তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্য হেতু সে সকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার প্রণীত গদ্যে পদ্যে তাহা বিশেষ জানা যায়। এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া বক্তৃতা, উপাসনাদি করিতেন। এ জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আদৃত হইতেন।

তৃতীয়। ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলাম।

এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য লিখিয়াছেন, এত আর কোন বাঙ্গালী লেখে নাই। গোপালবাবুর অনুমান, তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন। এখন যাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাইতেছে, তাহা উহার ক্ষুদ্রাংশ। যদি তাঁহার প্রতি বাঙ্গালী পাঠক সমাজের অনুরাগ দেখা যায়, তবে ক্রমশঃ আরও প্রকাশ করা যাইবে। এ সংগ্রহ প্রথম খণ্ড মাত্র। বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি যে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি এমন নহে। যদি সকল ভাল কবিতাগুলিই প্রথম খণ্ডে দিব, তবে অন্যান্য খণ্ডে কি থাকিবে ?

নির্ব্বাচনকালে আমার এই লক্ষ্য ছিল, যে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রকৃতি কি, যাহাতে পাঠক বুঝিতে পারেন, তাহাই করিব। এ জন্য কেবল আমার পছন্দ-মত কবিতাগুলি না তুলিয়া সকল রকমের কবিতা কিছু কিছু তুলিয়াছি, অর্থাৎ কবির যত রকম রচনা প্রথা ছিল, সকল রকমের কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি। কেবল যাহা অপাঠ্য, তাহারই উদাহরণ দিই নাই। আর "হিতপ্রভাকর", "বোধেন্দুবিকাশ", "প্রবোধপ্রভাকব" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কিছু সংগ্রহ করি নাই। কেননা, সেই গ্রন্থগুলি অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার গদ্য রচনা হইতে কিছুই উদ্ধৃত করি নাই। ভরসা করি, তাহার স্বতন্ত্র একখণ্ড প্রকাশিত হইতে পারিবে।

পবিশেষে বক্তব্য, যে অনবকাশ—বিদেশে বাস প্রভৃতি কারণে আমি মুদ্রাঙ্কন কার্য্যেব কোন তত্ত্বাবধান কবিতে পাবি পাই। তাহাতে যদি দোষ হইযা থাকে, তবে পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

আনুষঙ্গিক তথ্য

উপক্রমণিকা

বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত 'ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহের ভূমিকারূপে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাসংগ্রহ প্রকাশ করেন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বইটির মাপ ৬১/২×৪ ইঞ্চি। এর মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা, নামপত্র ১+পরবর্তী ১+বিজ্ঞাপন ও সূচীপত্র ৷৹+ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব ৮০+কবিতাসংগ্রহ ২৮৮ পৃষ্ঠা।

এর নামপত্রটি এই রকম—

কবিতাসংগ্রহ / সংবাদপ্রভাকর হইতে সংগৃহীত / ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত / কবিতাবলী। / শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক / সম্পাদিত। / শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / কলিকাতা। / ১০১ নং মসজিদবাটী ষ্ট্রীটে সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রালয়ে শ্রীকেদারনাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত / সন ১২৯২ সাল। / মূল্য দুই টাকা মাত্র। /

নামপত্রের পরবর্তী পাতায় এই কথাটি আছে—

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত / ও / কবিত্ব / বিষয়ক / প্রবন্ধ। / শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / কর্ত্তৃক / প্রণীত। /

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-লিখিত বিজ্ঞাপন—

বঙ্গের লেখকাগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকীয়তায়, উত্তরসাধকতায় এবং তত্ত্বাবধানে কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ হইল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লুপ্তপ্রায় কবিতাগুলির উদ্ধারসাধনসূত্রে যদি ভাষার কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকে, জাতির কোন গৌরবের কথা থাকে তাহা হইলে সেই উপকার এবং গৌরব বঙ্কিমবাবুর দ্বারা সাধিত হইল জানিয়া, জাতি, তাঁহার নিকট যে নানা বিষয়ে কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ তাহার উপর এই আর একটী ঋণ বাড়িল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। আর প্রকাশকের কথা—বঙ্কিমবাবু যদি আনন্দের সহিত উৎসাহ দান এবং এ কার্য্যে তাঁহার অমূল্য সময় ব্যয় করিতে সম্মত না হইতেন। তাহা হইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া দূরে থাকুক হস্তক্ষেপ করিতাম কিনা সন্দেহ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী লিখিয়া বঙ্কিমবাবু বঙ্গভাষার শিরে আর একটী সুরভিপূর্ণ কুসুম অর্পণ করিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নানা বিষয়ে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রকাশ হইয়াছে মাত্র। যদি এখানি আদরের সহিত গৃহীত হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট কবিতাবলী এবং ঈশ্বরচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে পারিব, এমত আশা করি।

এতৎ প্রচারের লভ্যাংশ ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তরাধিকারিগণ প্রাপ্ত হইবেন, অনুষ্ঠান-পত্রেই তাহা প্রচার হইয়াছে।

কলিকাতা — শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
আহিরীটোলা — প্রকাশক
৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেন।
১৫ই আশ্বিন, ১২৯১ সাল।

এই সংগ্রহে পাঁচটি খণ্ড। প্রথম খণ্ড নৈতিক ও পারমার্থিক, কবিতার সংখ্যা উনিশ। দ্বিতীয় খণ্ড সামাজিক ও ব্যঙ্গাত্মক, কবিতার সংখ্যা চোদ্দ। তৃতীয় খণ্ড ঋতুবর্ণন, কবিতার সংখ্যা পনের। চতুর্থ খণ্ড যুদ্ধবিষয়ক, কবিতার সংখ্যা নয়। পঞ্চম খণ্ড বিবিধ-বিষয়ক, কবিতার সংখ্যা কিঞ্চিদধিক পনের।

উল্লেখযোগ্য এই যে গোপালচন্দ্র পর বৎসর কবিতাসংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশ করেছিলেন।

বর্তমান প্রসঙ্গে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দেওয়া দরকার। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের সাহিত্যিক গোপালচন্দ্র 'যৌবনে যোগিনী' (১৮৭৬) 'বীরবরণ' (১২৯০) নামে দুটি উপন্যাস, 'বিধবার দাঁতে মিশি' (১৮৭৪) নামে প্রহসন, 'পাষাণ-প্রতিমা' (১৮৮৪), 'কামিনীকুঞ্জ' (১২৮৫) 'নবযুগ' (১২৯৩) প্রভৃতি নাটক, 'ভিক্টোরিয়া রাজসূয়' 'রাজজীবনী' 'সচিত্র রাজস্থান' 'রুষীয়া' 'গন্ধবণিকতত্ত্ব' প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বই লিখেছিলেন।

গোপালচন্দ্র কিছুকাল সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদকও ছিলেন।[১]

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ জুলাই কলকাতা শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাড়িতে বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভাই পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রূপান্তরিত হয়। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সভার সভ্য ছিলেন[২]। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, গোপালচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহের পাত্র ছিলেন: সে জন্য তাঁকে সঙ্গে নিয়েই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হতে যান এবং বেঙ্গলি একাডেমি অব লিটারেচারের

সঙ্গে সংযুক্ত হতে অনুরোধ করেন[৩]। কিন্তু কৌতুকের বিষয়, গোপালচন্দ্র তাঁর প্রথম নাটক 'বিধবার দাঁতে মিশি'তে বাংলার স্কট উডুম্বর চট্টোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেছিলেন, কারো মতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র।[৪]

গোপালচন্দ্রের আদি বাড়ি কোথায় ছিল বলা মুশকিল। কাঁচড়াপাড়ায় কৃষ্ণ রায়জীর সেবাইত মুখোপাধ্যায (অধিকারী) বংশ। গোপালচন্দ্রকে এই বংশের বলে বলা হযে থাকে। আবার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারেও একজন গোপাল মুখোপাধ্যায ছিলেন,— ঈশ্বর গুপ্তের পৃষ্ঠপোষক যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের খুড়তুত ভাই রাজেন্দ্রমোহনের দৌহিত্র।[৫]

বঙ্কিমচন্দ্র উপক্রমণিকায 'বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক সুকবি'র উল্লেখ করেছেন। এদের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাকেও তিনি যে সংরক্ষিতব্য বলে মনে করেছেন তার কারণ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার উৎকৃষ্টতা নয়। বস্তুত ১২৮০ বৈশাখ মাসের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'গীতিকাব্য' নামে তিনি যে প্রবন্ধ লেখেন, তাতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের রচনা ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা হেমচন্দ্রের কবিতা নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীর নাম উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের উল্লেখ করেন নি। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বিবিধ প্রবন্ধ' যখন পুনর্মুদ্রিত হয় তখন পাদটীকায় রবীন্দ্রনাথেরও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত অনুল্লিখিত। সুতরাং অনুমান করা যায়, ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-সংকলনের প্রয়োজনীযতা তিনি অনুভব করেছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নয়, এর বিশুদ্ধ দেশীয় প্রকৃতির জন্য— যে প্রকৃতি বাংলা কাব্য থেকে সত্যই হারিযে যেতে বসেছিল। নতুন রুচির বশবর্তী হয়ে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাকে তিনি এক-কালে কঠিন ভাষায় আক্রমণও করেছিলেন।[৬] কিন্তু কবিতাসংগ্রহ-কালে তিনি এর যথার্থ মূল্য নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হুগলিতে গঙ্গাতীরে তিনি গ্রাম্যসংগীত শুনে পরম তৃপ্তি লাভ করেছিলেন—মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র তাঁকে সেই তৃপ্তি দিতে পারেন নি—তার অনুরূপ মনোভাব রবীন্দ্রনাথও প্রকাশ করেছেন'—

'ঠিক সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিলুম, একটা লম্বা নৌকোয় অনেকগুলো ছোকরা ঝপ্ ঝপ্ করে দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে গান গাচ্ছিল—

যোবতী, ক্যান বা কর মন ভারি
পাবনা থাকো আনো দেব ট্যাকা দামের মোটরি।

…এ গানটি কেবল অস্থানেই হাস্যজনক কিন্তু দেশকাল পাত্র বিশেষে এর যথেষ্ট সৌন্দর্য আছে— আমার অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবিভ্রাতার রচনাগুলি এই গ্রামের লোকের সুখ দুঃখের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক— আমার গানগুলি সেখানে কম হাস্যজনক নয়।'

বঙ্কিমচন্দ্র নবীন কবিতাকে অবজ্ঞা করবার জন্য ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংকলন করেন নি। তিনি এর যথার্থ স্থান নির্দেশ করে নিজস্ব বিশিষ্টতাকে তুলে ধরেছেন মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে গঙ্গাতীরের বাড়ির উল্লেখ করেছেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়া ছেড়ে চুঁচুড়ায় বাড়ী ভাড়া করে বাস করতে থাকেন। শচীশ চট্টোপাধ্যায় যোড়াঘাটে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির বর্ণনা দিয়েছেন—

'চুঁচুড়ায় যে বাটীতে বঙ্কিবচন্দ্র বাস করিতেন সে বাটী আজও আছে। বাটীটি প্রশস্ত, দ্বিতল— ঠিক গঙ্গার উপর। বারান্দার নীচে দিয়া জাহ্নবী বহিয়া চলিয়াছে। মাথার উপর নীলাকাশ পদনিম্নে কুলু কুলু ধ্বনি, সম্মুখে ধবলতরঙ্গা জাহ্নবী।'

দেবী চৌধুরানীতেও গঙ্গার যে বর্ণনা পাই, তাও এই গঙ্গার স্মৃতিতেই লিখিত।

১ Dr. S. K De, *History of the Bengali Literature in the Nineteenth Century*. 1962, p. 569.

২ পরিষৎ-পরিচয়, ১৩৪৬, পৃ ২১

৩ বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, পৃ ২৬৮-২৭০

৪ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, 'বঙ্কিমচন্দ্র' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, বংশপরিচয়, ৪র্থ খণ্ড (১৩৩২), পৃ ৩৪

৬ *Calcutta Review* (1871, No 104)-তে প্রকাশিত 'কবিচরিতে'র সমালোচনা দ্রষ্টব্য। দ্র. English Works. *Bengali Literature*.

৭ 'ছিন্নপত্র', পতিসর, ১১ই আগষ্ট, ১৮৯৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্যভূমি কাঞ্চনপল্লী

কাঁচরাপাড়া বা কাঞ্চনপল্লী (৮৮° ২৭´ পূর্ব, ২২° ৫৬´ উত্তর) কলকাতা থেকে চল্লিশ কিলোমিটার উত্তরে চব্বিশ পরগনা জেলার প্রান্তে এবং নদীয়া জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত। ত্রিবেণী গঙ্গার পশ্চিম তীরে কিন্তু কাঁচরাপাড়ার কিছু উত্তরে। প্রাচীন সরস্বতী নদী পশ্চিম দিক দিয়েই নির্গত হয়েছে। যমুনা গঙ্গার পূর্ব পারে এবং বর্তমান কাঁচরাপাড়ার উত্তরে। যমুনার কোনো চিহ্ন বর্তমানে নেই। বিশ্বকোষ-সম্পাদক কাঁচরাপাড়ার 'উত্তরে যমুনাতীরস্থ মুরতিপুর' গ্রামের উল্লেখ করেছেন। হয়তো বর্তমান কুলিয়ার বিলই প্রাচীন যমুনার স্মৃতি বহন করছে। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন,[১]

'এই যমুনা এখন খুঁজিয়া বাহির করা আয়াসসাধ্য, কিন্তু পঞ্চদশ শতকে বিপ্রদাসের কালের "যমুনা বিশাল অতি"। ত্রিবেণী সপ্তগ্রামের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বিপ্রদাস বলিতেছেন, "গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি, অধিষ্ঠান উমা মাহেশ্বরী"। রেণেলের নক্শায় যমুনা অতি খর্ব, ক্ষীণ একটি রেখামাত্র।'

কাঁচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারহট্ট-হালিশহর। পূর্বে ষোড়শ শতাব্দীতে এ দুই একই ছিল। 'নির্বাসিত মল্লিক সাহেব তাঁহার বাসস্থানের গড়স্বরূপ বাণিজ্যকার্যের সুবিধার জন্য ফুলিয়া গ্রামের নিম্নস্থ যমুনা হইতে ভাগীরথী পর্যন্ত প্রায় দুই ক্রোশ বিস্তৃত একটি খাল কাটাইয়া দেন। উক্ত খাল এই উভয় স্থানের মধ্যে ব্যবধান-স্বরূপ থাকা সত্ত্বেও কাঞ্চনপল্লী অদ্যাপি হাবিলিসহর পরগনার অধীন ও কুমারহট্ট সমাজভুক্ত। ইহার বর্তমান দক্ষিণ সীমা মল্লিক সাহেবের কাটাখাল, পশ্চিমে ভাগীরথী খাত, উত্তরে যমুনাতীরস্থ মুরতিপুর ও পূর্বসীমা সিন্দে ভবানীপুর।'[২]

কাঁচরাপাড়া কুমারহট্ট প্রাচীন স্থান। সেনরাজ লক্ষ্মণ সেনের একটি রাজধানী বিজয়পুর এখানেই ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। ধোয়ীর পবনদূত কাব্যে সুহ্মের গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে ত্রিবেণী অতিক্রম করে বিজয়পুরের দিকে যাত্রার পথ নির্দেশ আছে—

> তোয়ক্রীড়াসরসনিপতত সুহ্মসীমন্তিনীনাং
> বীচীধৌতৈঃ স্তনমৃগমদঃ শ্যামলীভূয় ভূয়ঃ।
> ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্যাতি দেবী
> দেশং যাযাস্তমথ জগতীপাবনং ভক্তিনম্রঃ॥ ৩৩

স্কন্ধাবারং বিজয়পুরম ইত্যুন্নতাং রাজধানীং
দৃষ্ট্বা তাবদ্ ভুবনজয়িনস্তস্য রাজ্ঞোঽধিগচ্ছেঃ ॥
গঙ্গাবাতস্তমিব চতুরো যত্র পৌরাঙ্গনানাং।
সম্ভোগান্তে সপদি বিতনোত্যঙ্গ সংবাহনানি ॥ ৩৬

গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল ত্রিবেণী কুমারহট্ট-হালিশহরের কিছু উত্তরে। সেখান থেকে দক্ষিণ থেকে আগত বায়ুকে যেতে বলার অর্থ আরও উত্তরে যাওয়ার ইঙ্গিত। এর থেকে কেউ অনুমান করেছেন বিজয়পুর নদীয়ার অন্তর্গত।[৩] তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতেই 'ভাগীরথ্যান্তপনতনয়া' বলতে যে ত্রিবেণীকে বোঝায় তার সন্নিকটবর্তী অঞ্চলই বিজয়পুর। বিজপুর নামটি এখনও কাঁচরাপাড়ার একাংশ সম্বন্ধে প্রচলিত। কাঁচরাপাড়ায় সেন আমলের কীর্তির কিছু কিছু চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে বলেও শোনা যায়।[৪]

চৈতন্যযুগেও এই অঞ্চলটি সুপরিচিত ছিল চৈতন্যপার্ষদ শিবানন্দ সেনের বাসস্থান বলে। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য থেকে ফেরার পর ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে জননী শচীদেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নীলাচল থেকে নবদ্বীপের পথে যাত্রা করেন। পথে পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে একরাত্রি কাটান। তার পরদিন কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এবং তারপর রাত্রিশেষে শিবানন্দ-গৃহে উপস্থিত হন—রাত্রীশেষে তরিমধি শিবানন্দতীতঃ প্রতস্থে (চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, নবম অঙ্ক, ১৩)। চৈতন্যদেব সম্ভবত নৌকাতেই নবদ্বীপ যাত্রা করেছিলেন। সেইজন্য কুমারহট্ট থেকে নৌকাতেই শিবানন্দ-গৃহে যান।[৫] বর্ণনা থেকে মনে হয় কুমারহট্টের উত্তরাংশে ছিল শিবানন্দের গৃহ। বর্তমানে শিবানন্দ এবং তাঁর গুরু শ্রীনাথ-প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণদেব রায়ের মন্দির কাঁচরাপাড়ায় অন্তর্গত।[৬] এতে স্পষ্ট এই মনে হয় কুমারহট্ট আগে অনেক বিস্তৃত ছিল, বর্তমানে এরই উত্তরাংশ কাঁচরাপাড়া নামে পরিচিত।

কাঁচরাপাড়া নামটি আধুনিক। রেণেলের নকশায় কাঁচরাপাড়ার নাম নেই। এই নামটির উদ্‌ভবের নানা ব্যাখ্যা আছে। তবে কাঁচরাপাড়ার বৈদ্যসমাজ প্রাচীন এবং বিখ্যাত। এই বৈদ্যসমাজ নরহট্ট সমাজ নামে প্রসিদ্ধ। ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' গ্রন্থে নরহট্টীয় প্রকরণে এই বৈদ্যদের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

কাঁচরাপাড়া স্বতন্ত্ররূপে প্রাধান্য লাভ করে সম্ভবত ইংরেজ আমলে। মুসলমান-যুগে কুমারহট্ট হাবেলীসহরের নিজস্ব প্রাধান্য ছিল। গঙ্গার তীরে ইংরেজ কুঠি স্থাপন করার ফলে নতুন রাজধানী কলিকাতার সঙ্গে কাঁচরাপাড়ার

যোগাযোগ আবশ্যক হয়ে ওঠে। ঈশ্বর গুপ্তের পিতা কাঁচরাপাড়ার নিকটবর্তী শিয়ালডাঙ্গার কুঠিতে কাজ করতেন। তখনকার দিনে কলকাতার সঙ্গে এর যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল নৌকায়। রেলপথ হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। ইসটর্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ১১১ মাইল রেলপথ খোলে। ১৮৪৫-এর রোড-ম্যাপেও দেখা যায়[৭] কলকাতা থেকে গঙ্গার পর্ব তীর দিয়ে রাস্তা ছিল চিৎপুর, বরানগর, ব্যারাকপুর পর্যন্ত। পাদ্রী ওয়ার্ডও ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারাকপুর পর্যন্ত রাস্তারই উল্লেখ করেছেন। ব্যারাকপুরের পর গঙ্গা নদী অতিক্রম করে এই রাস্তা পশ্চিম পারের রাস্তার সঙ্গে মিশে ত্রিবেণী কালনা অগ্রদ্বীপের অভিমুখে গিয়েছে। সুতরাং কাঁচরাপাড়া থেকে কলিকাতায় আসতে হলে হয় গঙ্গা অতিক্রম করে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাওড়ায় আসতে হত, আর তা না হলে কাঁচরাপাড়া থেকেই নৌকা করে আদিগঙ্গা ধরে জোড়াসাঁকো চিৎপুরে আসতে হত। দ্বিতীয়টিই সহজ এবং সম্ভাব্য। ঈশ্বর গুপ্ত সম্ভবত এই পথেই যাতায়াত করতেন।

উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে বাগের খাল পর্যন্ত কাঁচরাপাড়ায় পাড়া ছিল চারটি, চৌধুরী পাড়া, মাঝের পাড়া, মালি পাড়া এবং বাজার পাড়া। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাড়ি ছিল মাঝের পাড়াতে। এই মাঝের পাড়াতেই বাড়ি ছিল উমেশচন্দ্র প্রামাণিকের। তিনি কাঁচরাপাড়ার স্কুলের বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন। উমেশচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুকালে উনিশ বৎসরের যুবক। তিনি বিরানব্বুই বৎসর বয়সে মারা যান। উমেশচন্দ্রের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ পরিচয় ছিল।[৮]

বংশ

ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বপুরুষ বহু পূর্ব থেকেই কাঁচরাপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ পণ্ডিত জগদানন্দের নাম বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। জগদানন্দের বাড়ি কাঁচরাপাড়ায় শিবানন্দের গৃহের নিকটেই ছিল বলে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দে অনুমান করেন।[৯] জগদানন্দ সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে (আদি খণ্ড, ১০ অধ্যায়) আছে—

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাতি যেঁহো সত্যভামার স্বরূপ॥

জগদানন্দ চৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে একবার বলে পাঠিয়েছিলেন তিনি পৌষ মাসে শিবানন্দের কাছে আসবেন এবং

জগদানন্দের কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে নবদ্বীপ যাওয়ার পথে কুমারহট্টে এলে জগদানন্দ পথের দুই পাশে কদলীবৃক্ষ, পূর্ণকুম্ভ, নবপল্লব, দীপাবলী দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন।

জগদানন্দের উত্তরপুরুষ যে ঈশ্বর গুপ্ত, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দে অবশ্য সে-কথা জানতেন বলে মনে হয় না। ১৯৩৮-এ প্রকাশিত একটি বংশপত্রিকা থেকে এই সংবাদ জানা যায়। সেই বংশপত্রিকা থেকে কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত বংশধারাটি নীচে দেখানো হল[১০]—
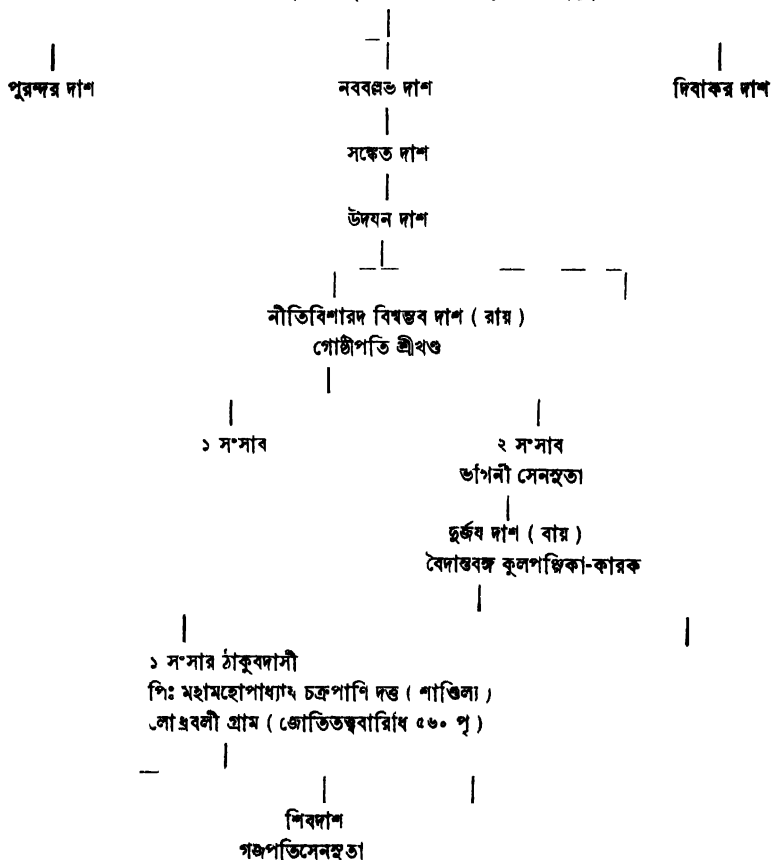
শিবদাশ
গঙ্গপতিসেনসুতা

পঞ্চানন দাশ

পরমেশ্বর দাশ

১ম সং মালঞ্চ, ভর্বাণ সেনসুতা

বাগীশ্বর দাশ
রাজ্যধব সেনসুতা

কমলাকান্ত দাশ

থানা, নিমাই সিকদারসুতা

পুণ্ডরীকাক্ষ দাশ
ভুবন সেনসুতা

নারায়ণ দাশ
শ্রীমন্ত সেনসুতা (গয়ী সেন)

শিবরাম দাশ (কাঁচরাপাড়া)
পাঁচু সেনসুতা

পণ্ডিত জগদানন্দ দাশ (রায়) কাঁচরাপাড়া
রঘু মল্লিকসুতা, থানা

নরেন্দ্র দাশ

রামচন্দ্র (শরণ) দাশ   শিবদাস দাশ   নিমাইদাস দাশ

রামগোবিন্দ
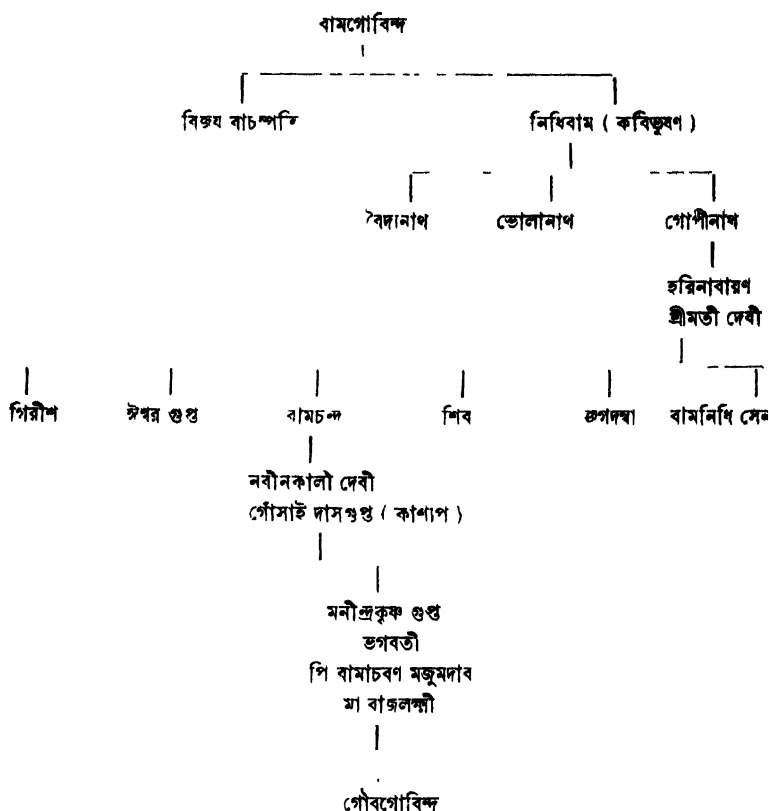
রাঢ়ীয় বৈদ্যগণ তিন শাখায় বিভক্ত, খণ্ড সমাজ, সাতসৈকে সমাজ ও সপ্তগ্রাম সমাজ। ত্রিবেণী, কাঁচরাপাড়া, হালিসহর, কুমারহট্ট, গৌরিভা, সোমড়া, শুকড়ে, নাটাগোড, দিগড়ে, বলাগড, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি গঙ্গার দুই পাশের বৈদ্যেরা সপ্তগ্রাম সমাজের।

শিক্ষা

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যুগে ছিলেন শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ। ইংরেজি শিক্ষা এবং রুচির সর্বোত্তম সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর কালের বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্য রচনা করছেন তখন শিক্ষা বলতে বোঝাত ইংরেজি শিক্ষা। সেকালের সাহিত্যও ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে গড়ে উঠেছিল।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত Bengali Literature প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে লিখেছিলেন,

> He was a very remarkable man. He was ignorant and uneducated. He knew no language but his own and was singularly narrow and unenlightened in his views.

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী—

'বলিতে গেলে শিক্ষা যাহাকে বলে ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কিছুই পান নাই। ইংরাজী শিক্ষা ত হইলই না; বাঙ্গালাও নিজে পড়িয়া যাহা শিখিলেন তাহাই একমাত্র সম্বল হইল। কিন্তু এই সম্বল লইয়াই তিনি অচিরকালের মধ্যে বাঙ্গালার সুকবি ও সুলেখক রূপে পরিচিত হইলেন।'[১১]

ঈশ্বর গুপ্তকে ইংরেজি শেখবার জন্যই কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল— একথা তাঁর বাল্যসখা লিখেছেন। ১৮২২-এ ঈশ্বর গুপ্তের দশ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হবার পরেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন। কিন্তু তিনি কোনো স্কুলে নিয়মিত ভাবে ইংরেজি শেখেন নি। সম্ভবত কোনো ইংরেজি স্কুলে পড়া তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তখন কলকাতায় পাঁচ শ্রেণীর ইংরেজি স্কুল ছিল :

১. য়ুরোপীয় পদ্ধতির স্কুল। বিশপস্ কলেজ, ক্যালকাটা ডায়োসেসান কমিটির টালিগঞ্জের স্কুল, জেনারল এসেমবলি, বেঙ্গল অকসিলিয়ারি মিশনারি সোসাইটির স্কুল, চিৎপুরে ক্যালকাটা ব্যাপটিসট মিশনারি সোসাইটির স্কুল, স্কুল সোসাইটির স্কুল (১৮২৩, হিন্দু কলেজের জন্য ছাত্র তৈরি করবার জন্য স্থাপিত)।

২. য়ুরোপীয় সহায়তা ছাড়াই দেশীয় ব্যক্তিদের উদ্যোগে স্থাপিত ইংরেজি স্কুল, সিমলিয়া, ভবানীপুর, অপার সারকুলার রোড, বড়বাজার, শোভাবাজার— এই সব স্কুলই বৈতনিক। অবৈতনিক স্কুল আড়পুলির হিন্দু ফ্রী স্কুল, হিন্দু বেনেভোলেনন্ট ইনসটিটিউশন, চোরবাগানের স্কুল :

৩. প্রধানত খ্রীষ্টান বালকদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্থাপিত স্কুল ক্যালকাটা হাই স্কুল, পেরেণ্টাল অ্যাকাডেমিক ইনসটিটিউশন, ফিলানথ্রপিক অ্যাকাডেমি, ভেরুলাম অ্যাকাডেমি।

৪. য়ুরোপীয় বালিকাদের জন্য স্কুল।

৫. অনাথ দরিদ্র খ্রীষ্টান বালকদের জন্য দাতব্য স্কুল।

পাদ্রী অ্যাডামের দ্বারা প্রস্তুত বাংলা দেশের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে প্রথম রিপোর্ট (১৮৩৫) থেকে কলকাতায় ইংরেজি স্কুলের যে বর্ণনা পাই,[১২] তাতে

ঈশ্বর গুপ্তের মতো দরিদ্র এবং অপরিচিত বালকের পক্ষে কোনো স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা করা যথেষ্ট কঠিন ছিল। প্রভাবশালী অথবা সম্পন্ন অভিভাবক পাওয়ার সৌভাগ্য হলে ঈশ্বর গুপ্ত হয় তো ইংরেজি স্কুলে ঢুকতেও পারতেন। তিনি নিজেও একাগ্রচিত্তে বাঁধাধরা পডাশোনা করবার মতো স্বভাবের অধিকারী ছিলেন না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু তিনি যে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালী ছিলেন সে-কথা বঙ্কিমচন্দ্র ও বাল্যসখা দুজনেই বলেছেন। কলকাতায় এসে ঈশ্বর গুপ্ত যখন শিক্ষিত সমাজের সান্নিধ্যে এলেন, এবং পরে সম্পাদক রূপে (১৮৩১) দেখা দিলেন, তখন থেকেই ইংরেজি জানার প্রয়োজন নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন। টম পেনের 'এজ অব রিজনে'র যে আংশিক অনুবাদ সংবাদপ্রভাকরে সেই সময়ে প্রকাশিত হয় (পরে দ্রষ্টব্য), সেই অনুবাদ তাঁরই করা এটা জোর করে বলা না গেলেও ইংরেজি ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল এটা অনুমান করতে বাধা নেই। হিন্দু কলেজ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর যে পত্রের আদান-প্রদান হয়েছিল, তার রচনা অবশ্য তাঁর নিজের না হতেও পারে। না হওয়াই সম্ভব, কারণ ইংরেজি বেশ জোরালো। এতখানি অধিকার প্রথম দিকেই তাঁর হয়েছিল, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তিনি ইংরেজি ভাষা বুঝতেন না, এ-কথা বলা যাবে কী করে ?

অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের পবিচয়ের ইতিহাসও বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'অক্ষয়কুমার 'মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন পদ্য না গদ্য কিসে লোকের বেশি উপকার সম্ভাবনা ? একদা এবম্বিধ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিবার পর ইনি প্রভাকর যন্ত্রালয়ে গুপ্ত মহাশয়ের নিকট গমন করেন। কি বিচিত্র অনুকূল ঘটনা ! তাঁহার সহকারী সেদিন উপস্থিত না থাকাতে তিনি উঁহাকে সুবিখ্যাত ইংলিশম্যান পত্রিকা হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। অক্ষয়বাবু বলিলেন "আমি লিখিতে পারিব না, যে হেতু আমি কখনও গদ্য লিখি নাই।" এই কথা শুনিয়া সম্পাদক মহাশয় উত্তর করিলেন "আমার বিশ্বাস তুমি পারিবে, নচেৎ বলিতাম না।" কি করেন লিখিলেন। লেখাটি এরূপ উত্তম হইল যে তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন "যে ব্যক্তি বহু দিবসাবধি এই কার্য করিয়া আসিতে-ছেন তিনি এমত সুন্দর লিখিতে পারেন না।'[১৩]

ইংরেজি ভালো না জানলে অনুবাদ সুন্দর হল কিনা সে-কথা বলা এবং

অক্ষয়কুমার দত্তের মতো শক্তিশালী লেখককে গদ্য লেখায় উৎসাহিত করা সম্ভব ছিল না। এই ঘটনা খুব সম্ভবত ১৮৩৯-এর।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন সংবাদপ্রভাকরে টমাস ক্যাম্বেলের **The Soldier's Dream** কবিতাটির অনুবাদ বের হয় 'যোদ্ধার স্বপ্নদর্শন' নামে। কুপারের **Alexander Selkirk** কবিতার ১৪টি স্তবকের অনুবাদও প্রকাশিত হয় ওই পত্রিকার ১৮৫২, ২৫ জুলাই। এই কবিতার সঙ্গে মন্তব্য ছিল—

'ইংরাজী কবিতার অবিকল মর্ম্ম ও অর্থ এবং যথার্থ অভিপ্রায় রক্ষা করিয়া বঙ্গভাষায় তাহার প্রত্যেক চরণের কবিতা রচনা করা যদ্রূপ কঠিন তাহা বিদ্যানুরাগি কবি ও কাব্যপ্রিয় মহাশয়েরাই বিবেচনা করুন। অতএব এই অনুবাদে যে যে দোষ হইয়াছে অনুগ্রহপূর্ব্বক সকলে তাহা মার্জ্জনা করিবেন, যেহেতু অন্যান্য অনুবাদকের ন্যায় কৌপারের পদ্যকে বধ করা আমার মনেব বাসনা নহে'।

এই দুই রচনাই স্বাক্ষরহীন।[১৪] এই কারণে এবং এই ছোটো ভূমিকাটির ভাষা ও ভঙ্গিতে অনুমান হয় এই দুই রচনারই রচয়িতা কবি ঈশ্বর গুপ্ত ছাড়া কেউ নয়। ঈশ্বর গুপ্তের ইংরেজি জ্ঞানের এও একটি প্রমাণ।

তবে একথা ঠিক, ঈশ্বর গুপ্ত স্কুল-কলেজে নিয়মিত ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন নি। তাঁর ইংরেজি রচনারও নিদর্শন নেই। কিন্তু তিনি যে সংস্কৃত এবং সম্ভবত ফারসি জানতেন তার সুস্পষ্ট উল্লেখ বাল্যসখা করেছেন। তাঁর রচনা থেকেও অনুমান দৃঢ় হয়। বাল্যসখা সংস্কৃতের ছাত্র ছিলেন। তাঁর সঙ্গে একত্রে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়েন। এই প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখযোগ্য ঈশ্বর গুপ্ত টোলেও সংস্কৃত পড়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় কলকাতার হাতিবাগানের সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালংকারের ছাত্র ছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তও তর্কালংকার মহাশয়ের কাছে সংস্কৃত পড়তেন।[১৫]

ঈশ্বর গুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থের সঙ্গে যে পরিচিত ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর রচনাতেই পাওয়া যায়। রামচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন (বঙ্কিমের বর্তমান রচনার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদ্‌ধৃত) রত্নাবলী সম্পাদনা ত্যাগ করে ঈশ্বর গুপ্ত কটকে চলে যান, সেখানে পিতৃব্য শ্যামামোহন রায়ের বাড়িতে থেকে সুপণ্ডিত দণ্ডীর কাছে 'তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। এবং তাহার কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন।' তাঁর 'বোধেন্দুবিকাশ' নাটক শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়

নাটকের অনুবাদ ও বিস্তার। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র ও দর্শনের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে এই অনুবাদ করা কঠিন। অবশ্য গঙ্গাধর ন্যায়রত্নের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ ইতিপূর্বেই (১৮৫২) প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের রচনা শুধু অনুবাদ নয় বিস্তার এবং স্বাধীন সংযোজনা। প্রবোধচন্দ্রোদয় দার্শনিক তত্ত্বমূলক নাটক। এ নাটকে আগ্রহ হতে হলে বিশেষ শিক্ষা ও অনুরাগের প্রয়োজন। ঈশ্বর গুপ্ত মৃত্যুর পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টীকার মর্মানুবাদ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কবিতাসংগ্রহে সেটা সংকলন করেছেন।[১৬] এই প্রসঙ্গে শকুন্তলা নাটকের গদ্যানুবাদটিও উল্লেখযোগ্য।

কলকাতায় ঈশ্বর গুপ্ত (১৮২২-১৮৩০)

ঈশ্বর গুপ্তের দশ বৎসর বয়সে তাঁর মার মৃত্যু হয়। তার পরেই তিনি কলকাতায় জোড়াসাঁকোয় মাতুল গৃহে চলে এলেন। তখন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ। তখন থেকেই তাঁর কলকাতার জীবন আরম্ভ হয়। কিন্তু তাঁর কর্মজীবন ১৮৩১ অর্থাৎ সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকার প্রকাশ কাল থেকে ধরা যায়। এই নয় বৎসর ঈশ্বর গুপ্তের কি ভাবে কেটেছিল, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু জানা যায় না। বাল্যসখা লিখেছেন ইংরেজি শেখার জন্য এবং জীবিকান্বেষণের জন্য তিনি কলকাতায় এসে-ছিলেন। ১৮২২ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত এই আট বছর অর্থাৎ আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত ঈশ্বর গুপ্ত প্রধানত লেখাপড়া শেখাতেই ব্যাপৃত থাকবেন, এ রকম আশা করা যায়। অবশ্য লেখাপড়া সত্য সত্যই কতখানি করেছিলেন, তার কোনো প্রত্যক্ষ সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৮৩০-এ তাঁর পিতৃবিয়োগ হলে তাঁর কনিষ্ঠ ভাই রামচন্দ্রকে প্রতিপালনের ভার তাঁর ওপরেই পড়ে। ইতিমধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের পনেরো বছর বয়সে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ হয়। সে বিবাহ সুখের না হলেও স্ত্রীর ভরণ পোষণ তিনি করে এসেছেন।

কলকাতায় মাতামহের বাড়িতে থাকতে-থাকতেই পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। এই পরিবারের শুধু যোগেন্দ্রমোহনের কাছেই যে সংবাদপ্রভাকর-প্রকাশে ঈশ্বর গুপ্ত ঋণী ছিলেন তাই নয়, আরো অনেকের কাছেই তিনি ঋণী ছিলেন।

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র গোপী মোহন ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কলকাতায় স্থায়িভাবে আসবার আগেই পরলোক গমন করেন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে।[১৭] গোপীমোহনের ছয় ছেলে—সূর্যকুমার, চন্দ্রকুমার

নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার এবং প্রসন্নকুমার। সূর্যকুমারও ১৮২০, ১লা এপ্রিল মারা গেলে দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রকুমার বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।[১৮] চন্দ্রকুমারই হিন্দুকলেজের বংশানুক্রমিক গবর্ণর নিযুক্ত হলেন। ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে হিন্দু কলেজের যখন বিবাদ উপস্থিত হয় (পরে দ্রষ্টব্য) তখন চন্দ্রকুমার জীবিত। চন্দ্রকুমারের মৃত্যু হয় ১৯এ সেপ্টেম্বর ১৮৩২।[১৯] ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠপোষক যোগেন্দ্রমোহন ছিলেন গোপীমোহনের তৃতীয পুত্র নন্দকুমারের পুত্র। যোগেন্দ্রমোহন রুগ্ণ ছিলেন। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের সমবয়স্ক ছিলেন, ১৮৩২-এর গোড়ার দিকে (সম্ভবত জানুয়ারি মাসে) তিনিও মারা গেলে ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ-প্রভাকর সম্পাদনাও ছেড়ে দেন। ঈশ্বর গুপ্ত যখন এই ঠাকর পরিবারের সান্নিধ্যে আসেন তখন সূর্যকুমার ছাড়া গোপীমোহনের অন্যান্য পুত্রেরা জীবিত। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবার বিদ্যা এবং সংস্কৃতির পৃষ্টপোষকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল। হরকুমার ঠাকুর সংস্কৃত সাহিত্যে এবং শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম সুপরিজ্ঞাত।

গোপীমোহন নিজেও যেমন ধনবান ছিলেন তেমনই সংস্কৃতির একজন মহৎ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর বাড়িতে নানা অঞ্চল থেকে গাযকদেব সমাবেশ হত। দৈবক্রমে ঈশ্বর গুপ্ত ঠাকুরবাড়িতে এসে তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতার বিশেষ আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। পল্লীগ্রামে থাকতে কবিওয়ালাদের দলে যোগদান করে তাঁর যে শক্তির স্ফুরণ ঘটেছিল, এখানেও তিনি তার উপযুক্ত পরিবেশ পেলেন। গোপীমোহনের বৃত্তিভোগী ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস নামক কবিওয়ালা। সম্ভবত ১৮২০-তেই তার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু তার পুত্র বৈদ্যনাথ বিশ্বাস পিতার দল রক্ষা করেছিলেন। বৈদ্যনাথের পুত্র ছিল না, কিন্তু তার দৌহিত্র দর্পনারায়ণও দল চালিয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত যখন লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসেব জীবনী লেখেন (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) তার আগেই দর্পনারায়ণের মৃত্যু হয়। উল্লেখযোগ্য এই যে লক্ষ্মীকান্তের মৃত্যুর পরও তাব বংশধরেরা নিয়মিত বৃত্তি পেতেন। ঈশ্বর গুপ্ত লক্ষ্মীকান্তের পাঁচটি রচনা সংগ্রহ করেছিলেন।[২০] ঈশ্বর গুপ্ত কলকাতায় এসে স্বভাবতই কবির দলে যোগ দিয়ে সঙ্গীত-রচনা চর্চা করছিলেন।

সেই সময়ে কলকাতায় কবিগানের খুব চল ছিল। কয়েকজন বিখ্যাত কবিওয়ালা, হরু ঠাকুর (মৃত্যু ১৮২৪), রাম বসু (মৃত্যু ১৮২৮) নীলু ঠাকুর (মৃত্যু ১৮২৫), ঠাকুরদাস সিংহ, ভোলা ময়রা আনটুনি ফিরিঙ্গী প্রভৃতি অনেকেই জীবিত। কলকাতায় তখন আরো অনেক কবির দল ছিল এবং কবিগানের আসর

বসত। বিশেষ করে উত্তর কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিকে কেন্দ্র করেই কবিগানের বিস্তার ঘটে। ভবানীপুর অঞ্চলে কিছু কিছু আরম্ভ হলেও মনে হয় চতুর্থ দশক থেকেই সেদিকেও এর বিশেষ প্রসার ঘটে। উত্তর কলকাতায় ধনী পরিবারগুলির উৎসব অনুষ্ঠানে কবিগণের আসর কি রকম বসত তার একটা বিবরণ ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[২১] এই বর্ণনায় শুধু কবি নয়, যাত্রা, পাঁচালী, কামতা নাচ—এ সবেরও বর্ণনা ছিল। সেকালের কবিগানের আসরের স্পষ্ট ও উজ্জ্বল বর্ণনা বলে প্রাসঙ্গিক অংশ দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত করলাম।—

> *Cobbees.* Each Poojah of the natives is a prolific source of their merriment and festivity. In almost all respectable families some entertainments or other must take place at nights. The *Cobbees* are a species of wild song, which exceedingly minister to the gratification of the mob. When a rich Baboo wishes to have this amusement at his house, he generally makes an illumination in the compound and *buytuckanas.* His gate is sometimes studded with light and *brojabasies* and *sepoys* are kept there as guards About at 9 or 10 o'clock P.M. the rush of men becomes irresistable. Persons of every description and rank fall in great numbers upon the door keepers and notwithstanding their being now and then abused, collared and flogged they can never refrain from witnessing this delightful scene The moment the *dholies* beat their *dholes*, the house becomes excessively crowded A great hue and cry is raised to make all the *plebean* audience sit down and often resorted to, to effect this purpose. As soon as the buzzing talk of the surrounding rabble is hushed by the loud and repeated remonstrances of the *Chuprasees* the first dull or gang of *cobbetta-wallah* consisting of about thirteen or fourteen persons appears in the middle of the compound, wrapt in a red sheet of cloth extending from the waist to the legs, with a conical feathered cap on head, and hands, breast and back all bare. Each of them wears a pair of *napoors* on his feet, the tinkling of which is said to add harmony to their *bawling* and dancing. On entering the field, all of them fa prostrate before the God or goddesses whose representation

is kept in the *dalaun*, and consecrate their heads with the dust of the feet of their chieftain, if he be of a superior caste. Such steps being taken in order to be crowned with success they divide themselves into two unequal sections and standing in their usual order first of all chant a *tuppa* soliciting the deity to be propitious to them. It is sung twice on the two sides of the compound and is succeeded by a lengthy *suctomee* or *takroon beeshoy* descriptive of the pathetic mournings of *Doorgaha's* parents for her indifference towards them or of the wonderful achievements of Kali or *Bhugobutty* performed in days of yore. Each Cobee consists of three or four *untoras* and each *untora* is sung twice on the two sides. At intervals the *Cobbetta Wallahs* dance, agitating their *napoors* and jumping with ecstatic emotions which burst of acclamations and enthusiastic cries of *bahwahs* pervade the place. After the first *dull* has completed its task, and retired into a private chamber, the second dull appears in a similar dress and observing the same etiquette bawl out a similar song with as much exertion as it can possibly make to excel the opposite party in point of strength and concord of voice. On its making its exit, the first *dull* reappears and in like manner sings a *sukeesumbad* or a song relating to the love between Krishna and his dearest aunt *Radha* and hundreds of blooming girls of the happy vale of *Brindabon*. The first *Sukeesumbad* always contains some mysterious questions for the solution of the other dull, and should its *bad onedar* (rhymster) fails in his ingenuities to discern their subtlities and frame suitable replies *dowoos habaes* and other contemptuous cries of disapprobation must be lavished upon the *ganah-wallahs* while rupees and shawls would be presented to the victorious party. Each *dull* sings two or three songs of their description by turns and then plays the part of either a lover or his beloved, with the singing of of *burohaes* or ditties relative to the sundry negotiations of sublunary love. At first both the dulls enter heart and soul on a dirty species of song called *Kahoocs*. The expressions, in which

many of these are couched are too shocking to be heard. But the deep attention with which the Baboos listen to them, and the heartfelt smiles which sparkle in their greasy faces and the strong mark of approbation which they indicate by the frequent nodding of their heads, embolden the *Cobbeeta Wallahs*, to be exceedingly indecent in dancing and ransacking the whole catalogue of abominable terms. The *dull* that can be very vulgar and unanswerable in its horricd language as well as superior in vociferation, becomes victorious in the contest and obtains suitable rewards. With respect to *Sokar dulls* or gangs of unpaid cobbeewallahs, the party that gains the victory is allowed to walk in the public streets singing one of the morning songs amidst the cheers of spectators, the rattling of dholes and numbers of nullygs waving in the air. There are also female songsters of the same sort. They are all of low extraction and have not the slightest notion of modesty, refinement or good feeling. They are occasionally employed by the rich baboos at their garden houses, where no species of sensual pleasure can pass without being enjoyed in the exuberance of hilarity.

তখন বৃদ্ধ রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯) জীবিত। সম্ভবত সেকালের বিখ্যাত আখড়াই সঙ্গীতের বাঁধনদার রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় তৃতীয় দশকেই সুপরিচিত হয়েছেন। মনোমোহন বসু এ সময়ের আখড়াই ও কবিগানের বর্ণনা দিয়েছেন।[২২] নিধুবাবুর শিষ্য মোহনচাঁদ বসু আখড়াই গানের নতুন পরীক্ষা করছেন। তাঁর উদ্‌ভাবিত সুর মোহনচাঁদী সুর নামে সেকালে পরিচিত ছিল। আর একটি বড়ো ঘটনা হাফ-আখড়াইয়ের সৃষ্টি। আখড়াই ও কবি মিলিয়ে মোহনচাঁদ এই নতুন সঙ্গীতপদ্ধতির উদ্‌ভাবন করেছিলেন। নিধুবাবু এতে শিষ্যের উপর প্রথমে রুষ্ট হলেও পরে মেনে নেন। হাফ-আখড়াইয়ের প্রবর্তন হয় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে।[২৩]

কলকাতায় আসার কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঈশ্বর গুপ্ত বন্ধুরূপে লাভ করেন প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশকে। প্রেমচন্দ্র ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজে ছাত্র হিসাবে ভরতি হন। তাঁর চরিতকার রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, কলেজে ভরতি হওয়ার দুই তিন বৎসরের মধ্যেই ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব

হয়।[২৪] এই বন্ধুত্ব কি সূত্রে হয়েছিল সে সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কিছু জানা যায় না, তবে অনুমান করা যেতে পারে কবিগানে দুজনের অনুরাগই ছিল বন্ধুত্বের সূত্র। শাকনাড়া গ্রামে থাকতে প্রেমচন্দ্র কবির লড়াইয়ে উত্তর গান প্রস্তুত করতেন, পরে কলকাতায় এসেও তাঁর সেই অভ্যাস অক্ষুন্ন ছিল। তাঁর চরিতকার লিখেছেন,[২৫]

'কলিকাতায় আসিয়াই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার পরেও তিনি বহুদিন পর্যন্ত কবি ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে ওস্তাদি কবিওয়ালাদের লড়াই দেখিতে যাইতেন। উত্তর গীত রচনার সন্ধান লওয়া তাঁহার একটি ঝোঁক ছিল।'

পূর্বে বলা হয়েছে ঠাকুরবাড়িতে এসে ঈশ্বর গুপ্ত কবিগান রচনার অনুকূলতা পেয়েছিলেন। তাঁর সমবয়স্ক সুহৃৎ যোগেন্দ্রমোহনও কবিতা রচনা করতেন বলে শোনা যায়। বিশেষত মহেশ পাগলা নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাযুদ্ধ হত বলে বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন। যোগেন্দ্রমোহনের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফল কয়েকটি ঘটনায় অনুমান করা যায়। তার মধ্যে সংবাদপ্রভাকরের প্রকাশের কথা সকলেরই জানা। ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক এসোশিয়েশন নামক বিতর্কসভা স্থাপনের (১৮২৮-এর শেষের দিকে) পরে কলকাতায় অনেকগুলি সভা স্থাপিত হয়। এইসব সভার উদ্দেশ্য ছিল নীতি, ধর্ম প্রভৃতি আলোচনা করা। সম্ভবত কলকাতায় সভা স্থাপনের এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে ঈশ্বর গুপ্তও 'নববিশিষ্ট শিষ্টগণ' সভা নামে একটি সভা স্থাপন করেন ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে।[২৬] তখন তাঁর বয়স আঠারো বৎসর। অনুমান করা কিছুই অসঙ্গত হবে না যে, সংবাদ-প্রভাকর যেমন যোগেন্দ্রমোহনের সহায়তায় প্রকাশিত হয়েছিল, এই সভাও তেমনি তাঁর সহায়তাতেই স্থাপিত হয়েছিল। এই সভার উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গিও নবপ্রকাশিত প্রভাকরের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ। ধনী বন্ধুর সাহায্য ব্যতীত অল্পবয়স্ক অখ্যাত তরুণ ঈশ্বর গুপ্তের পক্ষে এই সভা-স্থাপন সম্ভব ছিল না।

এই সময়ের কলকাতা, বিশেষত ১৮২৮-এর পর, ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের আচরণে ও উক্তিতে মুখর। এর চরম পরিণাম ছিল ডিরোজিওর হিন্দু কলেজ থেকে অপসারণ। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ভিন্ন অধ্যায়ে করেছি। নব্যবঙ্গ আন্দোলনের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে থাকলেও পরে তিনি তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র সভ্য পর্যন্ত হয়েছিলেন, সে ইতিহাস পরের যুগের।

---

১ 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', ১৩৫৩, পৃ ৯৭। রেণেলের নকশার তারিখ ১৭৬৪-৭৬।

২ বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ ৪১২।

৩ *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1905, p. ৭১. গোড়রাজমালায় বিজয়পুরকে দেখানো হয়েছে রাজশাহীর অন্তর্গত, দ্র পৃ ৭৫।

৪ কুমারহট্ট হালিশহর উচ্চবিদ্যালয় ও গুডউইল ফ্রেটারনিটির শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬১, পৃ ১৩।

৫ চৈতন্যদেব শিবানন্দ-ভবনে এসেছিলেন ১৪৩৬ শকে কার্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে (১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে) দ্রষ্টব্য সতীশচন্দ্র দে, 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী' ১৯৩৩, পৃ ২৭৩-৭৫।

৬ শিবানন্দ-প্রতিষ্ঠিত মূল মন্দিরটি গঙ্গাগর্ভে। বর্তমান মন্দির ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার নিমাইচরণ ও গৌবচরণ মল্লিক নির্মাণ করেন।

৭ *Illustration of the Roads throughout Bengal including those to Madras and Bombay*, Calcutta, 1845. Plate XVI. বইতে প্রকাশের তারিখ নেই, কিন্তু ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ঐ তারিখ দেওয়া আছে।

৮ দ্রষ্টব্য দীনেশচন্দ্র সেন-লিখিত 'শ্রীবাস ঈশ্বর গুপ্ত', বঙ্গবাণী, বৈশাখ, ১৩২৯।

৯ 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী' ১৯৩৩, পৃ ২০৬।

১০ রামপ্রসাদ রায়, 'মৌদগল্য গোত্রীয় দুর্জয় দাশ বংশপত্রিকা' জাতীয় গ্রন্থাগার ডাক সংখ্যা 182 Cb 938।

১১. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ৩য় সং, পৃ ২২৯।

১২. William Adam, *Reports on the State of Education in Bengal* (1835 & 1838), edited by Anathnath Basu, University of Calcutta, 1941, pp, 23-41.

১৩. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয়চরিত, ১২৯৪, পৃ ১৪।

১৪. রচনা দুটি পরিশিষ্টে উদধৃত।

১৫ হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, ১৩২৭ পৃ ৫০। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পৃ ২৮৫ দ্রষ্টব্য। অ্যাডামের রিপোর্টে ঠনঠনিয়ার কাশীনাথ তর্কালংকারের উল্লেখ আছে। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২২।

১৬. কবিতাসংগ্রহ, পৃ ৬৬-৬৮।

১৭ ঠাকুর পরিবারের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য James. W. Furrell, *The Tagore Family, A Memoir*, Calcutta, 1892.

১৮ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ ২১৬

১৯ স-সে-ক, ২য় খণ্ড পৃ ৪১৯

২০ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী, ১৯৫৮ দ্রষ্টব্য।

২১ *The Calcutta Monthly journal*, May 1837, ইংলিশম্যান, ১৩ জানুয়ারি ১৮৩৭ সংখ্যার The Hindoo নামক প্রবন্ধের ৮ সংখ্যক রচনা।

২২ মনোমোহন-গীতাবলী ১৮৮৭, ভূমিকা

২৩ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী পৃ ৪০৭-৪০৯

২৪ রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, 'প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী' ৫ম সং, ১৯২৪, পৃ ৮৯

২৫ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৬৮

২৬ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত

স্বাভাবিক কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রায় অর্ধাংশই সংবাদপ্রভাকর, সংবাদসাধুরঞ্জন এবং পাষণ্ডপীড়ন পত্রিকাব বিবরণে পূর্ণ। সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদক রূপেই ঈশ্বর গুপ্ত অচিরেই কলকাতায় এবং বাইরে সুপরিচিত হন। তাঁর কবিতাগুলিও বস্তুত সংবাদপ্রভাকরের সাময়িক প্রসঙ্গেই লেখা। তাঁর কবিখ্যাতিও সেই সূত্রেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পত্রিকার সঙ্গেই ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বের বিকাশ পরিণতি এবং প্রতিষ্ঠা। বিশেষত এই পত্রিকার প্রথম প্রবর্তন থেকে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাংলা দেশের আধুনিক কালের একটি চিরস্মরণীয় অধ্যায় অতিবাহিত হয়েছে। হিন্দু কলেজ এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রসার নতুন যুগের উন্মেষ ঘটাল, পুঁথিগত বিদ্যা থেকে সমাজ এবং কর্মক্ষেত্রে সেই নবচেতনার রূপান্তরণ, ব্রাহ্মধর্মের প্রসার, আধুনিক রাজনীতির উদ্ভব, নতুন বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত, রঙ্গলাল মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দত্তের আবির্ভাব, বাংলা নাটকের আদর্শগত দ্বন্দ্ব, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সমাজ-সংস্কার, সিপাহীবিদ্রোহ নীলবিদ্রোহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন— এসব স্মরণীয় ঘটনা ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনার কালেই ঘটেছিল। সংবাদপ্রভাকর ছাড়াও আরো পত্রিকা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সংবাদপ্রভাকর প্রথম দিকে বিশেষ কারণে রক্ষণশীল হলেও দ্বিতীয় পর্যায় থেকেই সে একটি মুক্ত সর্বভাবনাগ্রহণক্ষম উদার সাময়িক পত্রে পরিণত হয়েছিল; অথচ সেই সঙ্গে বাঙালি পাঠকের কাছে একটি সুস্থ অনুগ্র আদর্শ তুলে ধরে নবযুগের সম্পদকে মাতৃভাষার মধ্যে দিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছিল। কল্পনা করতে দোষ নেই, জ্ঞানান্বেষণ বা বেঙ্গল স্পেকটেটরের মতো পত্রিকার উচ্চ চিন্তা কিংবা তত্ত্ববোধিনীর মতো অতিমার্জিত ধর্মমূলক পত্রিকা যেমন সাধারণ বাঙালির কাছে দুরধিগম্য হতে পারত, সমাচারচন্দ্রিকার মতো পত্রিকার রক্ষণশীল আদর্শ তেমনি বাঙালিকে মধ্যযুগের অচল সীমায় অবরুদ্ধ করতে পারত। সেকালে সংবাদপ্রভাকরের মতো উদারপন্থী পত্রিকাই সাধারণ লোকসমাজের কাছে আধুনিক মত ও আদর্শকে সহজবোধ্য রূপে পরিবেশন করেছিল। সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় সেকালের আর একটি উদারনৈতিক পত্রিকা ছিল, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের মতো বিশিষ্ট কবিব্যক্তিত্বের সম্পাদনাসৌভাগ্য লাভ করে নি। অবশ্য সেকালের

ইংরেজি পত্রিকাগুলির সম্পাদনাব উচ্চ আদর্শে সংবাদপ্রভাকর পৌঁছতে পারে নি। ইংরেজি ভাষার পরিমিতি ও সংযম সেকালের অপরিণত সাময়িক পত্রের গদ্যে সম্ভব ছিল না। জড়তাপূর্ণ ভাষার মধ্যে দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশের চেষ্টায়, তথ্য এবং সুস্পষ্ট বক্তব্যের দীনতায়, মননশীল পাণ্ডিত্যের স্বল্পতায় এবং যুক্তি-বোধের অপেক্ষাকৃত অভাবে বাংলা সাময়িক পত্র ইংরেজি পত্রিকা ফ্রেণ্ড অব ইনডিয়া, বেঙ্গল হরকরা অথবা ইংলিশম্যানের সমকক্ষ হতে পারে নি, এ-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই।

সংবাদপ্রভাকরের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনার একটি বড়ো অসুবিধা এই যে ১৮৩১ থেকে ১৮৪৭ পর্যন্ত সংবাদপ্রভাকর পত্রিকার ফাইল পাওয়া যায় না। ১৮৪৮ থেকে যা পাওয়া যায় তাও খুবই অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ জীর্ণ সংবাদপ্রভাকরের ফাইল থেকে সংকলন করে শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ 'সাময়িকপত্রে সেকালের সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড' (১৯৬২) প্রকাশ কবেছেন। এর থেকেই পাঠকেরা এই পত্রিকাটির একটি রূপ কল্পনা করে নিতে পারেন। এই সংকলনটি বস্তুত সংবাদপ্রভাকরের তৃতীয় পর্যায়ের নিদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালার সংবাদপত্র সমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লয়।' ঈশ্বর গুপ্তের যে মূর্তি বাঙালি পাঠকের কাছে উজ্জ্বল হয়ে আছে, সে এই সময়ের।

সংবাদপ্রভাকরকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথম পর্যায় ১৮৩১ থেকে ১৮৩২, দ্বিতীয় পর্যায় ১৮৩৬ থেকে ১৮৪৭ এবং তৃতীয় পর্যায় ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৯। এদেব মধ্যে প্রথম দুই পর্যায়ের পত্রিকানিদর্শন পাওয়া যায় না, একথা বলেছি। নিদর্শন পাওয়া না গেলেও পরোক্ষভাবে প্রভাকরের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে নেওয়া কঠিন নয়।

সংবাদ প্রভাকর—প্রথম পর্যায

গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র এবং নন্দলাল ঠাকুরের পুত্র যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সরকারের কাছে আবেদন করেন। ১১ই জানুয়ারি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সেই আবেদনের উত্তর আসে এবং সেই অনুসাবে ২৮এ জানুয়ারি (১৬ই মাঘ ১২৩৭, শুক্রবার) সাপ্তাহিক পত্ররূপে সংবাদপ্রভাকর আত্মপ্রকাশ করে। চোরবাগানের একটি প্রেসে পত্রিকা ছাপা হত; কয়েক মাস পর ১৮৩১-এর জুলাই মাসে ঠাকুরবাড়িতেই একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। ৩২নং সিমলায় সংবাদপ্রভাকর প্রেস থেকে পত্রিকা

প্রকাশের জন্য আবেদন কবা হযেছিল। সংবাদপ্রভাকব প্রকাশে ঈশ্বর গুপ্তকে সাহায্য করেন প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ। 'প্রচলিত সংবাদপত্রগুলির গৌরব হ্রাস করিতে হইবে বলিয়া প্রেমচন্দ্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র উভযে প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়েন এবং অল্প দিন মধ্যে রচনাচাতুর্য দ্বাবা আপনাদের কাগজখানিব উন্নতিসাধনে কৃতকার্য হযেন। রাজপুরুষদিগের কার্যপ্রণালী পর্যালোচনা করিতে এবং প্রস্তাবিত কোন বিধিনিয়মের বৈধাবৈধতা বিষযে নবম গরম দুই এক কথা বলিতে ইঁহাবাই প্রথমে অগ্রসর হয়েন'।[১]

সংবাদপ্রভাকর প্রকাশিত হল কলকাতার স্মবণীয আন্দোলনেব মধ্যে। সতীদাহ নিবাবণেব জন্য যে আইন হযেছে তার প্রতিরোধ করবার জন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিযে ধর্মসভা স্থাপিত হযেছে। আবার অন্য দিকে হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে কলকাতার সমাজে নানা আলোচনাও চলেছে। এই তীব্র মত-সংঘর্ষের দিনে পত্রিকাগুলি কোনো না কোনো অভিমতকে প্রতিফলিত করতে বাধ্য। ইংরেজি পত্রিকাগুলি সংস্কারমূলক চিন্তাধারার বাহন হয়েছিল। মিশনারির পরিচালিত সমাচাব দর্পণ ছিল সংস্কারেব পক্ষে। নীলরতন হালদাব-সম্পাদিত বঙ্গদূতও ছিল নবীন চিন্তাধারাব সমর্থক। এ কথাও সর্বজন-বিদিত যে, রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত সম্বাদ কৌমুদী প্রগতিমূলক আদর্শের শক্তিশালী মুখপত্র ছিল। বাংলা পত্রিকার মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায-সম্পাদিত সমাচারচন্দ্রিকা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হযে আসছিল। ধর্মসভা স্থাপিত হলে এই পত্রিকা তারই মুখপত্র হযে দাঁড়ায। ভবানীচরণ নিজে ছিলেন ধর্মসভার সম্পাদক। কৃষ্ণমোহন দাস-পরিচালিত সম্বাদ তিমিবনাশকও ছিল রক্ষণশীলদেরই পত্রিকা। সংবাদপ্রভাকর যখন প্রকাশিত হল, তখন এই পাঁচটি বাংলা সংবাদ-পত্রিকাই প্রচলিত ছিল। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের বাঙ্গাল গেজেটি ১৮১৮-র জুন মাসে প্রকাশিত হয, সম্ভবত এক বৎসব মাত্র চলে।[২] এই পত্রিকাব আদর্শ ও মত সম্পর্কে কিছু বলা যায না।

এই আদর্শ সংঘাতের দিনে ঈশ্বর গুপ্তেব সংবাদপ্রভাকর পত্রিকা রক্ষণশীল মতামতের বাহনরূপে আত্মপ্রকাশ কবল। মনে হয, যোগেন্দ্রমোহন পুরনো রীতি-নীতি ও প্রথার সমর্থক ছিলেন। ঈশ্বব গুপ্তের রচনাশক্তির পরিচয পেয়ে তিনিই অর্থ সাহায্য দিযে পোষকতা করেছিলেন। সম্বাদ তিমিরনাশক পত্রিকায় বাংলা সংবাদপত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধটি বেঙ্গল হরকরা এণ্ড ক্রনিক্‌ল পত্রে অনুদিত হয়ে পুনর্মুদ্রিত হয়।[৩] তাতে প্রভাকর সম্বন্ধে মন্তব্য ছিল—

In the year 1237 on the 16th of Magh the Prabhakar arose, by whose rays the world we believe will be enlightened, so keenly have they been darted. The reason of this is that it has simply espoused the cause of religion and has not published a word of learning, knowledge or judgement. He has merely abused the infidels, by which he has gained much regard among the Hindoos, for no respectable person thinks of, arguing with an infidel. Consequently the Prubhakaı has filled his paper with the meanest terms of of speech. Now, however, he has attacked religion and if he continues in this course, we shall know the power of this son of a leech and his supporters.

এই উদ্ধৃতির শেষাংশ থেকে মনে হয়, প্রভাকরসম্পাদক এতদিন ধর্মের পক্ষে থেকে ১৮৩২-এর জানুয়ারি মাসে মতামত পরিবর্তন করছেন। উল্লেখযোগ্য এই যে জানুয়ারি মাস থেকেই ঈশ্বব গুপ্ত সম্পাদক-পদ ত্যাগ করেন। যোগেন্দ্র মোহনের মৃত্যু হয় এই সময়েই। সম্ভবত বন্ধুর মৃত্যুতে দুঃখিত হয়ে তিনি পত্রিকা ছেড়ে দেন। কিন্তু জানুয়ারি মাস থেকে যে মাস পর্যন্ত—(যে মাসে প্রথম পর্যায়ের সংবাদপ্রভাকর বন্ধ হযে যায়)—সংবাদপ্রভাকরের উগ্র প্রগতিবিরোধী মতের পরিবর্তন হয়েছিল।

'প্রভাকব উদয়াবধি গত মাঘ মাস পর্যন্ত (জানুয়ারি) বিলক্ষণরূপে ধর্মপক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পবিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্মসভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকব একেবাবে ধর্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্মাশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন। এই ক্ষণে ঐ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ কবিয়া গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচলচূড়াবলম্বন কবিয়াছেন আর তাঁহার দর্শন পাওযা ভার।'[৪]

সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদকীয় মতামতের পরিবর্তনের দুটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে—যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যু এবং হিন্দু কলেজের সঙ্গে বিরোধের পরিণাম।

এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

এই প্রথম পর্যায়ের সংবাদপ্রভাকর যে উগ্র মতেব জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার প্রমাণ—

The Probhakar and the Ratnakar which raged so vehemently some time ago, have breathed their last.[৫]

সং বা দ র ত্না ব লী

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদনার কাজ থেকে ঈশ্বর গুপ্ত সরে আসেন। তার কয়েক মাস পরেই তিনি 'সংবাদ রত্নাবলী' পত্রিকার নেপথ্য সম্পাদক হন। মহেশচন্দ্র পাল নামক এক ব্যক্তি ২৩-এ জুলাই, ১৮৩২-এ লাইসেন্স নিয়ে সেদিনই পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৬] এই পত্রিকা আন্দুলের জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়। জগন্নাথপ্রসাদ ধর্ম্মসভার অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন।[৭] মেছুয়াবাজারের বাঁশতলার গলি থেকে সংবাদরত্নাবলী প্রকাশিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সংবাদরত্নাবলী সম্পাদনার সময়েও ঈশ্বর গুপ্তের রক্ষণশীল আদর্শের পরিবর্তন ঘটে নি। রক্ষণশীলতায় পত্রিকাটি উগ্র ছিল বলেই মনে হয়। বিলাতে সহমরণের আপীল অগ্রাহ্য হলে সংবাদ রত্নাবলী লিখেছিল,[৮]

'ইংলণ্ডরাজের স্বরাজ্যে কোন ক্ষমতা নাই। প্রজারা নামমাত্র এক ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে। আমাদের দেশে লোকে যেমন মৃণ্ময় ভাজন নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিয়া থাকে বিলাতের রাজাও তদ্রূপ।"

যদি লিপিকার্য ঈশ্বর গুপ্তের হয়ে থাকে, তবে এই মতটি পত্রিকাধ্যক্ষের পক্ষে তাঁরই।

রত্নাবলী এক বৎসর আট মাস তিন দিন চলেছিল। জন্মভূমি লিখেছে, পত্রিকাটি চার বৎসর চলেছিল।[৯] কথাটি ঠিক নয়। ১৮৪৫-এর ১৫ই নবেম্বর ব্রজমোহন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় রত্নাবলী আবার বেরিয়েছিল। কিন্তু তখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে কোনো সংস্রব ছিল না। সংবাদ ভাস্করের মন্তব্যে অনুমান করা যায় তখনও জগন্নাথপ্রসাদ এর আনুকূল্য করেছিলেন।[১০] কিন্তু জগন্নাথপ্রসাদের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের শ্রদ্ধা পরবর্তীকালেও অক্ষুণ্ণ ছিল, যদিও দুজনের আদর্শে প্রচুর পার্থক্য ঘটেছিল। রাজনারায়ণ মিত্রের কায়স্থকৌস্তভ বইখানি জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদপ্রভাকরে বইয়ের একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখা হয়। তাতে জগন্নাথপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ হন। ঈশ্বর গুপ্ত একটি স্বাক্ষরিত রচনায় লেখেন,[১১]

'আন্দুলনিবাসি বিখ্যাত ভূম্যধিকারী ধার্মিকবর বিদ্যানুরাগী বাবু জগন্নাথ-

প্রসাদ মল্লিক মহাশয় আপনার মহদ্গুণে বহুকালাবধি আমার প্রতি যথোচিত স্নেহ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং আমিও তাঁহার করুণাঋণে বদ্ধ থাকিয়া এ কাল পর্যন্ত সমভাবে সন্তোষপ্রাপ্ত হইতেছি, স্বপ্নেও ক্ষণকালের জন্য অন্তঃকরণে তদ্ভাবের অন্যথা জ্ঞান করি নাই; উক্ত সদাত্মা ব্যক্তির সৎ স্বভাবঘটিত সদ্ব্যবহার সকল যাবজ্জীবনের জন্য আমার মনে জাগরূক রহিবেক, সম্প্রতি গত দিবসীয় ভাস্করপত্রে তাহার লিখিত এক পত্র পাঠে চমৎকৃত হইয়াছি।

...বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় রীতিমত প্রভাকর পত্র প্রাপ্ত হয়েন নাই এ জন্য অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন কিন্তু প্রভাকরসম্পাদক যখন তাঁহার চিরচিহ্নিত স্নেহান্বিত বন্ধু তখন এই পত্র তাঁহার নিজের পত্র তাহাতে সন্দেহ কি, অতএব না পাইবার হেতু লিপিদ্বারা অথবা লোকের দ্বারা কিম্বা বাচনিক জিজ্ঞাসা করাই তো উচিত ছিল, ইহার নিমিত্ত প্রকাশ্য পত্রে উল্লেখ করা কি রূপ হইয়াছে তাহা বাবু আপনিই বিবেচনা করুন বিশেষত এই বিষয় আমার জ্ঞাতসার কখনই নহে...'[১১]

সংবাদ প্রভাকর — দ্বিতীয় পর্যায়

১৮৩৬ সালের ১০ই আগস্ট (২৭ শ্রাবণ ১২৪৩) সংবাদপ্রভাকর আবার প্রকাশিত হল। এবার সংবাদপ্রভাকর সপ্তাহে তিনবার বের হত। এই পর্যায়ে ঈশ্বর গুপ্ত অর্থসাহায্যের জন্য পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির কানাইলাল ঠাকুর এবং গোপালচন্দ্র ঠাকুরের কাছেই গেলেন। তাঁরা

'যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যকক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ত্রুটি করেন না।'

তখন পত্রিকার যন্ত্রালয় কোথায় ছিল বলা যায় না। ১২৬০ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ (১ ডিসেমবর, ১৮৫৩)-এর প্রভাকরে একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত জানান এই দিন থেকে হেদুয়া পল্লীর (৪৪-৬ সংখ্যক) বাড়ি থেকে প্রেস উঠে ৪২ নম্বর দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটে স্থাপিত হল। হেদুয়ার এই বাড়িতে প্রেস কবে থেকে ছিল বলতে পারি না।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন থেকে সংবাদপ্রভাকর দৈনিক পত্রে রূপান্তরিত হয়। নিশ্চয়ই পত্রিকা যথেষ্ট ভালো ভাবেই চলছিল। কিন্তু ১৮৩৬ থেকে ১৮৪৭ পর্যন্ত পত্রিকার ফাইল পাওয়া যায় না; তাই এর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বিবরণ দেওয়া

সম্ভব নয়। কিন্তু পরোক্ষে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়। এ সময়ে তাঁর মতামত অনেক বদলে গিয়েছে। প্রথম পর্যায় প্রভাকর সম্পাদনার উগ্র রক্ষণশীল ঈশ্বর গুপ্ত আর নেই। ১৮৩৬-এর একটি বর্ণনা এখানে উদধৃত করি[১২]—

A new paper has just come on the stage ; it is rather a defunct paper revived and at long last editor brought to life again. This is the Prubhakar and the editor is the same individual under whom the... rose to high popularity. Though violently orthodox... sometimes therefore very abusive, we ...with pleasaure because of the elegance of its style and the keenness of its wit. The editor is of the medical caste, a man of fine genius. By the mere buoyancy of his talent he wrote up his paper on a former occasion to two hundred subscribers ; but he took too much to abuse ; the shafts of his ridicule flew indiscriminately among friends and foes and his enemies becoming daily more numerous, his paper was suddenly stopped. He seems to have gained wisdom from experience ; for though his wit has lost none of its point and polish, he does not indulge in the same strain of vituperation. Orthodox himself in sentiment, he has yet fallen on our old friend of the Chundrika without mercy. The first occasion of discord between them arose out of the following circumstance. Lord Auckland recently honoured the mansion of Baboo Dwarkanath Tagore with a visit ; and the Chundrika, an old enemy of the Baboos owing to that close intimaey which subsisted between him and Ram Mohan Roy, published several articles and letters censuring the visit and maintaining that his Lordship had compromised his dignity by it. For our own parts we can see far more propriety to a visit from the... to the house and grounds of Native gentleman of Dwarkanath's talent, wealth and character than in a visit from the Governor-General to any one of the houses of Maharajas to witness idolatrous ceremonies.... . The *Prubhakar* espoused . the... the Chundrika in the matter of this visit and maintained his opinion with his accustomed talent. He has just entered the... again with his opponent. In a paper written with .. ease

and humour he says that the Hindoo Shastras declare that the state and condition of man is fourfold ; that each stage has appropriate duties, first that of youth for instruction ; then that of manhood for domestic cares and enjoyments ; next that of middle age for religious duties ; and lastly that of old age for religious austerities. The last stage begins at fifty at which age the Hindoo is enjoined to leave the world and all his cares, wife and children, wealth and prospect and to take in his hand a sacred staff and proceed to the forest or to some place of sanctity. Now, says the Prabhakar here is the Chundrika beyond fifty— we believe the editor does not confess to more then fifty five— a man reputed holy, yet entangled in the web of secular affairs pushing his family in the world, composing a newspaper and managing a Dhurma Subha...

ঈশ্বর গুপ্তকে রক্ষণশীল বলা হলেও ইংরেজি পত্রিকাখানি তাঁর বিশেষ আচরণ সমর্থন করেছে। সমাচারচন্দ্রিকার সঙ্গে সংবাদপ্রভাকরের বিরোধ ঈশ্বর গুপ্তে মধ্যে নবতর দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষের ইঙ্গিত দেয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইংরেজ রাজপুরুষের সঙ্গে মেলামেশাকে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি ভবানীচরণকে গোঁড়া হিন্দুত্ব রক্ষা করে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করতে উপদেশ দিচ্ছেন। একদা ধর্মসভা-অনুগামী ঈশ্বর গুপ্তের পক্ষে এ ধরণের মন্তব্য অভিনব।

এর আরও দু বছর পরে ফ্রেণ্ড অব ইনডিয়া আরো সুস্পষ্ট এবং মুক্তকণ্ঠে ঈশ্বর গুপ্তকে উদারপন্থীরূপে বর্ণনা করেছে[১৩]—

The Native Press. The Chundrika rose into notice on the shoulders of the Subha and cannot fail in some measure to participate in the effect of its prostration. The Editor has now a powerful rival In the Prubhakar which is supported by the influence of the liberal party and is edited by a native of the medical tribe who has few superiors as a Bengali writer.

১৮৪০-এর ক্যালকাটা ক্রিশচিয়ান অবজার্ভাবের একটি সংবাদে সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকাকে দেশীয় সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে[১৪]—

The Prabhakar must be noticed as one of the better issues from the Native Press. Its earliar numbers contain much

well-managed and biting satire while its very later ones give to the public the moral essays and addresses dielivered in the Tattwabodhiny Sabha, a private society of immaterialists arisen out of the Bruhmo Sabha. These are beautifully written ; they are the better moralizings of a selcet few of the followers of Ram Mohan Ray, who disclaims idolatry and professes a species of Theophilanthropism which indeed is the ne-plus-ultra of the purest Hindoo philosophy – not unamiable but powerless.[১৪]

এই সময়ে সত্য সত্যই উদারমতাবলম্বী রূপে ঈশ্বর গুপ্ত দেখা দিয়েছেন। ১৮৩৮ -এই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ফ্রেনড অব ইনডিয়ার সাক্ষ্য অনুযায়ী প্রভাকরে তত্ত্ববোধিনী সভার ভাষণের অনুরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। পরে তত্ত্ববোধিনী সভাতে তিনি নিজেও বক্তৃতা দিয়েছেন। দ্বিতীয় পর্যায় থেকেই সংবাদপ্রভাকরের প্রতিষ্ঠা এবং বন্ধুমণ্ডলী বৃদ্ধি পায়। একদা-অখ্যাত ঈশ্বর গুপ্ত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, তত্ত্ববোধিনী সভা, হিন্দু থিয়ফিলানথ্রপিক সভায় অতিশিক্ষিত সমাজের পরিচ্ছন্ন এবং প্রগতিমূলক কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হন। বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা (১৮৩৬) সভায় তিনি সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন (পরে দ্রষ্টব্য)। এই সভায় ধর্মবিষয়ক আলোচনা হত না। রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হত। জানা যায় 'নিষ্কর ভূমির কর দান' সম্পর্কে বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভায় যে আলোচনা হয়, প্রভাকর পত্রে ঈশ্বর গুপ্ত তার নিপুণ আলোচনা করেছিলেন।[১৫] কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঈশ্বর গুপ্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন ; দ্বারকানাথ ঠাকুর সংবাদপ্রভাকরের হিতৈষী হন। তিনি এই পত্রিকাকে নানাভাবে সাহায্য করতেন।[১৬] জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের যোগ ঘনিষ্ঠ হতে থাকে এবং ব্রাহ্মধর্মের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হতে থাকেন। আরো দুজন বড়ো লেখক সংবাদপ্রভাকরের লেখক শ্রেণীভুক্ত হন— রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অক্ষয়কুমার দত্ত।

অক্ষয়কুমার তখনও লেখক হন নি। প্রভাকরের বিজ্ঞাপন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর গুপ্ত সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারী হরমোহন দত্তের কাছে যেতেন।[১৭] অক্ষয়কুমার ছিলেন হরমোহনের পিতৃব্যপুত্র। অক্ষয়কুমারকে দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজি সংবাদের অনুবাদ করিয়ে নেন। অনুবাদকর্মের দক্ষতা দেখে তিনি অক্ষয়কুমারকে পদ্য ছেড়ে গদ্য লিখতে নির্দেশ দেন। ঈশ্বর গুপ্তই অক্ষয়কুমারকে দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় সম্ভবত ১৮৩৯-এ। অক্ষয়-কুমারের অনেক রচনাই সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৮] অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত গদ্যরচনাতে এবং হাস্যরসাত্মক কবিতায় নানা সস্নেহ মন্তব্য করেছেন।

নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে।
ঘুরিতেছে মাথামুণ্ড মাথামুণ্ড লিখে॥
কোথা তার বাহ্যবস্তু মানবপ্রকৃতি।
এখন ঘটেছে তায় বিষম বিকৃতি॥

—হেমন্তে বিবিধ খাদ্য

১৮৩৬ থেকে ১৮৪৭ পর্যন্ত সময়টিকে প্রভাকরের দ্বিতীয় পর্যায়রূপে চিহ্নিত করবার কারণ সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদকরূপে ঈশ্বর গুপ্তের মতামত সম্ভবত তখনও দৃঢ় হয়ে ওঠে নি, দৃঢ় হবার পথে অগ্রসর হচ্ছিল মাত্র। নানা স্বাস্থ্যকর প্রভাবে তাঁর মনটি প্রস্তুত হয়ে উঠছিল। সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ ছেড়ে আরো বড়ো পরিপ্রেক্ষিকায় জীবন ও জীবনের সমস্যাকে বোঝবার সহায়তা তিনি লাভ করছেন। পরবর্তী তৃতীয় পর্যায়ে তার পত্রিকা একটি অবিচল আদর্শে পৌঁছে বাঙালি পাঠকের শ্রদ্ধা অজন করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্পাদনায় মানসিক সমতার অভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৪৫-এ ফ্রেনড অব ইনডিয়ার একটি সমালোচনাতে—

The Sambad Probhakar, a daily paper of four pages. This journal is very unequal in general merit, at times exhibiting considerable ability and acuteness at others becoming very mediocre indeed. It is also gradually verging into the advertising class and for wellwritten editorials often substitute the dull, lame and juvenile exercises of the pupils of the Calcutta seminaries in the shape of half-English half-Bengali versions of school theses, heavy translations of pieces from Bacon and others read in the classes. In hostility of Christianity this paper continues unchanged, at once malevolent uncandid and vituperative most indecently so; wholly reckless of truth while pandering to the worst passions of the worst classes of native society— and of course immensely

> lessening its own credit and influence with all reasonable impartial and sound-judging persons, whether Hindu or Christian. The style is often vigorous and generally idiomatic but frequently *anglicises*: it is ambitious too, and neglectful of the nicities and accuracies of Bengali grammar.

এই মন্তব্যকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেবার কারণ আছে বলে মনে হয় না। খ্রীষ্টান-বিরোধী আন্দোলনের সময় লেখা বলে সংবাদপ্রভাকর সম্পর্কে শুধু নয়, তত্ত্ববোধিনীর সম্বন্ধেও অসহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় আছে।

পাষণ্ডপীড়ন

পাষণ্ডপীড়ন ১২৫৩, ৭ই আষাঢ় (১৮৪৬, ২০ জুন) প্রকাশিত হয়, পরের বৎসর আগস্ট-সেপটেম্বর মাসেই উঠে যায়। এটা সাপ্তাহিক পত্রিকা। ঈশ্বর গুপ্ত বলছেন এতে 'সবজনমনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত' হত। কিন্তু এই পত্রিকার উদ্দেশ্য নেহাৎ সংবাদ প্রচার ছিল না, পত্রিকার নাম দেখে মনে হয়। পাষণ্ড-পীড়নের সঙ্গে গৌরীশংকর তর্কবাগীশের বিবাদের বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্রই দিয়েছেন। তার চেয়ে বেশি কিছু বলবার নেই।[২০] দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনীতে কিশোরী চাঁদ লিখেছেন গৌরীশংকর এবং ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে দ্বারকানাথ ঈশ্বর গুপ্তকেই পছন্দ করতেন এবং তাঁর গুণগ্রাহী হয়েছিলেন।

সংবাদ সাধুরঞ্জন

পাষণ্ডপীড়ন উঠে গেলে ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৪৭-এর আগস্ট মাসে বের করলেন সংবাদ সাধুরঞ্জন। এই পত্রিকা প্রতি সোমবার বের হত। ছাপা হত প্রভাকর যন্ত্রে। এতে এই শ্লোকটি থাকত—

> প্রচণ্ড পাষণ্ড তরু প্রভঞ্জনঃ। সমস্ত সল্লোক মনোঽনুরঞ্জনঃ।
> সদাসদালোচনঃ লোচনাঞ্জনঃ। প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ॥
> প্রচণ্ড পাষণ্ডরূপ তরুপ্রভঞ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন॥
> সদা সৎ আলোচন লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন॥

১৮৫৯ সালের ৫ই আষাঢ় সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদকীয়তে সাধুরঞ্জনের সম্পর্কে একটি ছোট বিবৃতি দেওয়া হয়।[২১] তার থেকে জানা যায় 'নীতি ইতিহাস ও বিবিধ সৎপ্রবন্ধ এবং রহস্য ও অন্যান্য বিষয়ে কবিতাদি প্রকাশ করণার্থ' এই পত্রিকার সৃষ্টি হয়েছিল। রচনার উৎকর্ষে এই পত্রিকা অল্পদিনের

মধ্যেই পাঠক-সমাজে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। 'জ্ঞানবিশারদ পণ্ডিত অবধি বিদ্যালয়ের ছাত্র পর্যন্ত অনেকেই সমাদরে সাধুরঞ্জন পত্র গ্রহণ করেন, কুলবালারাও অন্তঃপুরে তাহা পাঠ করিয়া পরস্পর আমোদিতা হইতেন।' সাধুরঞ্জন প্রতিষ্ঠা অর্জন করলে সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত মনে করলেন, এই পত্রিকা আর তাঁর নামে প্রকাশিত হওয়া ঠিক নয়। সেই জন্য জ্ঞাতিভ্রাতা নবকৃষ্ণ রায়কে নামে মাত্র সম্পাদক করে দিলেন। নবকৃষ্ণ মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তেন। সম্পাদনার কাজ করতেন ঈশ্বর গুপ্ত। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর নবকৃষ্ণ সাধুরঞ্জনের স্বত্ব দাবি করলেন। অথচ ঈশ্বর গুপ্ত উইলে নবকৃষ্ণকে পত্রিকা দিয়ে যান নি। নবকৃষ্ণকে সেই অধিকার নিতে দেওয়া না হলে, নবকৃষ্ণ বিজ্ঞাপনের বাকি টাকা ইত্যাদি আদায় করে সাধুরঞ্জনের ব্লক ইত্যাদি সকলের অজ্ঞাতসারে নিয়ে চলে যান। অতঃপর এই পত্রিকা আর প্রকাশিত হয় নি। ১২৬৬ সাল (১৮৫৯ সালের এপরিল) বৈশাখ পর্যন্ত পত্রিকা চলেছিল।

সংবাদ সাধুরঞ্জনের আকার ছিল ছোটো। মোটে দুই পাতা, দৈর্ঘ্যে ফুলস্কেপ কাগজের চেয়ে ছোটো। এতে বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি কবিতা বেরিয়েছিল, 'শরদ্বর্ণনাছলে দম্পতির কথোপকথন,' ৩ অকটোবর ১৮৫৩ এবং 'বসন্তবর্ণনাছলে দম্পতির কথোপকথন,' ২৪ অকটোবর ১৮৫৩।

সংবাদ প্রভাকর—তৃতীয় পর্যায়

১৮৪৮ থেকে সংবাদপ্রভাকরের তৃতীয় পর্যায়ের আরম্ভ ধরা যেতে পারে। এর আগের বছরের প্রভাকর সহজপ্রাপ্য নয় বলে একালের পাঠকের কাছে এই সময়ের প্রভাকর পত্রিকাই ঈশ্বর গুপ্তের স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি হয়ে আছে। তাঁর সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত করতে গেলে এই সময়ের ফাইল দেখেই করতে হবে। ঈশ্বর গুপ্ত যে এই সময় নিজের ব্যক্তিত্বকে আবিষ্কার করেছিলেন, এবং সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকা নানা বৈচিত্র্যে এবং নূতনত্বে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। প্রভাকর শুধু যে সংবাদপত্রিকাই ছিল তা নয় ; মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে প্রভাকর কতকগুলি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। ঈশ্বর গুপ্ত কতকগুলি স্থির গ্রহণযোগ্য আদর্শ প্রচার করে জাতীয় জাগরণের প্রথম বিপ্লবের শেষে বাঙালি সমাজকে ভাবে চিন্তায় এবং কর্মে সুচিন্তিত পথ অনুসরণ করতে আহ্বান করেছিলেন। এটা একটা খুব বড়ো এবং অর্থপূর্ণ কাজ, একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। আধুনিক এবং নবীন চিন্তাধারা ইংরেজি

ভাষায় আবদ্ধ থেকে (নব্যবঙ্গদের রচনা ইত্যাদিতে) বৃহৎ জনসমাজ থেকে দূরে সরে ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদপ্রভাকরের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় সামাজিক আদর্শকে দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে দিলেন। সংবাদপ্রভাকরকে বলা যায় সাধারণ লোকসমাজ এবং উচ্চশিক্ষিত সমাজের সংযোগসূত্র— যে সূত্রটির কল্পনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পরিকল্পনা করে।

প্রভাকরের বিক্রয় কি রকম বেড়ে গিয়েছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়—

‘এখন হইতে প্রভাকর উদীয়মান রবির ন্যায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রভাকরের কবিতা পড়িবার জন্য বাঙ্গালা দেশের লোক পাগল হইয়া উঠিল। প্রভাকর বাহির হইলে বিক্রেতৃগণ রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া ঐ সকল কবিতা পাঠ করিত এবং দেখিতে দেখিতে কত কাগজ বিক্রয় হইয়া যাইত! ক্রমে দেশে ঈশ্বরচন্দ্রী কবিদল দেখা দিল; এবং বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত হইল।’[২২]

নবজীবনে ‘বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাসে’ সংবাদপ্রভাকরের সম্বন্ধে বলা হয়েছিল[২৩]—

‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় হইতেই বাঙ্গালা সংবাদপত্রের যুগান্তর উপস্থিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তি বিলক্ষণ ছিল। তাঁহার সেই শক্তি যতই পরিবর্ধিত হইতে থাকে, প্রভাকরও সেই সঙ্গে সঙ্গে কেবল কলিকাতা বা উপনগর নহে, সমস্ত বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে স্বীয় প্রাবল্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। ইতিপূর্বে যে সকল সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়াছিল, সেগুলি কেবল কলিকাতা ও নিকটবর্তী গ্রামসমূহে পঠিত হইত মাত্র। মফস্বলের লোকেরা “বাঙ্গালা সংবাদপত্র” শব্দটি শুনিয়াছিল, কখন চক্ষে দেখে নাই। প্রভাকর সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া সর্বপ্রথমে বাঙ্গালী জাতির বাঙ্গালা সংবাদপত্র পাঠের আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়া দেয়। প্রভাকর পাঠ করিবার জন্য সাধারণের আগ্রহ এই সময়ে এতদূর বৃদ্ধি হয় যে নগরের অনেক গ্রাহক প্রভাকর মুদ্রিত হইবার সময় যন্ত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া অগ্রে কাগজ লইবার চেষ্টা করেন এবং মফস্বলের গ্রাহকেরা ডাকের অপেক্ষা করিতে থাকেন। ১২৬০ সালে প্রভাকরের গ্রাহক পাঁচ হাজারের অধিক হয়। এই সময়ে প্রাত্যহিক প্রভাকরে মনোমত সমধিক কবিতা প্রকাশের সুবিধা না হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র একখানি স্বতন্ত্র মাসিক প্রভাকর প্রকাশ করেন। তাহার আদর আবার প্রাত্যহিক অপেক্ষা সমধিক হয়।’

সুতরাং সংবাদপ্রভাকরের বৈশিষ্ট্য এই যে শুধু সংবাদ পরিবেশন নয় সাহিত্য পরিবেশনও এর উদ্দেশ্য ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কবিতা ছাড়াও পরবর্তী কালে সুখ্যাত বহু লেখকের রচনা এতে আত্মপ্রকাশ করল। সংবাদপ্রভাকর একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরি করল, যাঁরা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি অনেকখানি নির্ধারিত করেছে। এই লেখক আবিষ্কার ও তৈরি করা ঈশ্বর গুপ্তের একটি খুব বড়ো কাজ। বঙ্গদর্শন, ভারতী, সবুজপত্র প্রভৃতি যেমন লেখকগোষ্ঠী তৈরি করেছিল সংবাদপভাকরের কীর্তি ছিল তাদেরই পূর্বসূচনা।[২৪] অক্ষয়-কুমার দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে ঈশ্বর গুপ্তই গদ্য রচনায় প্রবর্তিত করেছিলেন। এ ছাড়া রঙ্গলাল দীনবন্ধু মনোমোহন বসু এবং শেষের দিকে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার রামদাস সেন প্রভৃতি অনেকেই প্রভাকরে লেখা আরম্ভ করেন। হরিমোহন সেন ছিলেন আর একজন বিখ্যাত লেখক। এ কথা বলা যায় বস্তুগত কবিতার যে আদর্শ সংবাদপ্রভাকর স্থির করে দিয়েছিল, পরবর্তী কালে বিহারীলালের আত্ম-গত কবিতার পাশে সেই আদর্শ দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যকে শাসন করে এসেছে। সংবাদপ্রভাকরের লেখক না হলেও অনেক বড়ো কবি বাল্যকালে প্রভাকরের কবিতা রচনার আদর্শ শিরোধার্য করেই কবিজীবন আরম্ভ করেছিলেন। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, বলদেব পালিত, হরিনাথ মজুমদার, হরিশচন্দ্র মিত্র, প্রভৃতি কবিরা ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদপ্রভাকরের কবিতা অনুকরণ করেই কবিতা লিখতে শেখেন।

সংবাদপ্রভাকরের তৃতীয় পর্যায়ে ঈশ্বর গুপ্ত শুধু যে লেখক তৈরি করে দিয়েছেন তা নয়, সাহিত্যের ইতিহাস, গবেষণা এবং সমালোচনারও সূত্রপাত করে যান। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫-র মধ্যে ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ নিধুবাবু এবং হরুঠাকুর নিতাই বৈরাগী রাম বসু প্রভৃতি অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি ও কবিওয়ালাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। বাংলা সাহিত্যের এই বিশৃঙ্খল যুগের একটি সুসম্বদ্ধ রূপ তিনিই তৈরি করে দেন। এই কাজে তিনি যেমন ইতিহাস রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন, তেমনি অসামান্য পরিশ্রম করে গবেষণা করবারও চেষ্টা করেছেন। ভারতচন্দ্রের জীবনীতে তার প্রমাণ আছে।[২৫] সময় নির্ণয় করার ব্যাপারে ঈশ্বর গুপ্তের গবেষণাশক্তি প্রকাশ পেয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের এই মহৎ কাজটিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যে কতখানি উপকৃত হয়েছে, তা বিশেষ আলোচনাসাপেক্ষ বিষয়।[২৬]

বাংলা সাহিত্যের আর-একটি নূতন রীতির সূত্রপাত তৃতীয় পর্যায়ের সংবাদ-

প্রভাকর করে যায়। গদ্যে ভ্রমণকাহিনী রচনা করে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের একটা নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে গেলেন। ১৮৪৮ থেকে ঈশ্বর গুপ্তকে দেশ ভ্রমণে যেতে দেখি। বিদেশ থেকে তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি প্রভাকরে ধারাবাহিক ক্রমে লিখে পাঠাতেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এই ভ্রমণকাহিনীগুলিতে তিনি সমাজ দেশ লোকাচার প্রভৃতি ভৌগোলিক ঐতিহাসিক তথ্য, বাজার দর, শিক্ষাবিস্তার, উন্নয়নমূলক কাজ, স্থানীয় ব্যক্তিদের সংস্কার ইত্যাদি বহু বিচিত্র বিষয়ে অনুসন্ধানস্পৃহা এবং ঔৎসুক্যের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। এবং এইজন্য 'ভ্রমণকারি বন্ধুর পত্র' রচনাগুলি নতুন ভ্রমণ-সাহিত্যে পরিণত হয়।[২৭] বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গলের' সঙ্গে তুলনায় এ মন্তব্যের সার্থকতা সহজেই বোঝা যায়।

সংবাদপ্রভাকরের পাতা ওলটালে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কোলাহল-মুখর কলকাতা শহরের ছবি পাঠকের মনে না এসে পারে না। ইংরেজি শিক্ষা, সামাজিক আন্দোলন, কবিগানের আসর, নানা কৌতূহলজনক খবর এবং মন্তব্য, সেই সঙ্গে সম্পাদকের নানা বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ যেমন দেখি, তেমনি দেখি কলকাতার বাইরে থেকে পাওয়া নানা পত্রপ্রেরকের পত্রে স্থানীয় সমস্যার কথা। এতে বাংলা দেশের জনজীবনের স্পন্দনটি সহজেই অনুভব করি। প্রভাকরের এটাও একটা লক্ষণীয় কাজ। কলকাতায় আধুনিক ভাবধারার বিকাশ ঘটছে, এরই সঙ্গে ঢাকা মেদিনীপুর রাজশাহী মুরশিদাবাদ মালদহ নদীয়া বর্ধমান হুগলি হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে তার যোগ ঘটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইংরেজি কাগজ থেকে অনুবাদ করে প্রভাকর বাংলার বাইরের খবরও দেবার চেষ্টা করত। ঈশ্বর গুপ্ত বলেছিলেন,[২৮]

'আমরা অহঙ্কার করিয়া কহিতে পারি যে সংপ্রতি বাঙ্গালা পত্র দূরে থাকুক ইংরাজী পত্রেও প্রভাকরের ন্যায় নানাস্থানীয় আশ্চর্য ও স্বরূপ ঘটনা সকল আশু প্রকাশ হয় না এবং সেই সমুদয় তাঁহারদিগের অগ্রে পাইবারো কোন সম্ভাবনা নাই।'

প্রভাকর পত্রিকার মনোভাবকে উদারপন্থী বলতে পারি। ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার, যন্ত্রশিল্পের উন্নতি, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, নতুন মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্যা যেমন চাকরি ইত্যাদি জীবিকার ব্যবস্থা, কৃষকদের প্রতি গভীর সমবেদনা, নীলকর অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা— এসবই ঈশ্বর গুপ্তের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। ধর্মসভা সম্বন্ধে বিদ্রূপ, তত্ত্ববোধিনীসভা ও ব্রাহ্মনেতাদের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা,

সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধে নিশ্চিত অপকারিতাবোধ তৃতীয় পর্যায়ের প্রভাকরের বৈশিষ্ট্য। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের মনোভাব তাঁর কবিতার উদ্দেশ্যহীন ব্যঙ্গ থেকে বুঝতে গেলে চলে না ; গদ্য লেখাতে তিনি একটি মধ্যপন্থী মত পোষণ করে গিয়েছেন। বস্তুত এই বিষয়টিতে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট মন্তব্য চোখে পড়ে নি, তবে উভয় পক্ষেরই সংবাদ এবং পত্র নিরপেক্ষ ভাবে প্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত অবশ্য কোনো সমর্থনই প্রকাশ করেন নি। ইংরেজ রাজত্বের অপসারণ তিনি চান নি। তাঁর মতো দেশপ্রেমিকের পক্ষে এটা কিছু আশ্চর্য নয়। এর কারণ সেকালের প্রচলিত মনোভাব।

তৃতীয় পর্যায়ের সম্পাদনার সময় বস্তুত ঈশ্বর গুপ্ত নিজে যে সম্পাদকীয় লিখতেন তা নয়। শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর সহকারী। শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পত্রিকার দায়িত্ব প্রধানত দিয়ে তিনি মাসিক প্রভাকর নিয়ে থাকতেন অথবা দেশভ্রমণে ব্যাপৃত থেকেছেন। এতে পত্রিকার যে অসুবিধা না হত তা নয়। ১৮৪৮-৪৯ সালে ঈশ্বর গুপ্ত উত্তর ভারত ভ্রমণে যান। ফিরে এসে লেখেন[২৯]—

'এক বৎসর অতীত হইল আমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম, সংপ্রতি দুই দিবস হইল শ্রীশ্রী৺বারাণস্যাদি ধাম দর্শন করণান্তর কলিকাতা মহানগরে প্রত্যাগত হইয়াছি আমার অনবস্থান সময়ে সহকারি সম্পাদক শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের গুরুতর কর্ম যে প্রকারে নিষ্পাদিত করিয়াছেন বোধ করি তাহাতে আপনারদিগের সংপূর্ণ সন্তোষ জন্মিয়া থাকিবেক ‥আমার প্রত্যাগমনকালে যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক ও প্রভাকরের হিতার্থি পাঠক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে তাঁহারদিগের কথাই নাই, তাঁহারা আপনাপন বিষয় আপনার মনে ২ জ্ঞাত আছেন,…কলিকাতা বারাণসী দিল্লী মিরাট আগ্রা রঙ্গপুর বর্ধমান এবং আর ২ নিকটস্থ ও দূরস্থ স্থানের সমুদয় ইংরাজী বাঙ্গালা পারস্য ও হিন্দি ভাষার সমাচার পত্রের সহযোগি সম্পাদক মহাশয়েরা ভ্রাতৃভাবে আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করতঃ পূর্ব্বানুরূপ সম্মানিত করিলেন এবং যন্ত্রালয়ে আমার পুনর্ব্বার নিযুক্ত হওনের সংবাদ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া উপকার মনে বদ্ধ করিবেন, ইত্যলং বিস্তরেণ।

কলিকাতা
সংবাদপ্রভাকর যন্ত্রালয়
৮ অগ্রহায়ণ ১২৫৭।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক

সংবাদপ্রভাকরের বিক্রয় যথেষ্ট বেড়ে গেলেও পত্রিকার ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হত বিজ্ঞাপনের উপর। তাঁর অনুপস্থিতিকালে এক বছরে প্রায় পাঁচ হাজার টাকার 'বিজ্ঞাপনের উৎপন্নের হানি' হয়েছে। স্বভাবতই তাঁকে পাঠকদের গ্রাহকমূল্যের পরিশোধের জন্য আবেদন করতে হয়েছে। তিনি লিখলেন,[৩০]

'আমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমন পুরঃসর মৎপ্রণীত প্রভাকর পত্রের কার্য নির্বাহ নিমিত্ত যেরূপ পরিশ্রম এবং প্রযত্ন করিতেছি তাহা বর্ণনার দ্বারা বর্ণনীয় নহে। ইদানীং আমার লিপি এবং আর আর কার্যের নির্দিষ্ট সহকারী কেহই নাই, কেবল একাকী সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকি, প্রায় আহার নিদ্রা বর্জিত হইয়াছি, সুপ্তি আর তৃপ্তি প্রদান করিতে পারেন না। নিদ্রা নয়ন-নিকেতনে নিবসতি করতঃ স্থিরভাবে বিহার করণে বিরত হইয়াছে…প্রতিদিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্বক প্রাতঃক্রিয়া সমাধানান্তর লেখনী ধারণ করি, পরে মধ্যাহ্ন সময়ে জীবনধারণোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া পুনরায় রাত্রি দুই প্রহরের পর সেই লেখনীকে পরিত্যাগ করি। অধুনাতন আমি একপ্রকার সর্বত্যাগী হইয়াছি। আহার ব্যবহার লৌকিকতা আলাপ পরিচয় আমোদ প্রমোদ ধর্ম কর্ম সকলি গিয়াছে…

আমি কিছুদিন প্রবাসী হওয়াতে যন্ত্রালয় সংক্রান্ত কার্যে অতিশয় গোলযোগ ঘটিয়াছে, সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ। যদি তদ্বিষয় সহজেই শেষ হইয়া যায় তবে বড়ই মঙ্গল,নচেৎ (অধিক ক্ষতি কি প্রকারে সহিষ্ণুতা হইতে পারে) তজ্জন্য বিচারালয় অবলম্বন করিতে হইলে সকলেই বিশেষ জানিতে পারিবেন।…

গত বর্ষে আমরা বিদেশীয় বন্ধুবৃন্দের আনুকূল্যে যে সমস্ত সমাচার এবং দেশ-বিশেষের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে আমার সর্বস্বধন প্রভাকরপত্রের অত্যন্ত গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, নানা দেশীয় নানা ধর্মাবলম্বি পাঠক মাত্রেই তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইংরাজীপত্র সম্পাদক মহাশয়েরা অতিশয় সমাদরপূর্বক তাহার অনুবাদ সকল স্ব স্ব পত্রে প্রকাশ করতঃ তন্মধ্যে যে যে বিষয়ে পোষকতা করা আবশ্যক তাহাও করিয়াছেন সেই সূত্রে রাজপুরুষেরা দেশের অনেক শুভাশুভ ঘটনা জানিতে পারিয়াছেন। বাঙ্গালাপত্র পাঠ করণে অনেকের অন্তঃকরণে উৎসাহ জন্মিয়াছে। অপিচ বাঙ্গালাপত্রে অনেক দেশহিত-জনক উত্তমোত্তম অথচ যথার্থ বিষয় প্রকাশিত হয় অনেকের অন্তঃকরণে এমত বিশ্বাস জন্মিয়াছে…'

মনে হয় তাঁর অনুপস্থিতির সময় পত্রিকার কার্য পরিচালনায় গুরুতর গোলমাল হয়েছিল। টাকা পয়সার হিসাবের ফলেই কি না বলা যায় না, সহকারী সম্পাদক শ্যামাচরণও তখন ছিলেন না দেখা যাচ্ছে। ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছিল যে আদালতে যাওয়ার কথাও ঈশ্বরচন্দ্র ভেবেছেন। এই সঙ্কট ঠিক কি প্রকৃতির বলা যাচ্ছে না।

তৃতীয় পর্যায়ে যাঁরা ঈশ্বরচন্দ্রকে সম্পাদনা ও লিপিকার্যে সাহায্য করেছেন, তিনি তাঁদের নাম যথোচিত শ্রদ্ধাসহকারে উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমের প্রবন্ধে সেই অংশ উদ্ধৃত হয়েছে।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রামচন্দ্র সম্পাদক হলেন।

হিন্দু কলেজ নব্যবঙ্গ ঈশ্বর গুপ্ত

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ১৮৩১-এ সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদকরূপে আবির্ভূত হবার সময়টি আধুনিক বাংলার একটি স্মরণীয় আন্দোলনের যুগ। কলকাতার নব্যবঙ্গের আন্দোলন এই সময়েই আরম্ভ হয়েছিল। নবপ্রচারিত 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় এই আন্দোলনের কিছু ছায়াপাত হয়েছিল, তার থেকে এই আন্দোলনের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের যোগের একটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন নি। এই আন্দোলন হয়ে গিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মেরও পূর্বে। ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যজীবনের এই সময়ের খুঁটিনাটি বিবরণ তিনি পান নি। তাঁর শেষ জীবন-সম্পর্কিত সংবাদই তিনি জানতেন। তাঁর রচিত জীবনীতে বিশেষ করে পরবর্তী সময়ের মতামত ও আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে।

নব্যবঙ্গের এই আন্দোলন শুরু হয় হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে।[৩১] ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০-এ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট-এর উদ্যোগে ডেভিড হেয়ারের উৎসাহে এবং গণ্যমান্য দেশীয় ব্যক্তিগণের আগ্রহাতিশয্যে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। কলেজের একটি ডিরেক্টর সভা গঠিত হল। রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর এবং চন্দ্রকুমার ঠাকুর প্রথম গবর্নর নির্বাচিত হলেন তাঁদের দানের পরিমাণ সর্বোচ্চ ছিল বলে। ডিরেক্টর-সভায় ছিলেন গোপীমোহন দেব জয়কৃষ্ণ সিংহ রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গঙ্গানারায়ণ দাস। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় দেশীয় সেক্রেটারী এবং মেজর আরভিঙ হলেন য়ুরোপীয় সেক্রেটারী। ডিরেক্টররা প্রতি বৎসর চারজন সদস্যসমন্বিত কমিটি অব

ম্যানেজমেন্ট নির্বাচন করতেন। আপার চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে কলেজের উদ্‌বোধন হল, তারপরে চিৎপুরে রূপচরণ রায়ের গৃহে এবং পরে জোড়াসাঁকোর ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। এই কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যের মধ্যে এই তিনটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, কেননা এই শিক্ষা-নীতি থেকেই পরবর্তী নব্যবঙ্গের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল :

1. The primary object of this Institution is, the tuition of the sons of respectable Hindoos in the English and Indian languages and in the literature and science of Europe and Asia.
4. In the school shall be taught English and Bengali Reading, Writing, Grammar and Arithmetic by the improved method of instruction. The Persian language may also be taught in the school until the Academy be established as far as shall be found convinient.
5. In the Academy besides the study of such language as cannot be so conviniently taught in the school, instruction shall be given in History, Geography, Chronology, Astronomy and Mathematics, Chemistry and other sciences.

অবশ্য ইংরেজি সাহিত্যশিক্ষার উপরই শেষ পর্যন্ত ঝোঁক বেশি করে পড়েছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই কলেজে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই পড়ানো হত[৩১]। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের হিন্দু কলেজের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হয়েছিল :[৩২]

The Hindoo College is intended to compass something more ; to teach Bengalee youth to read, and relish English literature ; to store their minds with the facts of history and science and to enable them to express just conclusions in a clear and polished style : founded upon a comprehensive view of the constitution of society, and the phenomena of nature.

হিন্দু কলেজের এই শিক্ষানীতিতে বাংলা দেশে নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত হল। কিন্তু এই কলেজের শিক্ষাদর্শেরও দুটি যুগ ছিল। কলেজ স্থাপন থেকে ১৮২৬ পর্যন্ত শিক্ষারীতিতে ছাত্ররা বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, অতীত এবং বর্তমান ইতিহাসের কয়েকটি ঘটনা, সংখ্যা ও বীজগণিতের কয়েকটি নিয়ম শেক্সপীয়র পোপ মিলটন ক্যাম্বেলের কিছু রচনা মুখস্থ করা ছাড়া আর কিছু করত না।[৩৪] ১৮২৬-এ হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও শিক্ষক নিযুক্ত হবার

পর কলেজের শিক্ষানীতিতে নতুন যুগের সৃষ্টি হল। এই পরিবর্তিত শিক্ষানীতির একটি দীর্ঘ বর্ণনা ১৮৩৭-এর ক্যালকাটা মানথলি জার্নাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৫] নতুন শিক্ষান্দোলনের সমর্থনসূচক সর্বপ্রাচীন বিবরণ বলে এই ধারাবাহিক রচনার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য—

When Mr. Derozio was appointed an assistant teacher at the Hindu College, he introduced wonderful innovations into the former method of instruction. It was he that first awakened in the minds of his pupils a curiosity and a third for knowledge. It was he who thought it his principal duty to *refine their feelings.* It was he who roused them *to think for themselves*. It was he that gave them *solid* instruction in the shape of entertainments and it was he that enraptured them with sublimest precepts. To this highminded gentleman (now peace to his shade !) the educated Hindoos are all indebted. Thir liberty of thought, their liberty of expression and their liberty of action they all have derived from him. Mr. Derozio may be properly said to have dissipated their bigotted ideas with the rod of an enchanter —to have given the very first stimulus to their scientific enquiries to have tought them to correct rules of philosophizing on all subjects to have exhorted them to inflict a death-blow on the impositions of the Brahmins and to have shown them the path to *truth* and virtue. While he lived, the bigots trembled with fear ; their religion was fast decaying ; apostates increasing : and the rage of persecution growing virulent every day. Since his valuable lectures have been made known to all, many a young man has enlisted himself under the standard of liberal party...The liberals havs the good of their country at heart and always cherish friendly feelings towards their countryman The virtues which they practise are really of an exalted nature. There is nothing in the world which they hate more than falsehood —hypocrisy and double dealing....

The principles which they have imbibed are all based upon the excellent doctrines of morality. Notions of English honor and independence have been infused in their minds.

Sycophancy and adulation they detest and would consider it the *greatest degradation* imaginable to flatter a man however great he may be...In matters of politics they are all radicals and are followers of Benthamite principles. The very word Tory is a sort of ignominy among them. Reformation they say ought to be effected in every age and country...With the administration of Lord William Bentinck and Sir Charles Metcalf they are very much satisfied and when they reflect on those glorious acts of theirs—the prevention of the burning of the suttee, the elevation of of native character and dispensing with the invidious distinction of caste creed or color, the emancipation of the press, the abolition of the transit duties and the establishment of the Medical College they really feel an inexpressible delight. They think that toleration ought to be practised by every government and the best and surest way of making the people abandon their barbarous customs and rites is by diffusing education among them. With respect to the question of Political Economy they all belong to the school of Adam Smith. They are clearly of opinion that the system of monopoly, the restraints upon the trade and the the international laws of industry, impede the progress of agriculture and manufacture and prevent commerce from flowing in the natural course.

The science of mind is also their favourite study. The philosophy of Dr. Reid, Dugald Stewart and Thomas Browne being perfectly of a Beconian nature comes home to their "business and bosom." The frivolous discussions which abound in the works of many ancient as well as modern writers have, they say, tended to produce more harm than good.

এই নতুন শিক্ষাপদ্ধতি এবং চিন্তাবৃত্তির উদ্‌বোধন-কার্যের নায়কতা যিনি করেছিলেন, তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক কবি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)।[৩৬] ডিরোজিও বাল্যকাল থেকেই শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকার সম্পাদক ডকটর জন গ্রাণ্ট তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন।[৩৭]

I was engaged one day to take four O' clock dinner at the house of Colonel W. C. F. a valued and kind hearted old friend of mine and also my commanding officer in days that were amongst the pleasantest of my life in a corps, the officers of which were like a bond of brothers. Colonel F. had long known Mr. Derozio senior (a highly respectable and worthy man) and his amiable wife. I had scarcely been introduced to them when Henry came up, his face sparkling with pleasure at meeting the reports of the school examination. The boy after this, as I particularly requested him would often come to see me and I found his intellectual powers precocious and his acquirements ripe beyond his years. In a word I took great interest in him.

ডিরোজিও ১৮১৫ থেকে ১৮২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেভিড ড্রামনডের ধর্মতলা একাডেমিতে ছাত্র ছিলেন।[৩৮] ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও ভাগলপুরে তাঁর মামার নীলকুঠিতে কাজ নিয়ে যান। এখানেই তাঁর 'ফকির অব জঙ্গীরা' কাব্যের সূচনা। কলকাতায় ফিরে ১৮২৬-এ প্রথমে হন ইনডিয়া গেজেটের সহকারী সম্পাদক, তার পর মার্চ মাস থেকে হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষকের কাজ নেন। এখানে ডিরোজিও পড়াতেন **Goldsmith's History of Greece, Rome and England, Russell's Modern Europe, Robertson's Charles V, Gay's Fables, Pope's Homer's Iliad and Odyssey, Dryden's Virgil, Milton's Paradise Lost, Shakespeare's one of the Tragedies.**[৩৯]

১৮৩১-এর ২৫-এ এপ্রিল পর্যন্ত ডিরোজিও এই কলেজের শিক্ষক ছিলেন। নব্যবঙ্গ নামে পরিচিত অধিকাংশ যুবকেরাই এই সময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্র।—

রামগোপাল ঘোষ	১৮২৩-১৮৩০
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮২৪ ফেব্রুয়ারি-১৮২৯, ১ নবেম্বর
রাধানাথ শিকদার	১৮২৪ মার্চ-১৮৩১ ডিসেম্বর
শিবচন্দ্র দেব	১৮২৫ ১লা আগস্ট-১৮৩১, ২০ ডিসেম্বর
প্যারীচাঁদ মিত্র	১৮২৭ ৭ জুলাই-স্কুলত্যাগের কাল অজ্ঞাত[৪০]
রসিককৃষ্ণ মল্লিক	১৮২১-১৮৩০, ১৩ মার্চ
রামতনু লাহিড়ী	১৮২৮-১৮৩৩

এ ছাড়া মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮৩১-

এর মার্চ পর্যন্ত), হরচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল মিত্র এই সময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। রামমোহনের সহচর তারাচাঁদ চক্রবর্তী ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন না। ১৮১৭ থেকে ১৮২২ পর্যন্ত তিনি এখানে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি অবশ্য পরে নব্যবঙ্গের নেতৃত্ব করেছিলেন।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ডিরোজিও ছাত্রদের বিশেষ করে যে সব বই পড়াতেন বলে ইংলিশম্যানের প্রবন্ধলেখক এবং প্যারীচাঁদ মিত্র বলেছেন, ডুগালড ষ্টুয়ার্ট, ডকটর রীড, হিউম, টমাস ব্রাউন, অ্যাডাম স্মিথ, বেনথাম প্রভৃতির সেই সব তত্ত্ব বা দর্শন তাঁর কলেজের পড়ানোর মধ্যে পড়ত না। তাঁর ছাত্ররা এ-সব কখন তাঁর কাছে পড়েছে? ১৮২৮-এ ডিরোজিওর বাড়িতে এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন নামে যে বিতর্কসভা স্থাপিত হয়, সেখানে কলেজের বাইরে ছাত্রদের সঙ্গে ডিরোজিওর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।[৪১] সেই সব আলোচনা-সভাতেই এসব তত্ত্ব-দর্শন আলোচিত হয়েছে এবং হিন্দু কলেজের গতানুগতিক পাঠ্যধারার মধ্যে নতুন চিন্তাপ্রবাহ এসে ছাত্রদের উদবুদ্ধ করেছে। এই এসোসিয়েশন পরে মানিকতলায় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে ডেভিড হেয়ার, কর্নেল বীটসন, স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, ডেপুটি গভর্ণর ডবলিউ ডবলিউ বার্ড, বিশপস কলেজের অধ্যক্ষ ডকটর মিল প্রভৃতি উপস্থিত থাকতেন। নীতি-ধর্ম, হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের অন্তঃসারশূন্যতা প্রভৃতি অনেক কিছুই এখানে যুক্তি সহকারে আলোচিত হত। এসোসিয়েশন যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করল, তার ফলে কলকাতার নানা জায়গাতেই অনুরূপ সভা স্থাপিত হল। ১৮৩০-এর মধ্যেই শুধু হিন্দু কলেজ নয়, রামমোহন রায়ের অ্যাংলো হিন্দু স্কুল এবং কলকাতা স্কুল সোসাইটির ইংরেজি স্কুলগুলি সাতটি সভা স্থাপন করেছিল।[৪২] ইংরেজি ভাষায় সভার কার্য পরিচালিত হত। এক একটি সভার সভ্যসংখ্যা ছিল সতেরো থেকে পঞ্চাশ। ডিরোজিও অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের সভাপতি হলেও এই সমস্ত সভাতেই উপস্থিত থাকতেন। ক্রমে ছাত্র নয়, এমন ব্যক্তিরাও এরকম সভা গড়ে তুলতে লাগল। এসব সভায় অবশ্য বাংলায় আলোচনা হত। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও পটলডাঙ্গা স্কুলে সন্ধ্যাবেলায় মেটাফিজিকস-এর ক্লাশ নিতে লাগলেন। এতে প্রায় দেড়শ' জন উপস্থিত থাকতেন।[৪৩]

কলকাতায় নব্যবঙ্গের আন্দোলন নামে যে বিখ্যাত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সে ছিল ডিরোজিও-অনুপ্রাণিত সভাসমিতির ফল, যদিও হিন্দু কলেজের মধ্যে

সেরকম সভা কিংবা উত্তেজনার পরিপোষক শিক্ষাদর্শ ছিল না। হিন্দু কলেজের পরীক্ষার যেসব বিবরণ পাওয়া যায়, তা অবশ্যই ইংরাজি শিক্ষার অগ্রগতির সূচক। কাশীপ্রসাদ ঘোষ জেমস মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে-সমালোচনা করেছিলেন তার বিস্তৃত উল্লেখ প্রসঙ্গে ক্যালকাটা গেজেট লিখেছিল—

> When Mr. Mill wrote his History of British India, he very probably, never suspected that the pages of his work would be critically examined by a Hindoo, distinguished for his acquirements in the English language, and familiar with the classical and recondite learning of the West...For this sudden revolution, in the intellectual qualities of the natives of this country we are mainly indebted to the establishment of the Anglo-Hindoo College; and the specimens we have already given of the progress of the pupils must have shown how easy the task is to make them profit by liberal instruction, when steadily and zealously persued.[৪৪]

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষার ফল সকলেরই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু এর কোনো কুফল হচ্ছে কিংবা এই কলেজের শিক্ষানীতির জন্যই ধর্ম বিপন্ন হয়েছে—এমন অভিমত অনেক দিন পর্যন্ত তেমন গুরুত্ব পেয়েছিল বলে মনে হয় না। ১৮৩০-এর আগে পত্রপত্রিকাগুলিতে নব্যবঙ্গের আন্দোলন বা 'উচ্ছৃঙ্খলতা' সম্বন্ধে তেমন কোনো সংবাদ দেখতে পাই না। ১৮৩০-এর ১৩ই মার্চ সমাচারদর্পণ পত্রিকাতে 'জাবনিক রুটি ভক্ষন' এই শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়।[৪৫] ঘটনাটিকে 'ক্ষুদ্র' বলা হয়েছে, কিন্তু তাই নিয়ে 'সমাচারচন্দ্রিকা' খুব সোরগোল করে।—

'আবশ্যক সম্বাদের অভাবে যে এক ক্ষুদ্র ঘটনাতে চন্দ্রিকাকার ও কৌমুদীকারের মধ্যে বৃহদ্ঘটনাঘটিত দুই কাব্য উত্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম বিশেষতঃ জ্ঞাত হওয়া গেল যে হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র মুসলমান রুটিওয়ালার দোকানের নিকট দিয়া গমন করত ঐ দোকান-ঘরে প্রবেশপূর্বক এক বিস্কুট ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন।'

নব্যবঙ্গের আন্দোলন বস্তুত হিন্দু কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির প্রত্যক্ষ ফল নয়। এ ছিল অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েন এবং ডিরোজিওর অনুপ্রেরণার ফল। অবশ্য কলেজের বাইরে এসোসিয়েশনের সভাতে হিন্দু কলেজের ইংরাজিতে অভ্যস্ত ছাত্ররাই যোগ দিয়েছে। সেই হিসাবে হিন্দু কলেজ এই আন্দোলনের সহায়ক

ছিল। ডিরোজিওকে নিয়ে কলেজের কর্তৃপক্ষসভায় আলোচনা হল, তখন কেউ তাঁকে প্রত্যক্ষত দায়ী করেন নি অন্তত কলেজের ভিতরে তাঁর আচরণ থেকে দায়ী করার কারণ খুঁজে পান নি। ২০এ এপ্রিল ১৮৩১-এর সভার বিবরণ[৪৬]—

Whether the managers had any just grounds to conclude that the moral and religious tenets of Mr. Derozio as far as ascertainable from the effects they have produced upon his scholars are such as to render him an improper person to be entrusted with the education of youth.
Baboo Chundra Coomar stated that he knew nothing of the ill effects of Mr. Derozio's instructions except from report.
Mr. Wilson stated that he had never observed any ill effects from them and that he considered Mr. Derozio to be a teacher of superior ability.
Baboo Rada Canto Deb stated that he considered [p37] Mr. Derozio a very improper person to be entrusted with the education of youth.
Baboo Russomoy Dutt stated that he knew nothing to Mr. Derozio's prejudice except from report.
Baboo Prosonna Coomar Tagore acquitted Mr. Derozio of all blame for want of proof to his disadvantage.
Baboo Radha Madub Banerjea believed him to be an improper person from the report he heard.
Baboo Ram Comul Sen concurred with Baboo Rada Canto Deb in considering him a very improper person as the teacher of youth.
Baboo Srikishin Sinh was firmly convinced that he was far from being an improper person and Mr. Hare was of opinion that Mr. Derozio was a highly competent teacher and that his instructions have always been most beneficial.
The majority of the managers being unable [38] from their own knoweedge to pronounce upon Mr. Derozio's disqualifications as a teacher the Committee proceeded to the consideration of the negative question.

ম্যানেজারসভার অধিকাংশ সভ্যই ডিরোজিও সম্বন্ধে অনুপযুক্ততার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পান নি। তাঁদের বক্তব্য নিশ্চয়ই কলেজের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা

বিষয়েই। সংবাদপ্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে কলেজ-কর্তৃপক্ষ যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তার পশ্চাৎপট হিসাবে এই বিবরণটি মনে রাখা দরকার।

পটলডাঙ্গা স্কুলঘরে ডিরোজিও মেটাফিজিকস-এর ক্লাশ নিচ্ছিলেন সেখানে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা উপস্থিত থাকত। সেখানে তর্ক ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারার সূত্রপাত হল। পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলকাতায় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এই চিন্তাবিপ্লব লক্ষ্য করেছিলেন।[৪৭] এতে তিনি খুশি হয়েছিলেন, শুধু মনে হয়েছিল এদের এই ধর্মবোধহীন চিন্তাধারাকে ধর্মের পথে নিয়ে যাওয়া দরকার। হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু ধর্মশিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। অতএব এই চিন্তার স্বাধীনতার আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে ডাফ এবং তাঁর শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য পাদ্রী কয়েকটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন। বক্তৃতাগুলি এই—

১. The External and Internal Evidences of Natural and Revealed Religion. —ডাক্তার ডাফ
২. The proofs, derived from profane history, of the fulfilment of Scripture Prophecy, as a source of evidence, which, it was supposed, the attainments and previous studies of the youngmen would prepare them to appreciate. অ্যাডাম
৩. The facts recorded in the four Gospels, as exhibiting the moral character of the Founder of Christianity and the genius and temper of His religion. —হিল
৪. The doctrines of Revelation. —ডিয়েলট্রি

ডাক্তার ডাফের বাড়ি হিন্দু কলেজের কাছে। তাঁরই বাড়ির একতলায় এই বক্তৃতার ব্যবস্থা হল। প্রথমে বক্তৃতা তারপরে প্রশ্নোত্তর—এই পদ্ধতিতেই আলোচনা পরিচালিত হবে স্থির হল। এই বক্তৃতামালার ভূমিকাস্বরূপ একটি বক্তৃতা দিলেন হিল ১৮৩০-এর আগস্ট মাসে। ডাফ লিখছেন, এই বক্তৃতার সংবাদ দেশীয় সমাজে আগুনের মতো ছড়িয়ে গেল। সমস্ত শহরেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। সে-চাঞ্চল্যের যথাযথ বর্ণনা দেওয়া কঠিন। এমন একটা ধারনা তৈরি হল, পাদ্রীরা ধর্মান্তরণের উদ্যোগ করছেন মাত্র। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন কলেজ-কর্তৃপক্ষের কাছে এই নিয়ে নালিশও করেন। তার মধ্যে য়ুরোপীয়ও কেউ কেউ ছিলেন। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা প্রকাশ

করে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচারচন্দ্রিকা' পত্রিকা। ১৮৩১-এর ২২-এ জানুয়ারি 'সমাচারদর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে বলা হয়েছে[৪৮] —

'হিন্দুকালেজ নামক যে বিদ্যালয় কএক বৎসরাবধি এদেশে স্থাপিত হওয়াতে সর্বসাধারণের যে উপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাঁহারা যোত্রহীন তাঁহারদিগের সন্তানদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে যে মহোপকার হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা ভদ্রলোকের অবিদিত কি আছে কিন্তু চন্দ্রিকাকার তদ্বিষয়ে নিতান্ত অসুখী, তিনি যে কালেজস্থ অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগের অল্প ২ দোষে তাহারদিগের প্রতি নানা দোষারোপ করিয়া চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতেই ব্যক্ত হইতেছে যে তিনি উক্ত কালেজের বিপক্ষ...'

'সমাচারচন্দ্রিকা' পত্রিকাতেই প্রকাশিত একটি চিঠিতে ইতিপূর্বে হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্রের অভিভাবকের পুত্রের ইংরেজিআনায় বিরক্ত হয়ে পুত্রকে কলেজ ছাড়িয়ে দেওয়ার কথা বিজ্ঞাপিত করেন।[৪৯]

সত্য সত্যই কলেজ থেকে অনেক অভিভাবকই তাদের ছেলেদের নিয়ে আসছিলেন। হিন্দু কলেজের পরিচালকসভার পূর্বে উদ্ধৃত কার্যবিবরণেই (২৩ এপ্রিল, ১৮৩১) জানা যায়[৫০] বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের পঁচিশটি ছাত্রকে কলেজ ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায় একশ ষাটটি বালক অনুপস্থিত থাকছে, যাদের কেউ কেউ হয়তো অসুস্থ, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের ব্যবস্থা যতদিন না হচ্ছে, ততদিন অনেকেই কলেজে যোগ দিচ্ছে না।

১৮৩৮-এ বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশিত হয়, চিঠিখানি দি ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার পত্রিকার একটি মন্তব্যের প্রতিবাদে লিখিত। সেই পত্র থেকে এ সময়ের খ্রীষ্টধর্মান্তরিতদের একটি হিসাব পাওয়া যায়।[৫১]

The Calcutta Press, the Christian Observer and
the Hindu College

To
The Editor etc.

Sir,
Although I am one of those that animadvert in the strongest terms on the spirit of oppostion which the managers of the Hindu College have so intolerently evinced against the erection of the new Church, yet, as I have always defended this institution upon sober principles from the attacks of

certain ill advised and shortsighted Christians, I cannot help remarking upon an article in the last number of *Christian Observer*, where amongst other things, the writer makes the following observations regarding one of your leaders a few weeks ago. It is moreover asserted that there have been more converts from the College and and from the Government schools than from Missionary Schools and labours. We confess we have some knowledge of missions and their converts ; but that with one or two exceptions we know of no converts to the Chriastian faiths from the College or Government schools : * * * We ask where are these *many more* converts from the Government schools than from Mission seminaries. We suppose, they are basking in utopia, for in Bengal they are assuredly not. *Christian Observer* July 1838, pages 401 and 402.

I understand you to mean that the Hindu College and its kindred schools have produced more converts than Missionary schools—without reference to Missionary labours in other respects. That the exertions of Missionaries in other ways have been crowned with a very large number of converts who at least profess whether they adore or not, the doctrine or God our Saviour, no one could have the hardihood to deny. But if the question be whether the Government schools or the Missionary educational seminaries have as yet sent more Christians into the world the balance will certainly be favourable to the former. For not withstanding the ignorance of the Christan Observer of any converts from Government schools "with the exception of one or two" I can vindicate the truth of your position by showing that the Hindu College and kindred schools have produced more converts than such Missionary Seminaries as use education as an instrument of conver- sion. I accordingly annex a list of converts that have come out of different schools where instructions are given in English language. I beg you to ask the *Christian Observer* to correct me if I have inadvertently passed over any con-verts from Missionary Schools I have reasons for hoping that I have not done so.

CONVERTS

From the Hindu College and Kindred Institutions

1. The Rev. Krishna Mohan Banerjee, located in Calcutta *from the Hindu College*
2. The lamented Baboo Mohesh Chunder Ghosh—from ditto
3. Baboo Gopeenath Nundy—located at Futtehpore—from Mr. Hare's school
4. Baboo KallyCoomarGhose at Burdwan from ditto
5. Baboo Russic Chunder Paulit at Calcutta from ditto
6. Baboo Chundy Churn Addy at Bishop's College, studying for orders from ditto
7. Baboo Jaygopaul Dutt at ditto from ditto
8. Baboo Gopaul Chunder Mitter at ditto from ditto
9. Baboo Dwarkanath Banerjee at ditto from ditto
10. Baboo Banymadhab Majoomdar at ditto from the Hindu College

From Missionary Institutions

1. Baboo Aunundo Chunder Majoomdur gone to England from Genaral Assembly's schools
2. Baboo Dwarkanath Ghosh at Calcutta from ditto
3. Baboo Brijnath Ghose at Bishop's College from Mirzapore school
4. Baboo Gunganarayen Seal at Howrah from the Baptist Missionary school
5. Baboo Modhoosoodhun Sale at Krishnaghar from General Assembly's school
6. Baboo Jogatchunder Mookerjee, unheard of and missing from long time from the Burdwan school.

My object being only to give you a statement of facts I abstain from any further remarks.

VERITAS

ডাফ তাঁর বক্তৃতা দেবার জন্যই কলকাতার হিন্দুসমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু তিনিও বস্তুত অনুকূল সময়ের সুযোগ নিচ্ছিলেন মাত্র। এই অনুকূলতা সৃষ্টি করে তুলছিল ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের সভাগুলি। অতএব ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের সেপটেমবর মাসে কলেজ-কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের প্রতি এক নির্দেশ[৫২] দিলেন :

> The Managers of the Anglo Indian College having heard that several of the Students are in the habit of attending Societies at which Political and Religious discussions are held, think it necessary to announce their strong disapprobation on the practice and to prohibit its continuance. Any students being present at such a Society after the promulgation of this order, will incur their strong displeasure.

এই নির্দেশের সমালোচনায় ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি মুখর হয়ে উঠল। ক্যালকাটা গেজেটের সম্পাদক লিখলেন, কলেজের বাইরে ছেলেরা কি বলবে বা করবে সে বিষয়ে কলেজকর্তৃপক্ষের বলবার অধিকার নেই। এই নিয়ে কাগজের লেখালেখি কিছুদিন পর কমল বটে কিন্তু ডাফ লিখেছেন যে এর ফলে কলকাতায় বহু সভাসমিতি গড়ে উঠল যেখানে নানা বিষয়ের আলোচনার আগ্রহ দেখা দিল। ডাফ নিজে এ রকম কয়েকটি সভায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় আবেগ ও উদ্দীপনা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। আলোচনা যদি ইতিহাসের বিষয় হত রবার্টসন্ এবং গিবন উদ্‌ধৃত হতেন, যদি রাজনীতি বিষয়ক হত তবে অ্যাডাম স্মিথ এবং জেরেমি বেনথাম, যদি বিজ্ঞান বিষয়ক হত তবে নিউটন এবং ডেভি, ধর্মবিষয়ক হলে হিউম এবং টমাস পেন; দর্শন বিষয়ক হলে লক, রীড, ডুগালড স্টুয়ার্ট এবং ব্রাউন। বার্নসের

> For a' that, and a' that
> Its comin' yet, for a' that,
> That man to man, the world o'er
> Shall brothers be, for a' that.

এই কাব্যপঙক্তির আবৃত্তি শুনে স্কচ ডাফ স্বভাবতই আনন্দিত হতেন।

২

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইতিপূর্বেই 'নববিশিষ্ট শিষ্টগণসভা' নামে এক সভা স্থাপন করেছিলেন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে। তার বিজ্ঞাপনে স্পষ্টই বলা হয়েছিল 'ধর্ম্মদ্বেষী ও নাস্তিক মতাবলম্বী মান্যান্যান্য বিবেচনাশূন্য ও পরজাতীয় ভাষায় নৈপুণ্যত্ব প্রযুক্ত স্বকীয় ভাষাদ্বেষী এই সকল জনেরা অস্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না।' তখন 'ধর্মদ্বেষী' বলতে বোঝাত ধর্মসভার বিরোধী মতাবলম্বী উদারপন্থী ব্যক্তিকে। সুতরাং ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ (২৮ জানুয়ারি ১৮৩১) সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকার প্রকাশকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর মনোভাব কি ছিল সহজেই অনুমেয়। ঠিক এই সময়েই কলকাতায় ডিরোজিও এবং নব্যব্যঙ্গের আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠছে এবং হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সম্বন্ধে নানা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। দুঃখের বিষয়, এই সময়ের সংবাদপ্রভাকরের ফাইল পাওয়া যায় না। সে-জন্য এই আন্দোলন সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের মতামতের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়ার উপায় নেই। তবে সৌভাগ্যক্রমে তাঁর মনোভাব পরোক্ষভাবে জানা যায় অন্য পত্রিকার উদ্‌ধৃতি এবং মন্তব্যের সাহায্যে। ১৮৩১-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি সমাচার-দর্পণ পত্রিকায় 'বাঙ্গালা সমাচার পত্রের মর্ম্ম'—এই শিরোনামায় একটি খবর বের হয়।[৫৩]—

'পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকর নামক সমাচারপত্র এতন্নগরে প্রকাশ পাইবার কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল সংপ্রতি ১৬ মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার হইয়াছে তদবলোকনে বোধ হইতেছে যে তৎপ্রকাশ হিন্দু ধর্মনাশেচ্ছুকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন যেহেতুক প্রভাকরপ্রকাশকের যুক্তি উক্তিদ্বারা শক্তি ভক্তি ব্যক্ত হইয়াছে সাধু মহাশয়েরা এ সম্বাদপত্রের সম্বাদ শুনিলে ঔদাস্য না করিয়া অবশ্য সন্তুষ্ট হইবেন।'

সংবাদপ্রভাকর প্রথম বার প্রকাশিত হয়ে মাত্র একবৎসর চার মাস চলেছে। এই সময়ের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মসভাবিরোধীদের এবং সহজেই অনুমান করা যায় —নব্যবঙ্গদের যথেষ্ট কটূক্তি ও সমালোচনা করেছিলেন।[৫৪] ১৮৩২, ২রা জুনের সমাচারদর্পণে উদ্‌ধৃত সমাচারচন্দ্রিকার একটি খবর[৫৫] বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করতে হয়, যে গুলি বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক।

'প্রভাকরের অস্তাচল চূড়াবলম্বন।—আমরা খেদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরে সম্বাদপ্রভাকর নামক এক সমাচারপত্র গত ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘ সর্জন হইয়া প্রখরতর কর প্রকাশ পূর্বক সর্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু

নন্দকুমার ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাহার বিধাতা শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রকাশক ছিলেন প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস পর্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম পক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্মসভাধ্যক্ষদিগরে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারিমাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিয়াছেন আর তাঁহার দর্শন পাওয়া ভার।··· সং চং।'

এই সংবাদ অনুযায়ী ১২৩৭-এর মাঘ থেকে ১২৩৮-এর মাঘ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিত সংবাদপ্রভাকরেব সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। মাঘ মাসের পর তিনি সম্পাদনা ত্যাগ করেন। তারপরেও চার মাস পত্রিকা চলেছিল কিন্তু কার সম্পাদনায়, ঠিক জানা যায় না।

এই এক বৎসব ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত সংবাদপ্রভাকরে নবশিক্ষার আন্দোলনের বিরুদ্ধে হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং ডিরোজিওব সমালোচনা করে বস্তুত ধর্মসভার দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ১৮৩২এর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত তিনি যতদিন সম্পাদক ছিলেন ততদিন তিনি 'বিলক্ষণরূপে ধর্ম পক্ষ', কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত ছেড়ে গেলে সংবাদপ্রভাকরেব মতামতের উগ্রতা কমে আসে এবং তখন 'ধর্মসভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ'-ও কবা হয়েছে। সুতরাং অনুমান করা যায় ঈশ্বর গুপ্তের নব্য-আন্দোলনেব সম্বন্ধে মতামত যথেষ্ট কঠোর ছিল। ইতিমধ্যে ডিরোজিওর প্রভাব ছাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকারক হচ্ছে, এই অভিযোগে ১৮৩১-এর পঁচিশে এপ্রিল তাঁকে পদত্যাগ করানো হল। ডিরোজিওর বিরুদ্ধে সমসাময়িক পত্রিকায় যেসব লেখা হয়েছিল, সম্ভবত ঈশ্বর গুপ্তের লেখাও তাদের অন্যতম। তিনি ঠিক কি লিখেছিলেন জানা যায় না, তবে তাঁর লেখার উল্লেখ এবং তার প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায়।

হিন্দু কলেজের পরিচালকসভার কার্যবিবরণীতে কলেজের সেক্রেটারী লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়েব একটি পত্রের নকলে দেখা যায় ১৫ই এপ্রিলের সংবাদপ্রভাকরে হিন্দু কলেজের শিক্ষকের সমালোচনা করে একটি পত্র প্রকাশিত হয়।[৫৬]

Read the following correspondence with the Editor of the Sumbad Probhakar.

To

The Proprietor of Sumbad Probhakar

Sir,

Having observed a letter in your paper of the 15th April No 12 reflecting in very unbecoming language upon the character of the teachers of the Hindoo College, I have to request your informing me of the writer's name that legal measures may be adopted for his punishment.

I am

Hindoo College
the 19th April. 1831

Lyckynaraian Mookerjee
Secy. H. College

এই পত্র পেয়ে ঈশ্বর গুপ্ত যে পত্র দেন তার নকলও সেই সঙ্গে দেওয়া আছে।[৫৭]

To

The Secretary of the Hindoo College

Sir,

In acknowledging the receipt of your letter dated 19th instant requesting me to furnish you with the name of the author of a certain article appeared in the 12th No. of the Prabhakar I am authorized in the name of the writer to inform you that he neither had the least intention nor did he mean by the language of his letters to bring the College institution or the characters of its teachers and members as a body into hatred and contempt or ridicule. You will under this consideration see how far I should be justified as an Editor of a Public journal to meet your calls as Secretary of the College when the writer positively denys any intention to have offered any unbecoming language either towards the institution or its members as a body which assertion he denys will be manifested by referring to the article in question.

I am etc

23rd April 1831

Isher Chunder Gopto
Editor Proprietor of Probhakar

ঈশ্বর গুপ্তের এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে পরিচালকসভা এই চিঠি দিলেন—
Resolved that following letter be written to the Editor.

To
The Editor of the Sumbad Probhakar

Sir,

I am desired by the Managing Committee of the Hindoo College to inform you that having laid before them your letter of the 23rd instant it has not been considered as altogether satisfactory. They expect therefore that in your next number you will express your regret for having admitted into your paper a letter containing such improper and unfounded imputations against the teachers of the Hindoo College.

ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে হিন্দু কলেজকর্তৃপক্ষের এই বাদবিতর্কে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচারচন্দ্রিকা ঈশ্বর গুপ্তের পক্ষ সমর্থন করে ২৬এ এপ্রিল ১৮৩১-এর সংখ্যায় প্রবন্ধ প্রকাশ করে।[৫৮] তাতেই প্রকাশ পায় প্রায় সাড়ে চারশ ছাত্রের মধ্যে প্রায় দু শ' কলেজে আসা বন্ধ করেছে। জনরব, গোপীমোহন দেব, হরিমোহন ঠাকুর, নবীনকৃষ্ণ সিংহ, আশুতোষ দেব প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বালকদের পাঠানো বন্ধ করেছেন।

স্মরণীয় এই যে ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি যে-সভায় আলোচিত হচ্ছিল, সেই সভাতেই ডিরোজিওর কর্মাবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সংবাদ গোপন ছিল না। হয়তো সমালোচনার ফল ফলতে দেখে ঈশ্বর গুপ্ত কলেজকর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করে সংবাদপত্রে ত্রুটি স্বীকার করেন নি। ১৮৩১-এর ১১ই জুনের পরিচালকসভার অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৫৯]

Resolved that measures be adopted for proceeding against the publisher and Editor of Probhakor legally and Mr. Hare be requested accordingly to communicate with Mr. Stacy upon the subject and empower him to write to the proper parties.

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল অনুমান করা যায়। কেন না ঈশ্বর গুপ্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি লিখেছিলেন। ১৮৩১-এর ২রা জুলাইয়ের অধিবেশনের বিবরণ[৬০]—

No 13. Read a letter from Isher Chundro Goopto the Editor of the Probhakor.
Resolved that the letter be recorded but that it be still expected that he shall insert in his paper a further apology to be written for him.

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চাইলেও প্রকাশ্যে কাগজে ত্রুটি স্বীকার করতে চান নি বলেই মনে হয়। ফলে ৩০-এ জুলাইব অধিবেশনে দেখি[৬১]

Resolved that the papers relative to the editor of Probhakar Isher Chundro Goopto be sent to Baboo Chundro Coomar Tagore who promised to get the matter settled and has the authority of prosecuting him if necessary without further reference

চন্দ্রকুমার ঠাকুর তখন হিন্দু কলেজেব অন্যতম গবর্ণর। তিনি গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র এবং ঈশ্বর গুপ্তের পৃষ্ঠপোষক যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠতাত। হয়তো তিনিই মধ্যস্থ হয়ে এই ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটান। ঈশ্বর গুপ্ত যে ১৮৩২-এর জানুয়ারি মাসে সংবাদপ্রভাকর-সম্পাদন ত্যাগ করেন, সেটা এই ব্যাপারেরই জের কিনা বলা শক্ত। কলেজকর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাদপ্রতিবাদ চরমে উঠলেও ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর উগ্র মত ত্যাগ করেন নি। ১৪ই মে ১৮৩১-এর সমাচার দর্পণে সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত একটি চিঠি উদ্ধৃত হয়।[৬২] তাতে জনৈক ব্যক্তি জানাচ্ছেন যে তাঁর ছেলে হিন্দু কলেজে লেখাপডা শিখে ইংরেজি আচার শিখেছে এবং কালিঘাটের কালীকে প্রণাম না করে বলছে 'গুড্ মর্ণিং ম্যডম্'। ১৬ই জুলাইর সমাচারদর্পণে প্রভাকরসম্পাদকের নিজস্ব রচনাই উদ্ধৃত হয়েছে[৬৩] হিন্দু কলেজের মেম্বারদের তিনি নিবেদন করেছেন 'হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতা পায় সবচুল মাথায় থালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি পরিবর্তে মাথা কামায় ফিরিঙ্গি জুতা পায় না দিতে পায়…।'

ডিরোজিও কলেজ থেকে চলে গেলেও নব্যবঙ্গের আন্দোলন থেমে থাকে নি। ডিরোজিও ইস্ট ইন্ডিয়ান নামক সংবাদপত্র এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এনকোয়ারার পত্রিকা বের করলেন।[৬৪] ১৮৩১-র ১৩ জুন সার এডওয়ার্ড রায়ান বেনটিঙ্ককে একটি পত্রে জানান কৃষ্ণমোহন টাউন হলে জন রিকেটের সম্বর্ধনায়

অ্যাংলো ইনডিয়ান-আয়োজিত একটি ভোজসভায় যোগদানের ইচ্ছা জানিয়ে হিন্দুসমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।[৬৫] রাজা রাধাকান্ত দেব কলকাতা স্কুল সোসাইটির সেক্রেটারি হিসাবে সার এডওয়ার্ড রায়ানকে অনুরোধও করেন তিনি যেন কৃষ্ণমোহনকে শিক্ষক-পদ থেকে বরখাস্ত করেন।[৬৬] ২৩-এ আগস্ট কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে মাংসাহারের ঘটনা ঘটল, যে জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করলেন।[৬৭] কৃষ্ণমোহন এবং মাধবচন্দ্র মল্লিক দুইজনেই প্রকাশ্যে হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষ উগ্রভাবেই প্রকাশ করেছিলেন। মাংসাহারের ঘটনার পর কৃষ্ণমোহন বিতাড়িত হয়ে *The Persecuted* নামে একটি নাটক রচনা করেন। নাটকটি তিনি উৎসর্গ করেন 'Hindoo Youths'-কে, উৎসর্গের তারিখ ১২ই নবেম্বর ১৮৩১। ভূমিকায় তিনি বলেন,

> The Author's purpose has been to compute its excellence by measuring the effects it will produce upon the minds of the rising generation. The inconsistencies and the blackness of the influential members of the Hindoo community have been depicted before their eyes. They will now clearly perceive the viles and tricks of the Brahmins and thereby be able to guard themselves against them...

এই নাটকটির একটি সংক্ষিপ্ত বিষয়-পরিচয় দেওয়া দরকার। নাটকে পাঁচটি অঙ্ক। চরিত্র অনেকগুলি। কামদেব, দেবনাথ এবং রামলোচন সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল হিন্দু ভদ্রলোক। লালচাঁদ একটি পত্রিকা-সম্পাদক (Proprietor), মহাদেব; তর্কালংকার এবং বিদ্যাবাগীশ দুই কপটাচারী ব্রাহ্মণ ও বাণীলাল, শ্যামনাথ, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রকুমার, ভৈরব, কেদারমোহন, সরলচাঁদ, হরিচাঁদ, রামমোহন— এরা হিন্দুযুবক। দেবনাথের পুত্র দীননাথ। এই নাটক মূলত কৃষ্ণমোহনের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হওয়ার ঘটনা অবলম্বনে কল্পিত।

পত্রিকা-সম্পাদক লালচাঁদের ভূমিকাটিই বর্তমান প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে লালচাঁদের উক্তি But care must positively be taken that he imbibes not those dry and useless nonsense about TRUTH—I am sure Truth would have ruined me if I had conformed to it. অনাচারীদের বিরুদ্ধে লালচাঁদ পত্রিকায় নির্বিচারে সত্য-মিথ্যা লিখতে নির্দেশ দিয়েছে। তৃতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে লালচাঁদ বলছে, Let this be a resolution of our *Subha* not to allow children know—that

destroys of all religion— science. Do not let your children go to school.

আমরা দেখেছি, সে-সময় হিন্দু কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে আন্দোলন বিশেষ ভাবে করেছে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাযের সমাচারচন্দ্রিকা এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপ্রভাকর। এই নাটকের পত্রিকা-সম্পাদক লালচাঁদ এঁদেরই প্রতিনিধি। অন্তত ঈশ্বর গুপ্ত মনে করেছিলেন এতে তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছে। তিনি তাঁর পত্রিকায় অত্যন্ত হীন ভাষায় কৃষ্ণমোহনকে আক্রমণ করলেন।[৬৮]—

'প্রভাকরসম্পাদক কর্তৃক এতদ্দেশীয় লোকেরদের তাবদ্বিষয়ক সপ্তাহীয় রচনা। শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তি মহাশয়ের চট্টগেঁয়ে যে অপহারক মেং বাবু কৃষ্ণা ক্রিঙ্গি হিন্দুইউথ নামক একখানি ক্ষুদ্র দর্গার পুষ্য পুত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন যেহেতুক তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ইনকোয়েরর পত্রেই বা এ পর্য্যন্ত কি করিলেন যে এইক্ষণে ঐ বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্মের হানি করিবেক ভাল ২ল বন্দা জেনো তাহার সাধ্যমতে কশুর করে না কিন্তু আমারদিগের বোধ হইতেছে যে ঐ বাচ্ছা পত্র বন্দ বা পার অভিমতে সৃজন হয নাই এ হায়াহীন ড্রজো ভায়ার কর্ম কেননা ড্রজো ভায়া ইস্ট ইণ্ডিয়ান ও ইনকোয়েরর পত্র দ্বারা কিছু করিতে না পারিয়া এক নেংটে ইঁদুর বাহাদুরকে প্রেরণ করিযাছেন যেমন মহীরাবণের ব্যাটা অহিরাবণ কি হে ফিরিঙ্গি সাহেব ড্রজো ভায়া তুমি হাজার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া দর্গার থামে তাল ঠুকিয়া দলবল সঙ্গে কবে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে এসো কিন্তু কালা মেন বাঙ্গালিদিগের ফতে করিতে পারিবে না অতএব হে ভায়া সামাল সামাল তোমার জাঁকজমকরূপ কুবৃতি টুপি কেডে নিয়ে ফুবৃতি ভেঙ্গে দিবে যেহেতু এ দলেও প্রধান যোদ্ধা শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তী।…'

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঈশ্বর গুপ্ত পরবর্তীকালেও ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করেছেন। কারণ খ্রীষ্টধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আন্দোলন করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত তখন তাতে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ঈশ্বর গুপ্ত রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করলেও স্বজাতিপ্রীতি-স্বধর্মপ্রীতি চিরকালই অটুট ছিল। নব্যবঙ্গ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম স্বধর্মপ্রীতিরই রক্ষণশীল মনোভাবেরই প্রকাশ। এই গোঁড়ামির মনোভাবটি তাঁর হয়তো পরে ছিল না। নব্যবঙ্গের অন্যতম মাধবচন্দ্র মল্লিকের সঙ্গেও তাঁর একবার বিতণ্ডা উপস্থিত হয়েছিল ১৮৩১-

এর অকটোবর মাসে। স্বধর্মপ্রীতির অত্যুৎসাহে তিনি সম্ভবত একবার অসত্যের আশ্রয়ও নিয়েছিলেন। ১৮৩১-এর জুন মাসে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র রাধানাথ পাল 'হিন্দু ফ্রি স্কুল' নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। মাধবচন্দ্র মল্লিক ঐ স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রভাকর জানায় গঙ্গাচরণ সেন, রাধানাথ পাল এবং মাধবচন্দ্র মল্লিক স্কুলেব একটি সভায় 'প্রস্তাব করিলেন যে, যে কএকজন মেম্বর হিন্দুধর্মের দ্বোষী ও দুঃসাহসি কর্ম করিয়া ধর্ম নষ্ট করে তাহারদিগের সহিত আমরা কোন বিষয়ের অংশ রাখিব না· '। প্রভাকরের এই সংবাদের প্রতিবাদে মাধবচন্দ্র মল্লিক ৮ই অকটোবর একটি কঠোর পত্র প্রকাশ করেন সমাচারদর্পণে।[৬৯] এই দীর্ঘ পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিকের একটি উক্তি সুপরিচিত হয়েছে।

'··অতএব হিন্দুধর্মের রক্ষার্থ উপায় যে কবিতেছেন ইহা পশ্বাচারি মতের মুরুব্বি প্রভাকর-সম্পাদক কি নিমিত্ত কহিতেছেন আমরা যে, তাঁহার মত অর্থাৎ হিন্দুধর্মের সপক্ষ ইহা তাঁহার সম্বাদপত্রে তুরীবাদ্যের ন্যায় প্রকাশ করাতে কি তিনি আমারদিগকে মিঞা দর্শাইতেছেন যদি এমত তাঁহার ভরসা থাকে তবে তাহা নিতান্ত বিফল যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্রেরা যদ্রূপ হিন্দুধর্ম ঘৃণা করি তদ্রূপ আমাদের অপর কোন ঘৃণ্য বস্তু নাই।'

ঈশ্বর গুপ্ত যতদিন প্রথম পর্যায়ে প্রভাকরের সম্পাদক ছিলেন, ততদিন তিনি হিন্দু কলেজের নানা সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু ২১-এ জানুয়ারি সমাচার দর্পণে উদ্‌ধৃত সংবাদ তিমিরনাশকের একটি প্রবন্ধ 'কলিকাতা রাজধানীতে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের উৎপত্তি'তে সংবাদপ্রভাকরের বিবরণে মনে হয় সম্পাদকত্ব ত্যাগ করবার প্রাক্‌কালে তাঁর মতামতে উগ্রতা কিছু হ্রাস পেয়েছিল। সমাচার চন্দ্রিকার খবরে বোঝা যায় ঈশ্বর গুপ্ত ছেড়ে দেওয়ার পরে প্রভাকর ধর্মসভা-বিরোধী হয়েছিল। কিন্তু এই খবরে দেখা যায় ঈশ্বর গুপ্তের নিজের মতামতেই কিছু পরিবর্তন এসেছিল—

'সন ১২৩৭ সালের ২৬ মাঘে প্রভাকর পত্র উদয় হয় তাহার কিরণে বুঝি জগৎ আলোক হইবেক এমনি প্রখর কিরণ প্রকাশ হইল তাহার কারণ কেবল ধর্মপক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল। নচেৎ তাহাতে মুন্সীয়ানা বা বিদ্যাবুদ্ধি কোন কথাই প্রকাশ পায় নাই কেবল নাস্তিকদিগকে অনেক কটু কহিয়াছিল তাহাতে হিন্দু-সমাজে মান্য হইল কেননা ভদ্রলোক নাস্তিকের সঙ্গে বিবাদ করিতে কেহ বাসনা করেন না সুতরাং প্রভাকব অকুতোভয়ে অনেক পচাল পাড়িয়াছিল এইক্ষণে

তিনি ধর্মদ্বেষী হইয়াছেন যদি তাহার তাদৃশ প্রবলতা এখন থাকে তবে জানি বৈদ্যপোর ক্ষমতা অথবা তাহার মুরুব্বির যোগ্যতা।'

এই পরিবর্তনের কারণ কি সঠিক বলা যায় না; তবে অনুমান করা যায় হয়তো হিন্দু কলেজের সঙ্গে তাঁর যে বিবাদ হয়েছিল, এটা তারই ফল। চন্দ্রকুমার ঠাকুরের হাতে মীমাংসার ভার দেওয়া হয়েছিল। সংবাদপ্রভাকর তাঁরই পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হত। সম্ভবত তিনি তরুণ ঈশ্বর গুপ্তকে (তখন তাঁর বয়স কুড়ি পূর্ণ হয়নি) কিছু বলে থাকবেন। এই ঘটনার শেষ পরিণাম হয়তো ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদকত্ব ত্যাগ। অবশ্য বন্ধু যোগেন্দ্রমোহনেরও মৃত্যু এ সময়ে।

যে-মাসে তিনি সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেছিলেন, সেই মাসেই সংবাদপ্রভাকর পত্রিকায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। সম্ভবত এটা ঈশ্বর গুপ্তের থাকার সময়েই হয়েছে। ডিরোজিও নব্যশিক্ষিতদের কাছে যেসব মুক্তবুদ্ধি দার্শনিকদের মতামত তুলে ধরতেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন টম পেইন। এদেশে তখন টম পেইনের রচনার যথেষ্ট চাহিদা ছিল। চাহিদা বুঝে আমেরিকার জনৈক পুস্তক প্রকাশক টম পেইনের 'এজ অব রিজন' শতাধিক কপি এদেশে পাঠাল। পাঁচ টাকা দিয়েও এক এক খণ্ড বই বিক্রি হতে লাগল। সেই দামেই বই কয়েকদিনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেল।[১০]

পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ লিখেছেন, এই সময়ের নানা আন্দোলনের মধ্যেও একটি বিষয়ে সকলের মধ্যে মিল ছিল—খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিদ্বেষ সকলেই পোষণ করত। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হতে শিক্ষা দেন নি, যেমন দেন নি হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরক্ত হতে। আবার রক্ষণশীল যাঁরা, তাঁরাও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি, বলাই বাহুল্য, কোনো অনুকূলতা পোষণ করত না। ডাফ চেয়েছিলেন স্থির বিশ্বাসের অভাবের সুযোগ নিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে। এ-কথাও ঠিক যে এই সময়ে ডিরোজিওর ছাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।[১১] টম পেইনের ধর্মসম্বন্ধীয় স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিকে দুই দলই ব্যবহার করেছিল। ডাফ লিখেছেন[১২],

> Here the evil genius of Paine was again resuscitated. Passages from his Age of Reason were often translated verbatim in the Bengali and inserted in the native newspapers. The editor of one of these published a separate

pamphlet, attacking the Bible on the score of its alleged inconsistencies. A copy of it he transmitted to one, with his compliments, challenging a reply. On examination, I found it to consist chiefly of patched extracts from Paine, clothed in a Bengali garb.

এই পত্রিকা-সম্পাদক হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সমসাময়িক পত্রিকার সাক্ষ্য,[৭৩]

Some one soon after took the trouble to translate some part of Tom Paine's Age of Reason into Bengalee and to publish it in the Prabhakar, calling upon the missionaries and upon the venerable character by name to reply to it.

তখনকার দিনে পত্রিকায় লেখকদের নাম থাকত না। সুতরাং প্রভাকরে এই অনুবাদ ঠিক কে করেছিলেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বলা কঠিন। তবে নব্যবঙ্গ এবং খ্রীষ্টধর্মবিরোধী আন্দোলনে ধর্মসভাপন্থী ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকা দেখে মনে হয় এই অনুবাদ হয়ত তাঁরই। তখন বাংলা-লিখিয়ে এবং এই আন্দোলনে উৎসাহপূর্ণভাবে বিরোধী ভূমিকা নিয়েছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঈশ্বর গুপ্ত। ভবানীচরণের নিজেরই পত্রিকা ছিল, তাছাড়া তিনি তখন যথেষ্ট প্রবীণ। ঈশ্বর গুপ্তের বয়স কম, স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে ডাককে নিজের রচনা পাঠিয়ে দেবার মতো উৎসাহ সেই বয়সেই স্বাভাবিক। এই রচনাটি আমি দেখতে পাই নি। কিন্তু লঙের বিবরণে দেখা যায় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পেইনের অনুবাদটি পুস্তকাকারে বেরিয়েছিল[৭৪],

In 1834 a book had appeared against Christianity chiefly a translation of Payne's Age of Reason.

এই সম্পর্কে সমাচার দর্পণের একটি খবর উদধৃতিযোগ্য[৭৫] —

'খ্রীষ্টীযান ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ সম্পাদক তদ্‌গ্রন্থের এক আদর্শ আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিযাছেন তদ্বিষযে আমরা বাধ্যতা স্বীকার করি। মিসিনরি সাহেবেরদের প্রতি প্রভাকর পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পাদরি লাক্রোয়া সাহেবের সঙ্গে যে লিখন-পঠন হয তাহা লইয়া ঐ গ্রন্থ সম্পন্ন হয়।'

৩

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সংবাদপ্রভাকর সম্পাদনা ত্যাগ করলে প্রগতি-আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কি হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য

পাওয়া যায় না। ১৮৩২-এর জুলাই মাসে আন্দুলের জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক 'সংবাদ রত্নাবলী' প্রকাশিত করেন। ঈশ্বর গুপ্ত এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকা ধর্মসভাপন্থী ছিল, এটুকুই জানা যায়। মতামতের বিশেষ কোনো নিদর্শন নেই।

নব্যবঙ্গ আন্দোলনের সময় সংবাদপ্রভাকরের প্রথম প্রকাশকালে ঈশ্বর গুপ্ত রক্ষণশীলমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর মনোভাবের বহুল পবিবর্তন হয়।[৭৬] বলতে গেলে তিনি নব্যবঙ্গ দলের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিলেন। নব্য-বঙ্গদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভাতে (১৮৩৮) তিনি যোগ দিয়েছিলেন। সভার সদস্য তালিকাতে তাঁর নাম ১৮৪২ এবং ১৮৪৩-এ দেখতে পাই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যাঁরা গোঁড়া রক্ষণশীল বলে পরিচিত তাঁদেব কাউকেই এই সভার সঙ্গে যুক্ত দেখতে পাই না। মাধবচন্দ্র মল্লিক এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁদেব সহগামী বন্ধুদের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তকেও জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্য হতে দেখি, তখন আর সন্দেহ করবাব উপায থাকে না যে তাঁর মনোভাবের আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। সম্ভবত জ্ঞানোপার্জিকা সভার অন্যতম সদস্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এখানেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্মধর্ম ও তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। ক্যালকাটা ক্রিশচিয়ান অবজার্ভার মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত। তার একটি মন্তব্য 'ফ্রেণ্ড অব ইনডিয়া' উদ্ধৃত করেছিল[৭৭]—

> The Probhakar must be noticed as one of the better issues from the Native Press. Its earlier numbers contain much well-managed and biting satires while its very later ones give to the public the moral essays and addresses delivered in the Tattwabodhiny Sabha, a private society of immeterialists arises out of the Brahma Sabha.

রক্ষণশীল নয় বলেই ঈশ্বর গুপ্তের উপর মিশনারিদের বিরাগও আর নেই। উদারনৈতিক বলে ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজি সংবাদপত্রগুলির দ্বারা সমাদৃত হতে আরম্ভ করেছেন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই।

১৮৩৮ থেকেই ঈশ্বর গুপ্তের জীবনের নতুন অধ্যায়। উগ্র রক্ষণশীলতা চলে গিয়েছিল। যাঁদের বিরুদ্ধে একদা তিনি লেখনী চালনা করেছিলেন তাঁদের অনেকেই তাঁর বন্ধু ও শুভার্থী হয়েছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁর

'পার্সিকিউটেড' নাটক নিয়ে তিনি তীব্র কটূক্তি করেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে ১২৫৪ বঙ্গাব্দের ২রা বৈশাখের সংবাদপ্রভাকরে তিনি লিখেছিলেন,[৭৮]

'বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহকরতঃ ইহার সৌভাগ্য বর্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন।'

কবিতাতে স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গপরায়ণতাব বশবর্তী হয়ে কৃষ্ণমোহনকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করলেও গদ্যরচনায় বহুবারই তিনি তাঁর সম্বন্ধে সংযত উল্লেখ করেছেন। তবে কতকগুলি বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত কয়েকটি দৃঢ় আদর্শে আস্থাশীল ছিলেন। স্বদেশ, স্বজাতি এবং স্বধর্ম সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত চিরকালই গভীর মমতা পোষণ করতেন। লেক্সলোসি আইন তিনি সমর্থন করেন নি। সেই উপলক্ষে তিনি লিখেছিলেন,[৭৯]

'কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি এইক্ষণে রেবরেণ্ড কে এম বানরজি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ইনি হিন্দু কালেজে মেং এইচ এল ভি ডোরেজু নামক ফিরিঙ্গি সাহেবের নিকট শিক্ষা করিয়া নাস্তিক হইয়াছিলেন, কোন ধর্মই মান্য করিতেন না, পটলডাঙ্গায় আপনার বাটীতে গোমাংস ও মটন আহার করিতেন, প্রতিবাসী কোন ব্রাহ্মণের বাটীর প্রতি অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেন, তথায় গোহাড় ও অন্যান্য অস্পৃশ্য দ্রব্যাদি ফেলিয়া দিতেন, তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া এক দিবস তাঁহাকে গুরুতররূপে প্রহার করেন তাহাতে তাঁহার ভ্রাতা ও অন্যান্য পরিবারেরা তাঁহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দেন, কৃষ্ণমোহন স্বজাতি সমাজ ত্যক্ত হইয়া কোন স্থানে আশ্রয় না পাইয়া পরিশেষে মিশনারিদিগের বিধর্ম মঠে গমন পূর্বক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এই বিবরণ যদ্যপি সত্য হয়, তবে সাধারণে অবশ্য এমত বিবেচনা করিবেন যে বানরজি মহাশয় ধর্মপ্রবৃত্তিতে খ্রীষ্টান হয়েন নাই।'

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ নিয়ে ১৮৩০-এর মতোই একটি চাঞ্চল্য হয়েছিল। হিন্দু ভিন্ন হিন্দু কলেজে কেউ পড়তে পারবে না, এই নিয়মটির পরিবর্তনের আয়োজন হতেই ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন,[৮০]

'নাগরিক হিন্দু বালকবৃন্দের ইংরেজী শিক্ষার যে এক প্রধান স্থান ছিল সংপ্রতি সে স্থানের অগ্রে অদ্য বর্ণের সংযোগ হইল, সুতরাং সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহাশয়েরা আর তথায় বালক প্রেরণে সাহসী হইতে পারেন না, আমরা বিশেষ রূপে শ্রবণ করিলাম অনেক ধনি লোকেরা হিন্দু কালেজ হইতে অবিলম্বে

আপনাপন সন্তানদিগ্যে ছাড়াইয়া অন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন, আমারদিগের এই প্রভাকরের জন্মকালীন 'ডুজু সাহেবি' হেঙ্গামায় একবার হিন্দু কালেজের বিরুদ্ধে লেখনী ধরিতে হইয়াছিল, এইক্ষণে ২২ বৎসরের পর পুনরায় 'মুসলমানি' 'খ্রীষ্টানি' এবং 'জারজী' এই ত্রিদোষ জন্য এই লেখনীকে আবার করসদনে নৃত্য করাইতে হইল।'

ঈশ্বর গুপ্তের আর একটি মমতার বিষয় ছিল মাতৃভাষা। নব্যশিক্ষিতদেব মধ্যে মাতৃভাষা চর্চায় ঔদাসীন্য দেখে তিনি ব্যথিত হয়ে 'ইয়ং বেঙ্গল' শিরোনামায় একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন,[৮১]

'যাঁহারা ইংরাজী বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ তাহারদিগের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি ব্যতীত তাবতেই বঙ্গভাষার প্রতি সমাদর করেন না, "ইয়ং বেঙ্গল" যুবকদলেরা স্বদেশের কল্যাণকারি বলিয়া সবদাই অভিমান করেন, কিন্তু সে কল্যাণ কিসে হয়? তাঁহারদিগের ভাষার শিক্ষাগুরু মহাশয়ের নিকট "পরম কল্যাণীয়" পর্যন্ত হইয়াছে কিনা? তাহা সন্দেহের বিষয়; অতএব যাঁহারা স্বদেশের বিদ্যা এবং ভাষার প্রতি অনুরাগশূন্য তাঁহারদিগের মঙ্গল চেষ্টার আদিসূত্রেই দোষ পড়িতেছে, ঐ মহাশয়েরা বিলক্ষণ সুধীর ও সুসভ্য এবং অনেকাংশে প্রতিজ্ঞাপালক বটেন কিন্তু এ পথে কিঞ্চিৎ সুদৃষ্টি হইলে আমরা তাঁহারদিগের দ্বারা আশার অতীত কত অধিক ফল প্রাপ্ত হইতাম··· উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রধান ব্যক্তি এ বৎসর টৌনহলে অতিশয় সদ্বক্তৃতা পূর্বক বড ২ ইংরাজদিগকে হতগর্ব করিয়াছেন, তাঁহাতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, ইহা সর্বতোভাবে স্বীকার্য বটে, কিন্তু বাবু যদি দেশস্থ জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিবর্গের দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি বঙ্গভাষায় ঐরূপ সুবক্তৃতা করিতে পারিতেন তবে অস্মৎ পক্ষে কি এক আশ্চর্য সুখের ব্যাপার হইত···'

ইয়ং বেঙ্গলদের সম্বন্ধে এই আক্ষেপোক্তিতে আর সেই নির্বিচার বিদ্বেষ নেই। স্বদেশ ও সমাজে তাঁদের বিদ্রোহের তাৎপর্য ঈশ্বর গুপ্ত যেন পরিণত বুদ্ধিতে বুঝতে পেরেছেন। তাদের আন্দোলনের অসম্পূর্ণতার দিকটি তিনি স্থিরতর বিচারণার সাহায্যে তুলে ধরেছেন। বাংলা ভাষার সাহায্যে আধুনিক চিন্তা-সম্পদকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার এই আকাঙ্ক্ষা পরবর্তী কালে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রকেই স্মরণ করায়।

বিভিন্ন সভাসমিতিতে

১. নব বিশিষ্ট শিষ্টগণ সভা ও বঙ্গরঞ্জিনী সভা ১৮৩০

২৮এ জানুয়ারি ১৮৩১-এ সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদকরূপে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের পূর্বেই 'নববিশিষ্ট শিষ্টগণ সভা' নামে এক সভার সম্পাদকরূপে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই সভা স্থাপিত হয়েছিল। বাংলা ভাষার চর্চাই এই সভাস্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই 'বঙ্গদূত' পত্রে ঈশ্বর গুপ্ত একটি পত্র প্রেরণ করে জানান এই সভার নাম পরিবর্তিত করা হল—

'শ্রীযুত বঙ্গদূত প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।··· পূর্বে এতদ্দেশীয় নববিশিষ্ট শিষ্টগণ সভা নামক সমাজের নিয়ম দূত পত্র দর্শন দ্বারা সকলেই অবগত থাকিবেন সংপ্রতি কিঞ্চিৎ নিয়মান্তর উপস্থিত হইল তাহা।

উক্ত সমাজের নামগত বর্ণবাহুল্যপ্রযুক্ত অনেকেই উচ্চারণে অসমর্থ অতএব সামাজিকেরা সকলে বিবেচনাপূর্বক বঙ্গরঞ্জিনীনামে ঐ সমাজ স্থাপিত করিলেন অপরঞ্চ বঙ্গভাষা শিক্ষার্থ এতন্নগরে অনেকেই অত্যন্ত প্রয়াসপূর্বক অনেকে অনেকে সমাজ স্থাপিত করেন তাহাতে ভাষা শিক্ষা যাদৃশ হউক কিন্তু অপভাষায় অনেকেই নিপুণ হইয়াছেন তৎপ্রযুক্তই বা হউক কিম্বা তাদৃশ গুণবৎ সংসর্গ প্রযুক্তই না হউক বিশিষ্ট কুলোদ্ভব জনেরদের গমনাভাবপ্রযুক্ত সমাজ সমাজ প্রায় হইয়াছে অতএব অস্মৎ সমাজীয় সামাজিকেরা তাদৃশ নিরীক্ষণদ্বারা সভা ভঙ্গে ভীত হইয়া এই নিয়ম স্থির করিবেন যে অস্মদীয় সমাজে যদ্যপি বিশিষ্ট শিষ্ট বর্ধিষ্ণু জনেরা সভাদিদৃক্ষু হইয়া আগমন করেন তবে আমারদিগের বহু ভাগ্য কিন্তু ধর্মদ্বেষী ও নাস্তিকমতালম্বী মান্যান্যান্য বিবেচনা শূন্য ও পরজাতীয় ভাষায় নৈপুণ্যত্ব প্রযুক্ত স্বকীয় ভাষাদ্বেষী এই সকল জনেরা অস্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না যদ্যপি প্রবিষ্ট হন তবে সভ্যপংক্তির মধ্যে তাঁহারা স্থান পাইবেন না ইত্যাদি নিয়ম পুনর্বার পত্রারূঢ় করিয়া মহাশয় সকলে জ্ঞাত করাইবেন ইতি। বঙ্গরঞ্জিনী সভাসম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তস্য' ৮২

'নববিশিষ্ট শিষ্টগণ সভা'রই নাম পরিবর্তিত হয়ে 'বঙ্গরঞ্জিনী সভা' নামকরণ হয়। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন এই সভার সম্পাদক।

এর প্রায় সাত বৎসর পরে কলকাতার অন্তর্গত সিমলায় বঙ্গরঞ্জিনী সভা নামেই আর একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্যও ছিল বাংলা ভাষার চর্চা। ঈশ্বর গুপ্ত এই সভার সঙ্গে কতখানি যুক্ত ছিলেন বলা যায় না, তবে এর

সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। সংবাদপ্রভাকর পত্রিকাতে তিনি এই সভা স্থাপনের সংবাদ দেওয়া প্রসঙ্গে লিখেছেন—

'কলিকাতার অন্তঃপাতি সিমলানিবাসি কতিপয় মহাশয় বঙ্গভাষা শুদ্ধরূপে লিখন পঠনার্থ উক্ত নামক এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে আর কোন সম্বাদ আমরা শ্রবণ করিলেই প্রকাশ করিব।'[৮৩]

২ ধর্মসভা

ধর্মসভার সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের যোগের কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি কলকাতায় স্থায়িভাবে বাস করতে এসে যাঁদের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন, সেই পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুবপরিবার ধর্মসভাপন্থী ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যজীবনের প্রথম যুগের কার্যকলাপ দেখেও মনে হয় তিনি ধর্মসভার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন যদিও পরে তাঁব এই মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছিল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি প্রধানত সতীদাহপ্রথা নিবারণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার জন্যেই ধর্মসভা স্থাপিত হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে যে-আবজি-পত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেটা রচনা করেছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। অতঃপর সভার নিয়মাবলী প্রস্তুত করার ভার ন্যস্ত হয় রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। নিজের বাড়ি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত গোকুলনাথ মল্লিকের বাড়িতেই সভার অধিবেশন বসত। সভা প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে বসত।

ধর্মসভার নিয়মাবলী অনুযায়ী এর একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল 'হিন্দুশাস্ত্র-বিহিত ধর্ম কর্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ তদ্বিষয়ক নিবেদনপত্রাদি রাজসন্নিধানে সমর্পণ এবং দেশের মঙ্গল চিন্তন'[৮৪] অর্থাৎ সমাজের বৃহত্তর অগ্রগতির কথা চিন্তা না করে আচার-বিচার সংস্কার-শুদ্ধি প্রভৃতি সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে ধর্মসভা কর্মপদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ করল। নিয়মানুযায়ী দলপতিরা নিজ নিজ দল বা অঞ্চলের বিবরণ ধর্মসভার মূল অধিবেশনে লিখে পাঠালে সেই ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। দলপতির নির্দেশ অমান্য করলে তার নাম অন্যান্য দলপতিদের জানিয়ে দেওয়া হত যাতে ধর্মসভার অন্তর্ভুক্ত অন্য কোনো দলে প্রবেশ করতে না পারে। এইভাবে অমান্যকারী সমাজে পতিত হত।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই দেখা গেল এই সব নিয়ম পালন করা সম্ভব হল

না। ধর্মসভার মুখপত্র সমাচারচন্দ্রিকা পত্র সভার বিবরণ প্রকাশ করত কিন্তু প্রগতিবাদী জ্ঞানান্বেষণ পত্রে এবং ইংরেজি পত্রেও ধর্মসভার শৈথিল্যের নানা বিবরণ দিয়ে ব্যঙ্গ করা হত। ধর্মসভার দলপতিরা নিজেরাই নিয়ম রক্ষা করে-চলতে পারছিলেন না— নিয়মবিরুদ্ধ হলেও সতীদ্বেষীর সঙ্গে তাঁদের মেলামেশা করতে হত।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মসভার অধ্যক্ষ রামকমল সেন সভার হাস্যকর কলহবিবাদ দেখে প্রস্তাব করেছিলেন, এ সব বিবরণ প্রকাশিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একটা শাখা-সভা স্থাপন করে 'সকলের হিতজনক জমিদারী ও কৃষিকর্মাদির আন্দোলন করা যায়।'[৮৫] এই প্রস্তাবে ধর্মসভা-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহ ছিল না। এই সময় থেকেই আশুতোষ দেবের অধ্যক্ষতায় আর একটি নতুন ধর্মসভা গড়ে ওঠে।[৮৬] ধর্মসভা দীর্ঘকাল পর্যন্ত নানা দলাদলির মধ্যে দিয়েও অস্তিত্ব রক্ষা করে বটে, কিন্তু সে ক্রমশই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন[৮৭] —

'অনুমরণ নিবারণ লইয়া যখন তুমুল আন্দোলন হয়, তখন একবার মাত্র তাঁহারা কিঞ্চিৎ সচেষ্টর ন্যায় হইয়া ধর্মসভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কতিপয় বর্ষ মধ্যেই ঐ সভা নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, উহার প্রধান প্রধান সভ্যেরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন— কেহ কেহ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া পতিত ব্যক্তিদিগের সমন্বয় করিবার চেষ্টাও করিতেছিলেন এবং পরিশেষে আপনাদিগের কোন কোন অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত নিতান্ত দীনবৎ গভর্নমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলেন।'

সাপ্তাহিক ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া লিখেছিল[৮৮]

The once formidable Dhurma Subha appears now to have lost all hold on public opinion.Though its fall has not been owing to external opposition, but to internal decay, yet from the very beginning it appeared to have embarked in a design which:in the present condition of Hindoo Society must have been considered visionary. It proposed to establish a spiritual despotism ; and to narrow the mutual intercourse of men who were living in the midst of European Society, which daily furnished them with the contagious example of a free and unrestrained communion and it has signally failed. Whether the new society be ever

established or not the charm which once surrounded the older society cannot be restored.

ধর্মসভার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে বোঝা যাবে এই সভা ১৮৩০ থেকে মাত্র তিন চার বৎসরই কিছু প্রাণবন্ত ছিল। এই সভার নানা বিবরণে আমরা কোথাও ঈশ্বর গুপ্তের নাম পাই না। কিন্তু সংবাদপ্রভাকর প্রথম প্রকাশিত হয়ে একবৎসর চার মাস পরে যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন ধর্মসভার মুখপত্র সমাচারচন্দ্রিকা লেখে,[৮৯]

'প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস পর্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্মপক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্মসভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন।'

এই সংবাদ দ্বারা বুঝতে পারা যায় ঈশ্বর গুপ্ত যতদিন সংবাদপ্রভাকরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ততদিন পত্রিকা ধর্মসভার পক্ষে ছিল। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদপ্রভাকর পত্রিকা সম্পাদন ত্যাগ করেছিলেন কিনা সন্দেহ, কারণ সংবাদে উল্লিখিত মাঘ মাসের তিমিরনাশক পত্রিকায় এ বিষয়ে মন্তব্য ছিল,[৯০]

'সন ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে প্রভাকর পত্র উদয় হয় তাহার কিরণে বুঝি জগৎ আলোক হইবেক এমনি প্রখর কিরণ প্রকাশ হইল তাহার কারণ কেবল ধর্মপক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল···এইক্ষণে তিনি ধর্মদ্বেষী হইয়াছেন যদি তাহার তাদৃশ প্রবলতা এখন থাকে তবে জানি বৈদ্যপোর ক্ষমতা অথবা তাহার মুরুব্বির যোগ্যতা।'

সমাচারচন্দ্রিকার সংবাদে যেমন মনে হয় ঈশ্বর গুপ্ত নিজের মতবাদে অবিচল থেকে প্রভাকর-সম্পাদনা ত্যাগ করেছিলেন, তিমিরনাশকের সংবাদে তেমনি মনে হয় সম্পাদক থাকতেই তিনি মত পরিবর্তন করে 'ধর্মদ্বেষী' হয়েছিলেন। অর্থাৎ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। কোনটা নির্ভরযোগ্য বলা কঠিন। জানুয়ারি মাসে অথবা ২৫ এ মে ১৮৩২ (=১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯) প্রভাকর পত্রিকা উঠে যাওয়ার সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের মতামত যাই থাক না কেন ২৪ জুলাই জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের আনুকূল্যে সংবাদরত্নাবলী প্রকাশিত হলে তিনি তাতে সহায়তা করতে থাকেন। সংবাদরত্নাবলী ধর্মসভার মুখপত্র ছিল। সুতরাং ধরা যেতে পারে ঈশ্বর গুপ্ত হয়তো ধর্মসভার সঙ্গে যোগ একেবারে বর্জন তখনও করেন নি।

অতঃপর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট সংবাদপ্রভাকর আবার প্রকাশিত হল।

খুব সম্ভবত সেই সময় থেকেই ধর্মসভার সঙ্গে তাঁর যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার পূর্বের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াও বিচিত্র নয়। 'বেঙ্গল হরকরার' বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে ধর্মসভা ও সমাচারচন্দ্রিকা-সম্পাদক ভবানীচরণের বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল।—

> Orthodox himself in sentiment, he has yet fallen on our old friend of the Chundrika without mercy. The first occasion of discord between them arose out of the following circumstance. Lord Auckland recently honoured the mansion of Baboo Dwarkanath Tagore with a visit; and the Chundrika an old enemy of the Baboos owing to that close intimacy which subsisted between him and Rammohun Ray, published several articles and letters censuring the visit and maintaing that his Lordship had compromised his dignity by it.[৯১]

এই বিষয়ে চন্দ্রিকার সঙ্গে সংবাদপ্রভাকরের মতভেদ হয়েছিল। এটা বিচ্ছেদের সূত্রপাত; তারপর আরও ঘটনা ঘটেছিল যাতে বোঝা যায় সমাচার-চন্দ্রিকার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের আর মিল ছিল না। তিনি স্বাধীন মনোভাব অবলম্বন করছিলেন। অবশেষে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পষ্টতই ঈশ্বর গুপ্তকে উদারনৈতিক দলের মুখপাত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৯২]

রক্ষণশীল দলের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের সংস্রব এই সময় পর্যন্তই। আগেই বলেছি ধর্মসভার সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের সভ্য হিসাবে যোগের কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই; তথাপি অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁকে ধর্মসভার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলে অনুমান করা যেতে পারে কিন্তু সেও অল্পকালস্থায়ী। হয়তো ১৮৩২-এই তিনি অনেকটা মুক্ত হয়েছেন, তবে ১৮৩৬-এ নবপর্যায় সংবাদপ্রভাকর সম্পাদনের সময়েই যে তিনি ধর্মসভার বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

৩. বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভা ১৮৩৬

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা নামে একটি সভা স্থাপিত হয়।[৯৩] সম্ভবত বাংলা ভাষায় আলোচনা প্রভৃতি হত বলে এই নামকরণ হয়েছিল। আসলে এই সভাই ছিল আমাদের দেশে রাজনীতি আলোচনার প্রথম সভা। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত একটি চিঠিতে জানা যায়[৯৪]—

'ধর্মসভার পরে রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা জন্য আবার যে একটা সভা হইয়াছিল তন্মধ্যে বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভাকে প্রথমা বলিতে হইবেক ঐ সভায় মৃত মহাত্মা রায় কালীনাথ চৌধুরী বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মুন্সি আমীর প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অতি সুচারু বিচার হয়, জিলা নদীয়ার বর্তমান প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইয়া অনেক প্রকার বিতর্ক উপস্থিত করিলে মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে তাহার সুচারু বিচার হইয়াছিল ঐ সময়ে সম্বাদভাস্কর পত্রের জন্মগ্রহণও হয় নাই, কিন্তু কেবল একতার অভাবে ঐ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে, রায় কালীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়েরা ব্রহ্মসভা পক্ষে থাকাতে ধর্মসভার লোকেরা তাহাতে সংযুক্ত হয়েন নাই ..'

ধর্মসভার লোকেরা এই সভায় যোগ দেয় নি, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত শুধু যে তাঁর পত্রিকায় এই সভার আলোচনা করেছেন তাই নয়, তিনি নিজে এই সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন। এই সভার নিয়ম ছিল এতে ধর্মবিষয়ক কোনো আলোচনা চলবে না। উদারপন্থীদের মুখপাত্র জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় এর যা বিবরণ পাই তাতে দেখা যায় মুখ্যত এতে রাজনৈতিক আলোচনাই হত। অন্তত দুটি অধিবেশনে ঈশ্বর গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন বলে স্পষ্ট উল্লেখ পাই।[২৫]

৪. সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা ১৮৩৮

ঈশ্বর গুপ্ত যতগুলি সভার সঙ্গে যুক্ত দিলেন, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সঙ্গে তাঁর যোগই তাদের মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক। এই সভার তিনি যে সভ্য ছিলেন, এ সংবাদ অনেকেরই জানা নেই। বঙ্কিমচন্দ্রও তার উল্লেখ করেন নি।

ধর্মসভা ছিল যেমন গোঁড়া রক্ষণশীলদের সভা জ্ঞানোপার্জিকা সভা তেমনি ছিল গোঁড়া নব্যপন্থীদের সভা। তরুণ ইংরেজিশিক্ষিত সংস্কারকামী যুবকদল, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি এই সভা স্থাপন করেছিলেন। ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন তাঁর মৃত্যুর পর লুপ্ত হয়ে গেলে জ্ঞানোপার্জিকা সভা তার স্থান নেয়। তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাজকৃষ্ণ দে-র আমন্ত্রণে[২৬] ১২ মার্চ ১৮৩৮ সালে সংস্কৃত কলেজ হলে এক সভা হয়। সেই সভাতেই Society for the Acquisition of

General Knowledge নামে একটি স্থায়ী আলোচনাসভা স্থাপনের প্রস্তাব হয়। আমন্ত্রণপত্রে বলা হয়েছিল,[৯৭]

> With a view therefore to create in ourselves a determined and well regulated love of study which will lead us to dive deeper than the mere surface of learning and enable us to acquire a respectable knowledge on matters of general, and more especially of local interest, we have thought it expedient to invite you to meet in order to consider the proposal of establishing an Institution which in our humble opinion is eminently calculated not only to effect this great end but likely to promote mutual good feeling and union—an object of no less importance.

এই সভার কাজ বস্তুত আরম্ভ হয়েছিল ১৬ই মে ১৮৩৮। ১৮৪০-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই সভায় ২৯টি প্রবন্ধ পড়া হয়েছে। ১৮৪৩ পর্যন্ত পঠিত প্রবন্ধগুলি থেকে নির্বাচন করে ১৮৪০, ১৮৪২ এবং ১৮৪৩-এ তিনটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভাপতি ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, সহকারী সভাপতি রামগোপাল ঘোষ ও কালাচাঁদ শেঠ, সম্পাদক রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র। কর্মসমিতির সদস্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, প্যারীমোহন বসু ও তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডেভিড হেয়ার ছিলেন 'অনারারি ভিজিটর'। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর হেয়ার এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনেরও সভাপতি হয়েছিলেন।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার অধিবেশন বসত সংস্কৃত কলেজ হলে।[৯৮] তখন সংস্কৃত কলেজ এবং হিন্দু কলেজ একই বাড়িতে বসত। প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুধবারে এই সভার অধিবেশন হত। ১৮৪৩এ ৮ই ফেব্রুয়ারি এই হলেই অনুষ্ঠিত এক সভায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় The Present State of the East India Company's Criminal Judicature and Police under the Bengal Presidency নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন। সেই সভায় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতা শুনে বলে ওঠেন সরকারী কলেজকে তিনি রাজদ্রোহীদের আড্ডায় পরিণত হতে দিতে পারেন না। রিচার্ডসন তাঁর মন্তব্য শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করলেও এখানে আর সভানুষ্ঠান হয় নি।

এই সময় জর্জ টমসন দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে এ দেশে আসেন।[৯৯] টমসনের অনুপ্রেরণায় নব্যবঙ্গের দল সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার অবসান ঘটিয়ে রাজনীতি আলোচনার জন্য বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করেন ১৮৪৩ সালের ২০এ এপ্রিল। সোসাইটির অধিবেশন বসত ৩১নং ফৌজদারী বালাখানায়।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা তখন নবচেতনায় উদ্‌বুদ্ধ বাঙালির প্রগতি-মূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সভার যাঁরা সদস্য হয়েছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এই সভার উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার প্রতি সহানুভূতিবশতই সদস্য হয়েছিলেন। ১৮৪০-এ প্রকাশিত প্রথম সংকলনগ্রন্থটিতে ১৬৮ জন সভ্যের নাম প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৪২-এ সদস্যসংখ্যা ছিল ১৫৪ এবং ১৮৪৩ এর সংখ্যা ছিল ১৬৮। নামগুলি লক্ষ্য করে দেখলে বোঝা যায় সেকালের ধর্মসভাপন্থী বা রক্ষণশীল বলে অধুনাপরিচিত কেউ এই তালিকায় নেই। সেকালের দিনের প্রগতিপন্থী বলে আমরা যাঁদের জানি তাঁরা প্রায় সকলেই এতে আছেন; যেমন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রশেখর দেব, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গুপ্ত, দ্বারকানাথ মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র সেন, গোপাললাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাধবচন্দ্র মল্লিক, মধুসূদন দত্ত, রাধানাথ শিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি।

অপরন্তু শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব বা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরপরিবারের কেউ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ধর্মসভার একজনকেও এই সভার সভ্যরূপে পাই না। নব্যবঙ্গদের মুখপত্র বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকায় ধর্মসভা সম্বন্ধে যে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে,[১০০] তাতে এই বিপরীত আদর্শপন্থীদের মধ্যে কোন যোগাযোগ সম্ভব বলে মনে হয় না।

সুতরাং ১৮৪২ এবং ১৮৪৩-এর সদস্যতালিকায় যখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম দেখতে পাই তখন এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে তিনি রক্ষণশীল দলের কর্মধারার সঙ্গে যোগ ছিন্ন করেছিলেন। অবশ্য ইতিমধ্যেই তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তত্ত্ববোধিনী সভার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাতেই তাঁর পরিবর্তিত মনোভাবের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়; তথাপি সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়া যে অকাট্য এবং নিঃসংশয়িত প্রমাণ তাতে সন্দেহ নেই।

অবশ্য এই সভায় যে সব প্রবন্ধ পড়া হয়েছে বা আলোচনা হয়েছে ঈশ্বর গুপ্ত তাতে যোগ দিয়েছেন বলে কোনো সংবাদ জানা নেই। তাঁর পক্ষে ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়া বা প্রবন্ধ পড়া হয়তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই সভায় বাংলা প্রবন্ধও পড়ার রীতি ছিল। এই সভার প্রথম সংকলনগ্রন্থে চারটি বাংলা প্রবন্ধ ছিল, উদয়চন্দ্র আঢ্যের 'এতদ্দেশীয় লোকদিগের বাঙ্গালাভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা-করণের আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব', গৌরমোহন দাসের 'জ্ঞান সম্পর্কে', গোবিন্দচন্দ্র সেনের 'রাজবৃত্তান্ত' (ভারতবর্ষের বিবরণ ও রাজবিবরণ), গোবিন্দ চন্দ্র সেনেরই 'ভারতবর্ষের সংক্ষেপ ইতিহাস'। ঈশ্বর গুপ্ত এই সব বক্তৃতার অতি উচ্চমানের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে সহযোগিতা করতে না পারলেও এঁদের উদ্দেশ্য এবং আলোচনায় যে তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি ছিল তাতে সন্দেহ করা চলে না। এই সময়ের সংবাদপ্রভাকর পাওয়া যায় না। অন্য কোনো ভাবেও ঈশ্বর গুপ্তের লিখিত মতামত কিছু পাওয়া যায় না। তাই তাঁর চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য কিছু নেই। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার মতামত পূর্ববর্তী যুগের মতো অতটা একপেশে ছিল না। ইংরেজি ভাষার চর্চা যেমন তাঁরা করেছেন, বাংলাভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা তেমনি অনুভব করেছেন। বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকা ছিল দ্বিভাষিক। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থার অনুসন্ধান ও উন্নতিবিধানের প্রয়োজনের কথা তাঁদের মতো আর কেউ বলেন নি।

প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের অভাবে অন্য দিকের কথা বলা কঠিন হলেও বাংলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার সম্ভাবনার উজ্জ্বলতায় ঈশ্বর গুপ্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন, অনুমান করতে বাধা নেই। বাংলাভাষার প্রতি তাঁর বিশিষ্ট মমতার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি, বঙ্গরঞ্জিনী সভা বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভা এবং বাঙ্গালা ভাষানুশীলনী সভার সঙ্গে তাঁর যোগের ইতিহাসে। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় পঠিত উদয়চরণ আঢ্যের প্রবন্ধ এই যোগের ইঙ্গিত দেয়।

• তত্ত্ববোধিনী সভা

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিষদ অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন। তখন থেকেই উপনিষদ চর্চা করবার জন্য একটি সভার প্রয়োজন অনুভব করেন। তখনও পর্যন্ত রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন 'ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ়

তত্ত্ব এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। উপনিষদকেই আমরা বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম; বেদান্ত-দর্শনের সিদ্ধান্তে আমাদের আস্থা ছিল না।' এই সভাই তত্ত্ববোধিনী সভা।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হওয়ার পূর্ব থেকেই হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত অবশ্য পত্রিকা পরিচালনার সময়ে সাহায্য পেয়েছিলেন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারের। কিন্তু তিনি জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যও পেয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের নিজের স্বীকৃতি ছাডাও কিশোরীচাঁদ মিত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনীতে এই তথ্যটি জানিয়েছেন। অবশ্য দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁর যোগ কবে থেকে হয়েছিল সেটা ঠিক বলা যায় না। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গিগত ঐক্য ছিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ সবতত্ত্বদীপিকা সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাভাষার সাহায্যে বিবিধ বিদ্যার আলোচনা। এই উদ্দেশ্য সেকালের ইংরিজিআনার যুগে দুঃসাহসিক হলেও এই দুঃসাহসিকতা প্রথম দেখিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সম্পাদকরূপে আবির্ভূত হবার পূর্বেই ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'নববিশিষ্ট শিষ্টগণ সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন।

যাই হক, পত্রিকা-সম্পাদন এবং সভাসমিতি উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ফলে ১৮৩৯-এ যখন দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করলেন, ঈশ্বর গুপ্তও তাতে তখন যোগ দিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দু-মাসের মধ্যেই ১৭৬১ শকের ১৮ অগ্রহায়ণ অর্থাৎ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর ঈশ্বর গুপ্ত এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন।[১০২]

মাত্র দশজন সভ্য নিয়ে ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন রবিবার দেবেন্দ্রনাথের বাসভবনে এই সভা স্থাপিত হয়। এই সভা তখন রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ থেকে আলাদা ছিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তত্ত্ব-বোধিনী সভা মিলিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, ১৭৬৩ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের যোগ হয়।[১০৩] আসলে ১৭৬৩ শকের শেষভাগে মিলনের পরিকল্পনা হয় এবং ১৭৬৪ শকের বৈশাখ মাসে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয়। তত্ত্ববোধিনী সভা যখন অনাড়ম্বর ভাবে দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে স্থাপিত হল, তখন ঈশ্বর গুপ্ত তাতে যথাসাধ্য সাহায্য করতে ক্রুটি করেন নি। তিনি নিজে তো সভ্য হলেনই, অক্ষয়কুমার দত্তকেও তিনি সভ্য করালেন। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এই সময় অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত আমার সংযোগ

হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইঁহাকে আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়া দেন। অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন।'[১০৪]

অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন ১৭৬১ শকের ১১ই পৌষ, ইংরেজি ২৮ ডিসেম্বর ১৮৩৯। সভ্যপদের জন্য নাম প্রস্তাব করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই, প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়।[১০৫] পরবৎসর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হলে অক্ষয়কুমার মাসিক আট টাকা বেতনে সেখানে শিক্ষক নিযুক্ত হন।

ঈশ্বরচন্দ্র শুধু যে অক্ষয়কুমারকেই সভ্য করিয়েছিলেন তা নয়, তিনি নিজের ভাই রামচন্দ্র গুপ্তকেও তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য করিয়েছিলেন। রামচন্দ্র ১৭৬৬ শক পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় তিনি 'দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য না দেওয়াতে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যশ্রেণী হইতে রহিত হইয়াছেন'।[১০৬]

ঈশ্বর গুপ্ত নিজে ১৭৭০ শক অর্থাৎ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। সেই বৎসর তিনি বারো টাকা চাঁদা দেন। কিন্তু ১৭৭১ শক অর্থাৎ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আর তাঁকে সভ্যতালিকায় দেখতে পাই না।[১০৭] কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভা এবং দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা যে অটুট ছিল, 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকা পড়লেই তা বুঝতে পারা যায়। তত্ত্ববোধিনী সভার পদ্ধতিতে তিনি সংবাদপ্রভাকর কার্যালয়ে উপাসনা এবং সম্মেলন প্রবর্তন করেছিলেন— মাস পয়লার সংবাদপ্রভাকরে তার বিবরণ পাওয়া যায়।

ঈশ্বর গুপ্ত তত্ত্ববোধিনী সভার নামমাত্র সভ্য ছিলেন না। তিনি এর নানা আয়োজনে অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতেন। তিনি তত্ত্ববোধিনী সভায় মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতেন। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বৎসরে অর্থাৎ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ সেপটেম্বর সভার প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন, 'তৃতীয় বৎসরে এই তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহপূর্বক হইয়াছিল'— সেটা কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর। ১৮৩৯-এ প্রতিষ্ঠাবর্ষ থেকে ধরলে ১৮৪১-এ তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বিতীয় বৎসর হয়, তৃতীয় বৎসর নয়। আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ সাংবৎসরিক উৎসবের যে-বর্ণনা দিয়েছেন তা এই ১৮৪১-এর। এই সভায় বক্তৃতা দেন দেবেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ রায়, উমেশচন্দ্র রায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রমাপ্রসাদ রায়। এই সভা খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'সভাটা ভারি জাঁকের সহিত শেষ হইল'।[১০৮]

এই উৎসবে ঈশ্বর গুপ্তও খুব সম্ভব উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো বক্তৃতা করেন নি দেখা যাচ্ছে। ১৮৪২ সালের ২ অক্টোবর সভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নব্যবঙ্গ-পরিচালিত 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকায় এই সভার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল,[১০৯]—

> 'গত ২ অক্টোবর উক্ত সভার তৃতীয় জন্মতিথির উপলক্ষে যে বৈঠক হয়, তাহাতে আমরা উপস্থিত ছিলাম, তৎসভার সভ্যাদিগের যে কতিপয় বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা গুণ এবং তর্কপ্রকাশক বটে। তদ্দিবসীয় সভাতে প্রথমত সভাপতি শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদান্ত দর্শনের প্রতি বক্তৃতা করেন, তৎপরে শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা করণের আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য জগদীশ্বরের সত্তা বিষয়ের কথোপকথন কেনোপনিষদ্ হইতে ব্যাখ্যা করেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয় আত্মজ্ঞান পরমধর্ম ও তদুপার্জন অত্যাবশ্যক বিষয়ে এতদ্বিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।…'

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ ১৮৪২-এর সভাকে ১৮৪১-এর সভার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে লিখেছেন, 'বক্তা হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের নাম দেবেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন নি, কেন করেন নি তা তিনিই জানেন'।[১১০]

দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর গুপ্তের নাম করেন নি, তার কারণ আর-কিছুই নয়—তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম সাংবৎসরিক সভায় (১৮৪১-এ সভাপ্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বৎসরে অনুষ্ঠিত) ঈশ্বর গুপ্ত কোনো বক্তৃতাই করেন নি। ঈশ্বর গুপ্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন তৃতীয় বৎসরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক-সভায় ১৮৪২-এর ২ অক্টোবর। বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকার বিবরণ যে এই দ্বিতীয় সভার, তার প্রমাণ ১৮৪৩-এর জানুয়ারি সংখ্যার পত্রিকায় এর উল্লেখ 'হয়েছে গত ২ অক্টোবর'। ১৮৪১-এর ঘটনাকে ১৮৪৩-এ নিশ্চয় 'গত ২ অক্টোবর' বলে উল্লেখ করা হত না।

ঈশ্বর গুপ্ত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার তৃতীয় সাংবৎসরিক পরীক্ষায় ১৭৬৭ ২০ পৌষ বাঁশবেড়িয়ায় উপস্থিত ছিলেন।[১১১]

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ আগষ্ট বিলাতে সংবাদপ্রভাকরের অন্যতম হিতৈষী দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। দ্বারকানাথের মৃত্যুতে তত্ত্ববোধিনী সভায় শ্রীধর

বিদ্যারত্নের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ অধিবেশন বসে। তাতে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন ঈশ্বর গুপ্ত এবং সেটা সমর্থন করেন বৈকুণ্ঠনাথ সেন। প্রস্তাবটি এই রকম[১১২]—

'শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রস্তাব করিলেন যে পরলোকবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনাবধি আপনার জীবিতাবস্থা পর্যন্ত তাহার তাবৎ কার্য নিষ্পাদন নিমিত্তে প্রতিমাসে আশী টাকা দান করিয়াছেন এইক্ষণে তাঁহার লোকান্তর গমনে সভার পক্ষে বিশেষ হানির বিষয় হইয়াছে। অতএব এই মহোপকারি মৃত মহাত্মার এই মহৎ কার্যে বাধ্য হইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দেওয়া যায়।'

তত্ত্ববোধিনী সভার ও দেবেন্দ্রনাথের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের শ্রদ্ধা চিরকালই ছিল। সংবাদপ্রভাকর পত্রিকায় তিনি এই সভার বিবরণ সমাদরের সঙ্গে প্রকাশ করে এসেছেন। যে-কোনো উপলক্ষে তত্ত্ববোধিনী ও দেবেন্দ্রনাথের গুণগান তিনি করেছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যখন ঋগ্‌বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে, তখন ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদপ্রভাকর পত্রে লিখেছিলেন[১১৩]

'তত্ত্ববোধিনী সভার অনুরাগি অধ্যক্ষ মহাশয়েরা বিশেষ প্রযত্ন পুরঃসর বেদোক্ত ধর্ম প্রচারে অধিক মনোযোগি হইয়াছেন, পাঠকবৃন্দ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন, তৎপত্রে অধুনা ভাষ্যসহিত ঋগ্বেদসংহিতা প্রকাশ পাইতেছে এজন্য আমরা আন্তরিক উৎসাহের সহিত বিদ্যানুরাগি স্বদেশহিতৈষি এতদ্দেশীয় ধনি মহাশয়দিগ্যে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা উক্ত সমাজের প্রতি বিশেষ অনুকূলতা প্রদর্শন করেন বিশেষতঃ বর্তমান বর্ষে বাণিজ্যকার্যের অমঙ্গল ঘটনায় কথিত সভার বিশেষ ২ বান্ধবগণ ক্লেশজালে পতিত হইয়াছেন অতএব এই অসময়ে এতন্মঙ্গলানুষ্ঠানে যে সকল ব্যক্তি ধনদ্বারা এবং মনের দ্বারা সাহায্য করিবেন তাঁহারাই যথার্থরূপে ভারতবর্ষের বন্ধু বলিয়া ভবিষ্যতে গণ্য ও মান্য হইবেন।'

তত্ত্ববোধিনী সভার নিরন্তর সান্নিধ্যে থাকার ফলে ঈশ্বর গুপ্তের চিন্তা ও আদর্শে অনেকখানি পরিবর্তন এসেছিল বলেই অনুমান করি। ঈশ্বর গুপ্তের ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিতে যে পিতৃভাবের সাধনা এবং জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তির অধ্যাত্ম-বোধ প্রকাশ পেয়েছে, তা হয়তো তত্ত্ববোধিনীর আদর্শেরই ফল। তাঁদের মতো লোকাচার-দেশাচারের নিন্দা করে তিনি সত্যধর্ম প্রচারের ব্যাকুল আগ্রহ দেখিয়ে গিয়েছেন—

লোকাচারে দেশাচারে জাতিপ্রথা ব্যবহারে
নাহি হয় সত্যের প্রকাশ।
সত্যের হইলে দাস এ সকল হয় নাস,
সমাজেতে করে উপহাস ॥
সমাজেতে যদি রই সত্য সভা ছাড়া হই
তোমা ছাড়া হতে তবে হয়।
সত্য আর লোকাচার আলো আর অন্ধকার
একাধারে কেমনেত রয় ॥[১১৪]

তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি ঈশ্বর গুপ্ত এত শ্রদ্ধা ও মমতা পোষণ করতেন যে কেউ যদি অজ্ঞাতসারেও একে লঘু করে দেখত, তাহলেও তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন। ১৮৫০-এর সংবাদপ্রভাকরে তাঁর এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে[১১৫]—

'দেখিলাম ভাস্কর ও পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সম্পাদকেরা এসিয়াটিক সোসাইটি নাম্নী মহাসভা সন্নিধানে কতিপয় মুদ্রিত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিষয়ে বিস্তর অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন (১৯ বৈশাখের ভাস্করে ও ১৮ বৈশাখের পূর্ণচন্দ্রোদয়ে) ইউরোপীয় জ্ঞানাপন্ন লোকসকল বিদ্যাপ্রচার বিষয়ে যে অত্যন্ত উৎসাহি এবং এইক্ষণে যে তাঁহাদের যত্নে সংস্কৃত গ্রন্থসকল মুদ্রিত হইয়া সর্বসাধারণের সুলভ হইতেছে ও তন্নিমিত্ত তাঁহারা যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাভাজন তাহার সংশয় নাই কিন্তু সম্পাদক ভায়ারা বিদেশীয় লোকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবার সময়ে স্বদেশের প্রতি যে কতকগুলি অযথার্থ কথার উল্লেখ করিয়াছেন ইহাই আক্ষেপের বিষয়। তাঁহারা এই প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে এদেশে রাজা রামমোহন রায়ের পরে বেদ ও তাহার অনুবাদ প্রায় প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহারা কি মহোপকারিনী তত্ত্ববোধিনী সভাকে একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন? তাঁহারা কি আলস্যপরবশ হইয়া এমত হতচেতন হইয়াছেন যে মাসে একবার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না? কি লজ্জার বিষয়! সম্পাদকত্ব পদ ধারণ করিয়া স্বদেশে কি কি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে তাহারও সমাচার রাখেন না? তত্ত্ববোধিনী সভা প্রথমাবধিই নানামতে বেদবিদ্যা প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ১৭৬৫ শকে দেবনাগর অক্ষরে বৃত্তি সহিত কঠ ও ঈশোপনিষদ মুদ্রিত হয়, পরে ১৭৬৭ শকে বৃত্তি সহিত কঠ,ঈশ, কেন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, প্রশ্ন, ঐতরেয়োপনিষদ্ প্রকটিত হয় আর ক্রমে ক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সংস্কৃত বৃত্তি বাঙ্গালা অর্থ ও

তাৎপর্যসম্বলিত কঠোপনিষদ এবং ইংরাজী অনুবাদসম্বলিত কঠ বাজসনেয় মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ মুদ্রিত হইয়াছে এবং দুই বৎসরাবধি সংস্কৃত বৃত্তি ও বাঙ্গলা অর্থ সহিত ঋগ্বেদসংহিতা যথাক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। বস্তুতঃ এদেশে বেদবিদ্যার প্রচার বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী সভা যত আনুকূল্য ও যত অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন, অদ্যাপি এ দেশের কোন সভা তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। পূর্বোক্ত সভার অধ্যক্ষেরা বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন ও তদ্বিষয়ক সংগ্রহনার্থ কাশীতে ছাত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং আমরা নিশ্চিত অবগত আছি যে রোযর সাহেবও তত্ত্ববোধিনী সভার শুদ্ধ গ্রন্থ দৃষ্টে উপনিষদ সমুদয় মুদ্রিত করিতেছেন অতএব এমত তত্ত্ববোধিনী সভা সত্ত্বে যাঁহারা কহেন রাজা রামমোহন রায়ের পরে হিন্দুজাতি হইতে এতাদৃশ বেদ অনুবাদ হয় নাই ও তাঁহার পরে উপনিষদ শাস্ত্র প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছে তাঁহাদিগকে অবশ্য অবশ্যই অবিচক্ষণ ও অকৃতজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়।'

এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের যোগের উল্লেখও কর্তব্য। মিশনরীদের অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলি খ্রীষ্টানী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র বলে ১৮৪৬, ১ মার্চ তারিখে চিৎপুর রোডে রাধাকৃষ্ণ বসাকের বৈঠকখানায় হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হল।[১১৬] এই বিদ্যালয়ের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাসিক দু টাকা এবং এককালীন কুড়ি টাকা চাঁদা দেন।[১১৭]

৬. বারাসাত স্কুল কমিটি ১৮৩৯

সমাচার দর্পণ ২০ জুলাই ১৮৩৯ এর সংবাদে জানা যায় বারাসতে স্থানীয় এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ১৩ই জুলাই শনিবার মিলিত হয়ে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপনের আয়োজন করেন। সভা হয়েছিল প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের বাড়িতে। ঐ সভায় কলকাতা থেকে ঈশ্বর গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন[১১৮]। এই সভায় কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তার কোনো কোনোটি ঈশ্বর গুপ্ত উপস্থাপিত করেন, কোনো কোনোটি তিনি সমর্থন করেন। শ্যামচাঁদ বাড়ুয্যে প্রস্তাব করেন কলকাতাবাসী ব্যক্তিদের একটি সবকমিটি কলকাতায় স্থাপিত হবে এবং সেই সাবকমিটি মূল কমিটির অধীনে স্কুল পরিচালনার কাজে সাহায্য করবে। এই প্রস্তাবটি ঈশ্বর গুপ্ত সমর্থন করেন। এই অনুমান খুবই সঙ্গত যে তিনি এই সবকমিটির সভ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

৭. বাঙ্গালা ভাষানুশীলনী সভা ১৮৩৯

ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদপ্রভাকর পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের পিতৃব্যপুত্র সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারী হরমোহন দত্তের কাছে মাঝে মাঝেই যেতেন। এই সময়েই অক্ষয় দত্তের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় হয়।'[১৯] এই ঘটনা সম্ভবত ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের। 'অক্ষয়চরিতে' উল্লিখিত হয়েছে, এই স্থানের পরিচয় ছাড়াও অক্ষয়কুমারের পিসতুত ভাই রামধন বসুর বাড়ির কাছে নরনারায়ণ দত্তের বাড়িতে বাঙ্গালা ভাষানুশীলন সভা হত। এই সভায় ঈশ্বর গুপ্ত এবং অক্ষয়কুমার দুজনেই উপস্থিত থাকতেন।

৮ দেশহিতৈষিণী সভা ১৮৪২

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপ্রভাকর পত্রে প্রকাশিত একটি চিঠিতে জনৈক লেখক সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত-স্থাপিত 'দেশহিতৈষিণী সভা'র উল্লেখ করেছেন।[২০] -

'বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় আপনি উদ্যোগী হইয়া দেশহিতৈষিণী সভা নামে এক সভা করিয়াছিলেন। ঐ সভায় সমুদয় বাঙ্গালা পত্র-সম্পাদকদিগের সংযোগ হইয়াছিল, যোড়াসাঁকোর ৺ কমল বসুর বাটীতে যে কয়েকবার তাহার প্রকাশ্য সভা হয়, সেই সকল বারেই সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য লোকেরা আগমন করিয়াছিলেন, নিয়মাদি নির্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু কি আক্ষেপ ঐ সভার দ্বারা এমত কোন কার্য হয় নাই যদ্দ্বারা তাহা আমারদিগের স্মরণীয় হইতে পারে।'

পত্রের সময়নির্দেশ থেকে মনে হয় এই সভা বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভা (১৮৩৬) এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সভা (২০ এপ্রিল ১৮৪৩)-এর মধ্যে কোনো সময়ে স্থাপিত হয়েছিল।

৯ নীতিতরঙ্গিনী সভা ১৮৪২

'১৭৬৪ শকে অক্ষয়বাবু [অক্ষয়কুমার দত্ত] ও জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত টাকী নিবাসী প্রসন্নকুমার ঘোষ উভয়ে মিলিয়া 'বিদ্যাদর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকার প্রচারম্ভ করেন। দুঃখের বিষয় ছয় মাস পরেই ইহার অকাল মৃত্যু হয়। তদন্তর উল্লিখিত গ্রামের জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বরাহনগরস্থ বাটীতে "নীতিতরঙ্গিনী" নামে যে সভা হইত তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সহিত তথায় গমনাগমন করিতেন। কিছুদিন পরে ইঁহারা উভয়েই এই সভার সভ্য মনোনীত হন। নামে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে নৈতিক উন্নতি সাধন

করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সভ্যগণ কর্তৃক নীতিবিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ রচিত ও পঠিত হইত। দত্তজর কোন প্রবন্ধ পরে প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতদুপলক্ষে চৌধুরী মহাশয়ের সহিত তাঁহার আত্মীযতা জন্মে।'[১২১]

১০. হিন্দু থিওফিলানথ্রপিক সোসাইটি ১৮৪৩

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি Hindu Theo-Philanthropic Society নামে একটি সভা কিশোরীচাঁদ মিত্র নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় কুড়ি বৎসর পরে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় কিশোরীচাঁদ Phases of Hinduism প্রবন্ধে এই সভার একটি বিবরণ প্রকাশ করেন—

> It is therefore manifest that the Brahmos during this phase of their faith believed in a personal God and in his attributes. The grand mistake they made was in setting up the Vedas as revelation. This mistake was, however, confined to their circle. Outside that circle it was recognised as palpable and egregious. In 1843 the same year which witnessed the issue of the Tatwabodhiny Patrica—a religious society was established on a wider basis. The Hindu Theophilanthropic Society was inaugurated on the 10th February 1843, by a few friends assembled for the purpose of considering the best means for promoting the moral and religious elevation of their countrymen. In the preface to the discourses read at the meetings of this Society its object is thus enumerated. 'The Society aims at the extermiration of Hindu idolatry, and the dissemination of sound and enlightened views of the Supreme Being—of the unseen and future world—of truth of happiness and final beatitude. It proposes to teach the Hindus to worship God in *spirit* and in *truth* and to enforce those moral and most sacred duties which they owe to their Maker, to their fellow beings and to themselves.' The Society held monthly meetings at which discourses in English and Bengalee were delivered. The subjects embraced by the discourse related to the nature and attributes of thc deity and to general Principles in morals and religion. The other means adopted by the Society for the attainment of the object were the

preparation and publication of Bengalee tracts on moral and religious subject and the reprinting of Sanskrit and Bengalee works illustrating the same. The monthly meetings were attended and addressed by earnest and representative men of different classes, such as Dr. Duff the Rev. K. M. Banerjee, Baboo Ukhoy Coomar Dutt, Baboo Ramgopal Ghose, Baboo Peary Chand Mitter and the late *Baboo Isser Chunder Goopto*.[১২২] The nature and aims of the institution are thus explained at length in the inaugural discourse of the Founder : 'The Society aims at the extermination of Hindu idolatry and the dissemination of sound and elevated views of God, Futurity, Truth, and Happiness. Though it is established for the purpose of promoting moral and religious culture irrespective of any revealed form and only by the Study of duties and destinies of man as revealed by the constitution and of the power, wisdom and goodness of God as manifested in nature still its basis is broad and unexceptionable enough to admit the cordial cooperation of every good man no matter to what creed he may belong The pious and benevolent of every religion cannot but be deeply interested in its success.

The existence of God is the first dogma of the Hindu Theophilanthropist and the immortality of the soul the second. The dogma of the Hindu Theophilanthropist are those upon which all sects, Christian, Hindu, Mahomedan, Chinese are agreed and the name they have taken express the double end of all religionists that of leading, namely, to love towards God and men.'[১২৩]

এই বিবরণে লক্ষণীয়, এই সভার প্রতিষ্ঠাতা কিশোরীচাঁদ মিত্রের নাম নেই। ক্যালকাটা রিভিয়ুর এই লেখাটা কিশোরীচাঁদের নিজেরই সেইজন্যই বিনয়বশত তিনি নিজের নাম গোপন রেখে আর সকলের নামই দিয়েছেন।[১২৪] হিন্দু থিয়ফিলানথ্রপিক সোসাইটি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিল। কিশোরীচাঁদ এই সভার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, সভাব অধিবেশন তাঁর বাড়ীতেই হত। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন কর্মোপলক্ষে কলকাতার বাইরে চলে যান, তখন সভাও উঠে যায়।

এই সভায় পঠিত প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছিল **Discourses read at the Meetings of the Hindu Theo-philanthropic Society, vol 1** নামে।[১২৫] বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। পরের খণ্ড সম্ভবত প্রকাশিত হয় নি। এই বইয়ের ভূমিকাটি মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর 'কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র' গ্রন্থে অনুবাদ করে দিয়েছেন। এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটি সম্প্রতি আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। মূল ভূমিকাটি নীচে উদ্ধৃত করে দিলাম।

Preface

The committee of the "Hindu Theophilanthropic Society" deem it incumbent on them to say a few words with reference to the nature and objects of the Society. The existence is owing to a conviction irresistibly forcing itself upon every reflective mind that the great work of India's Regeneration cannot be achieved without due attention to her moral and religious improvement.

The Society was established on their 10th of February 1843, by a select number of Native friends assembled for the purpose of considering the best means for promoting the moral elevation of their countrymen. Despite the formidable obstacles which opposed themselves to its progress, and which, under the existing circumstances of our country, are inseperable from the pursuit of every great and good undertaking, this little corporation, thus originated has continued to thrive and now promises to be a lasting and efficient institution. Its operations during the last year afford a cheering illustration of the practical recognition on the part of some educated Hindus at least, of necessity and importance of moral and religious culture.

The Society aims at the extermination of Hindu idolatry, and the dissemination of sound and enlightened views of the Supreme Being— of the unseen and future world—of truth— of happiness and final beatitude. It proposes to teach the Hindus to worship God in *spirit* and in *truth* and to enforce those moral and most sacred duties which they owe to their Maker, to their fellow beings and to themselves.

The truths which it means to inculcate are it must be remembered, not necessarily dependent on the truth or falsehood of any creed, but such as are sanctioned by the universal belief of mankind. But though absolutely independent of all creeds, yet these truths form the basis, so to speak of every creed. That there is a Creator and moral Governor of the universe—that there is a something in man which is not annihilated on the dissolution of the bodily frame and which is immortal—that virtue is associated with happiness and vice with misery ; these constitute the fundamental doctrines, the seminal principles, of the religion both of civilized and uncivilized nations The practical recognition of them by the great mass of the Natives, cannot but be hailed by every real friend of India.

The object of the Society, as its very name implies, is to promote love to God and love to man. It is an object in which every pious and benevolent person must be deeply interested.

The Society holds monthly meetings when discourses in English and Bengallee are delivered The subject embraced by the discourses relate to general principles in morals and religion. The other means adapted by the Society for the realization of its objects, are the preparation and publication of Bengallee Tracts on moral and religious subjects, and the reprinting of Sanscrit and Bengallee works illustrating the same.

The object of the Society being absolutely a catholic object, it is earnestly hoped that the cordial sympathies of every enlightened European and Native friend of our country will be enlisted in its behalf.

Calcutta
1st. Oct. 1844

এই বইটিতে প্রবন্ধ ছিল এই কয়টি—

১. **Discourse read at the Inaugural Meeting of the Hindu Theophilanthropic Society, 10th February 1843** পৃ ১-২০

২. পরমেশ্বরের শক্তি এবং দয়া পৃ ২০-২৪

৩. The Goodness of the Deity Manifested in a Leaf পৃ ২৪-৩৩

৪. The System of Philosophy inculcated in the Bhagvata Geeta. পৃ ৩৩-৪৪

৫. On the Bhagavat Geeta পৃ ৪৪-৫৬

৬. ব্রহ্মোপাসনার আনন্দ পৃ ৫৭-৬১

৭. The Power, Wisdom and Goodness of the Deity as Displayed in the Organism of the Zoophyte পৃ ৬১-৭১

৮. নীতিজ্ঞান পৃ ৭১-৭৩

৯. On Hinduism as it is পৃ ৭৩-৮৯

১০. The Phenomena of Reproduction,—an Argument for the Goodness of God and the Immortality of the Soul পৃ ৮৯-১০৭

১১. যথার্থ প্রেম এবং ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করা কর্তব্য পৃ ১০৮-১১৩

১২. The Association of virtue with Happiness and of vice with Misery, an argument for the goodness of the Deity পৃ ১১৩-১২১

১৩. The Immortality of the soul, as inculcated by the Hindu Religion পৃ ১২১-১৩২

১৪. পরোপকার পৃ ১৩২-১৩৭

১৫ Conformity and Non-conformity পৃ ১২১-১৩২

বইতে প্রবন্ধলেখকদের নাম কোথাও ছিল না। মন্মথনাথ ঘোষ বলেন[২৩] 'বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলির প্রায় সমস্তগুলিই মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যে কাহারও রচিত বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজী প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক কিশোরীচাঁদের লিখিত।' কিন্তু কিশোরীচাঁদ স্বয়ং এই সভার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং অক্ষয়কুমার দত্তের নাম উল্লেখ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম তিনি করেন নি। পাঁচটি বাংলা প্রবন্ধ যাঁরা লিখেছেন অন্তত অক্ষয়কুমার এবং ঈশ্বর গুপ্ত তাঁদের অন্যতম ছিলেন অবশ্যই। এই পাঁচটি প্রবন্ধের মধ্যে দুটি প্রবন্ধ 'যথার্থ প্রেম এবং ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করা কর্তব্য' এবং 'পরোপকার' ঈশ্বর গুপ্তের রচিত বলে অনুমান করি। রচনারীতি পরীক্ষা করলে এই অনুমানই স্বাভাবিক। 'নীতিজ্ঞান' প্রবন্ধটি অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা হওয়াই

সম্ভব। এই প্রবন্ধের রচনারীতি এবং বক্তব্যের সঙ্গে চারুপাঠের (১৮৫২) রচনারীতি এবং বক্তব্যের স্পষ্ট মিল আছে।[১২৭] অক্ষয়কুমারের চিন্তপ্রকৃতির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন বিজ্ঞান এবং নীতিব প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। বর্তমান প্রসঙ্গে অপ্রযোজনীয় বলে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল না। 'ব্রহ্মোপসনার আনন্দ' প্রবন্ধটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হওয়াই সম্ভব। সম্ভবত 'পরমেশ্বরের শক্তি এবং দয়া' রচনাটিও তাঁর।

উপরের তালিকার ১১ এবং ১৪ সংখ্যক গদ্যরচনা দুটি ঈশ্বর গুপ্তের বলে মনে করার কারণ আছে। একটা সম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে প্রবন্ধের শিরোনাম ঈশ্বর গুপ্তের অন্য গদ্যরচনাতেও দেখা যায়, যেমন ১৬ই সেপটেম্বর ১৮৫৩র সংবাদ প্রভাকরের একটি রচনায় তিনি নাম দিয়েছিলেন 'এই স্থলে মহাকবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কয়েকটি সঙ্গীত উদ্‌ধৃত করিলাম'[১২৮]। তা ছাড়া দীর্ঘ বাক্য এবং যুক্তিসঙ্গত যতিচিহ্নের অভাব, কয়েকটি বিশেষ ধরনের অনুপ্রাসের প্রতি প্রবণতা প্রভৃতি কয়েকটি লক্ষণেই ঈশ্বর গুপ্তের রচনা চেনা যায়।

'বেদস্বরূপ দধিসমুদ্র মথিত হইয়া যে নবনীত উত্থিত হয়, ঈশ্বরজ্ঞানি সাধু লোকেরা তাহাই ভক্ষণ পূর্ব্বক পরম সন্তোষ সঞ্চয় করিতেছেন, অভিমানি তর্ক-শালি পণ্ডিতেরা অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ শুদ্ধ **ঘোল খাইয়া গোল** করিতেছেন।'

—যথার্থ প্রেম এবং ভক্তিদ্বারা· ·

'যে রূপ **খরতর প্রভাবিশিষ্ট প্রভাকরের**[১২৯] নিকট খদ্যোতের দ্যুতি, ও যেরূপ অগাধ অপার সমুদ্র সমীপে সামান্য জলাশয় ও কূপাদি ও যেরূপ বৃহৎ পৃথিবী সম্বন্ধে তন্মধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র ধূলি কণা পরমাণু, ও যে রূপ ·' —ঐ

'জগদীশ্বর আমারদিগের অন্তঃকরণে যে সমস্ত সৎসংস্কারের বীজ রোপণ করিয়াছেন তদ্দ্বারাই আমরা পৃথিবী মণ্ডলে পশু পক্ষী প্রভৃতি তাবৎ প্রাণি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছি, ঐ সংস্কার বীজ অনুশীলন রূপ বারি সেচনে অঙ্কুর বিশিষ্ট হইলে আমাদিগের বিবেচনা শক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র **রত্নাকরাদি ক্ষুদ্র বৃহৎ শোভাকর ও ভয়ঙ্কর** পদার্থের দ্বারা সেই **নিত্য নিয়ন্তা নিখিল নাথের অসীম মহিমার পরিচয়** ·' —পরোপকার

'···পৃথিবী মণ্ডলে তাঁহার সুখ্যাতি অখণ্ড হয়, সন্তোষ তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ থাকে, এবং তিনি কায়া পরিত্যাগ করিলে দয়াময় পরমেশ্বর তাঁহাকে আপন অনুগ্রহের ছায়ার মধ্যে গ্রহণ করেন।' —ঐ

ঈশ্বর গুপ্তের এই রচনা দুটি দুষ্প্রাপ্য বলে এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত হল।

হিন্দু থিয়ফিলানথ্রপিক সোসাইটির সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের যোগের সংবাদ যথেষ্ট কৌতুহলোদ্দীপক। এই সভা স্থাপনের কয়েক বছর আগে থেকেই তিনি তত্ত্ব-বোধিনী সভার সভ্য হযেছিলেন। সংস্কারমূলক ধর্মচেতনাব সঙ্গে তাঁর যোগ কত ঘনিষ্ঠ ছিল, এই ঘটনা থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

১১ লেক্স লোসি বিরোধী সভা

লর্ড হারডিনজের (১৮৪৪-১৮৪৮) সময়ে এ দেশে একটি আইন প্রবর্তনের চেষ্টা হয়— কোনো ব্যক্তি যদি নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে তবে এই আইনবলে আব সে পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হবে না। হিন্দু এবং মুসলমান দুই ধর্মেই নিযম এই যে যদি কেউ ধর্মান্তর গ্রহণ করে তবে সে পতিত ও মৃতবৎ বলে গণ্য হয়, সে ক্ষেত্রে সে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না। ১৭৭২ সালের ঘোষণা অনুসারে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট হিন্দু এবং মুসলমানের দায়াধিকারে হস্তক্ষেপ করত না। কেউ নিজেব ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান হলে সম্পত্তিব অধিকার তাকে ত্যাগ করতে হত। লর্ড বেণ্টিকের সময়ে বাংলা দেশে লেকস লোসির ব্যবস্থা প্রণীত হযেছিল। লর্ড হাবডিনজের সময়ে ঐ ব্যবস্থা সমস্ত ইংরেজাধিকৃত ভাবতবর্ষেই প্রবতন করার চেষ্টা হয়।

ইংরেজ শাসকদেব উদ্যমেব বিরুদ্ধে কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায অত্যন্ত উত্তেজিত হযে ওঠে। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে এই আন্দোলনে যোগ দিযেছিলেন। তিনি যখন বাইরে ভ্রমণ করতে যেতেন তখনও তিনি নানা লোকের সঙ্গে রাজ-নীতি নিযে আলোচনা করে সচেতন করে তুলবার চেষ্টা করতেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদ কাশী ভ্রমণে যান। ঐ বছরের ১৯এ ডিসেম্বর কলকাতায ফিরে আসেন।[১৩০]

কলকাতায ঈশ্বব গুপ্তেব অনুপস্থিতি কালে লেকস লোসি আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গডে ওঠে। আন্দোলনকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলবাব জন্য পাডায় পাডায কমিটি তৈরি হয। লেকস লোসি বিরোধী আন্দোলনের মূল সভার সম্পাদক ছিলেন হরিমোহন সেন। তাঁর একটি চিঠি সংবাদপ্রভাকরে ছাপা হয।[১৩১] সেই চিঠিখানি—

স্বধর্ম্ম প্রতিপালকাগ্রগণ্য শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদক সমীপেষু। বিহিত সম্বোধনপূর্ব্বক নিবেদনমিদং।

স্বধর্ম পরিত্যাগ করিযা বিধর্মাবলম্বী হইলে পৈতৃক বিষয় প্রাপ্ত হওনের পক্ষে

সংপ্রতি গবর্নমেণ্ট হইতে যে আইন প্রচলিত হইযাছে তাহা পাণ্ডুলেখ্য প্রচার হইলে পর সে আইন প্রচলিত না হয এই প্রার্থনায এতদ্দেশীয হিন্দুবর্গ একত্র হইয়া মহিমাবর শ্রীযুত গববনব জেনাবল বাহাদুরের সমীপে এক আবেদনপত্র প্রদান কবিয়াছিলেন, পবন্তু আমারদের অভাগ্যক্রমে সে প্রার্থনা ফলদাযিকা না হওয়াতে গত ২ জ্যৈষ্ঠ ও বর্তমান মাসেব ষষ্ঠ দিবসে কলিকাতা নগরস্থ ও তৎপার্শ্ব-বর্ত্তি গ্রামবাসি মান্যবর হিন্দু মহাশয়েবদের দুই সভা হয, সেই সভাদ্বযে তদ্বিষযের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা হইযা যাহা ২ ধার্য্য হইযাছে তাহাব লিখিত বিবরণ এতৎপত্র সম্বলিত মহাশয়েব নিকট জেনবল কমিটি অর্থাৎ প্রধান কর্মাধ্যক্ষ মহাশয়েরদের অনুমত্যনুসাবে প্রেরণ করিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ কবিবেন, মহাশযকে উক্ত সভাস্থ সকলে ঐক্যমতে তদুল্লেখিত সব কমিটি অর্থাৎ সহকারি ধর্মাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত কবিযাছেন। প্রার্থনা যে মহাশয তদধ্যক্ষতা কর্মের ভার গ্রহণপূবক আপন পল্লীস্থ আর ২ তৎপদাভিষিক্ত মহাশয়দিগের সহিত একত্র হইযা যাহাতে মহাশযেরদেব প্রতিবাসি ও আত্মীয অন্তরঙ্গ ব্যক্তিরা চাঁদাব পুস্তকে আপন ২ নাম ও স্বেচ্ছামত দাতব্য মুদ্রা স্বাক্ষবিত করেন তাহাতে বিশেষ উদ্যোগী ও যত্নবান হইযা আমাদের দেশেব এই উপস্থিত অমঙ্গল নিরাকরণের চেষ্টা অবশ্য ২ কবিবেন এমত বিষযে বিশেষ অনুরোধ করা প্রয়োজনাভাব নিবেদনমিতি কলিকাতা ১ আষাঢ় ১৭৭২ শকাব্দ।

শ্রীহরিমোহন সেন
সম্পাদক

অতঃপর সভার বিবরণ থেকে দেখা যায নিম্নলিখিত পল্লীকমিটি এবং প্রতি কমিটিতে কযেকজন সহকারী অধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন।—

১। বাগবাজাব ও শ্যামবাজার ৪ জন সহাধ্যক্ষ।

২। শোভাবাজার ও শ্যামপুকুর ৭ জন সহাধ্যক্ষ এতে রাজা রাধাকান্ত দেব এবং গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ছিলেন।

৩। হাটখোলা ও কুমারটুলি ৪ জন সহাধ্যক্ষ।

৪। নীমতলা ও আহিরিটোলা ৪ জন সহাধ্যক্ষ।

৫। সিমুলিয়া ও আড়পুলি ৭ জন সহাধ্যক্ষ। তাঁরা ছিলেন রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায, আশুতোষ দেব, দয়ালচাঁদ মিত্র, মহেশচন্দ্র দাস, রাধানাথ দত্ত, কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত**।

৬। পাতুরেঘাটা ও যোড়বাগান ৪ জন সহাধ্যক্ষ।

৭। যোড়াসাঁকো ও মেছুয়াবাজার ৬ জন সহাধ্যক্ষ। এতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রমানাথ ঠাকুরও ছিলেন।

৮। বড়বাজার ও আমড়াতলা ৭ জন সহাধ্যক্ষ। এতে ছিলেন রামসেবক মল্লিক।

৯। বহুবাজার ও মলঙ্গা ৪ জন সহাধ্যক্ষ।

১০। জানবাজার ও ইটালী ৩ জন সহাধ্যক্ষ।

১১। ঠনঠনিয়া ও কলুটোলা ৬ জন সহাধ্যক্ষ। এতে ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র সেন।

ঈশ্বর গুপ্ত এই সময়ে কলকাতায় ছিলেন না বটে। কিন্তু বিদেশে থেকেও তিনি এ বিষয়ে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পরে লিখেছিলেন।[১৩২]

'আমরা ক্রমশঃ এক বৎসর ঐ প্রদেশে ভ্রমণান্তর নানা লোকের সহিত আলাপ করত নানা বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া দেখিয়াছি ঐ সকল বিষয়ে অনুশীলন করা দূরে থাকুক তাঁহারা কোনরূপে কোন বিষয়েরি মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারেন না। আমরা বিধিমত যত্ন চেষ্টা এবং পরিশ্রম করিয়া হিন্দুস্থানি কোন ব্যক্তিকেই "লেকসলোসি" এবং "চার্টর" এই দুই বিষয়েরই অর্থ কি? ও দোষ গুণ কি? তাহা বুঝাইয়া দিতে পারি নাই, বাক্যব্যয় করিতে সহজেও হারি নাই, শেষ নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই নীরব হইলাম।'

কলকাতায় এই আন্দোলনের জন্য যে সভা স্থাপিত হয়েছিল সে-সভা থেকে একটি আবেদন পত্র বিলাতে পাঠানো হয়েছিলন। কেন বলতে পারি না ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যেরা তাতে স্বাক্ষর করে নি। চাঁদা দিয়েও সাহায্য করে নি। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন,[১৩৩] 'ব্রাহ্ম সভার মহাশয়েরা তাহাতে বিরত হইয়া উত্তম কর্ম্ম করেন নাই।'

শোনা গিয়েছিল বিলাতের কমনসসভায় ব্রাইট এই আবেদনের পক্ষে বলবেন,[১৩৪] কিন্তু সম্ভবত শেষ পর্যন্ত এই আইন রদ হয় নি।

১২ গৌরীপুরে শিক্ষকতা?

৭ই নভেম্বর ১৮৫৩-র সংবাদপ্রভাকরে শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্ম চৌধুরী নাটোরের নিকটবর্তী হালশা থেকে একটি চিঠি লেখেন গৌরীপুরের পাঠশালার বিষয়ে। সেই চিঠিটিতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উল্লেখ আছে। তিনি গৌরীপুর ছাত্র পাঠশালায় কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিলেন। পত্রলেখক সেখানে তাঁর

ছিলেন। ইনি সংবাদপ্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিনা বোঝা যাচ্ছে না। পত্রটিতে তাঁর পরিচয়জ্ঞাপক কোনো কথা নেই। প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে উদ্ধৃত করলাম—

'কিয়দ্দিবস হইল এখানকার বোকাইনগর মোকামে গবর্নমেণ্ট দ্বারা এক বঙ্গ পাঠশালা হইয়া পাঁচ সাতজনের অধিক ছাত্র সংগ্রহ না হইবায় বিদ্যাল্লতাবৎ স্থিত থাকিয়া তন্নিকটস্থ গৌরীপুর মোকামে ঐ পাঠশালা প্রকাশ ছিল আমিও ঐ পাঠশালার এক ছাত্র ছিলাম তাহাতে দৃষ্ট আছে যে উক্ত পাঠশালার তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় ছাত্রদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন ও পুস্তক ও পাঠশালার মাসিক নিয়ম ইত্যাদি অর্থাৎ কেবল পঠনীয় পরিশ্রমের মূল্য দেন নাই, সময়ানুসারে ছাত্রদিগের আসায় গতায়াতের নৌকার খরচ এ সকল বিতরণেও পাঠশালা স্থায়ি হইল না, যদ্যপিও অধিক চেষ্টায় অন্যান্য সময় পাঠশালাতে ছাত্র থাকিত কিন্তু শ্রাবণ মাসে এ এ দেশে শ্রাবণীয় ব্রতের আধিক্যতা প্রযুক্ত প্রায় এককালে পাঠশালা পাতিত হইত, আমারদিগের শিক্ষক শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অত্র দেশস্থ লোকের বিদ্যাবিষয়ে এতাদৃক্ উৎসাহ দৃষ্ট করিয়া আবহাওয়া অবরদাস্ত আপত্যে এখানকার শিক্ষকীয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন…'

এই পত্র প্রসঙ্গে সম্পাদক কোনো মন্তব্য করেন নি। উল্লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অভিন্ন কিনা বোঝবার উপায় নেই। বরং এমন অনুমানও করা চলে যে সম্পাদকের যখন কোনো বিপরীত মন্তব্য নেই তখন তাঁরা অভিন্নই।

কিন্তু এ সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা যায় না। ঈশ্বর গুপ্ত অন্য কোথাও কখনও শিক্ষকতা করেছেন, এ রকম কোনো জনশ্রুতি নেই, বঙ্কিমচন্দ্রও কিছু উল্লেখ করেন নি। এই ঘটনার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে এইটুকুই বলা বলে যে হয়তো ভ্রমণ উপলক্ষে ঈশ্বর গুপ্ত যখন গৌরীপুরে কিছুদিন ছিলেন সেই সময়ে এই পাঠশালায় ইচ্ছাক্রমে শিক্ষকতা (সম্ভবত অবৈতনিক) করে থাকবেন। তা হলেও এই ঘটনা নিশ্চয়ই ১৮৫৩-র নয়। কারণ পত্রলেখক যখন চিঠি লিখছেন তার বেশ কিছুদিন আগে তিনি ঐ পাঠশালার ছাত্র ছিলেন বলে লিখেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত ইতিপূর্বে ১৮৪৬ এবং ১৮৪৮-এ উত্তরবঙ্গ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। শিক্ষকতা যদি তিনি করেই থাকেন, তবে এর কোনো এক বারে করে থাকবেন।

১৩. বেহালা হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা ১৮৫৪

বেহালার হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই সভার উন্নতি বিধান করবার জন্য যাঁদের উপদেশ ও পরামর্শ নেওয়া স্থির হয়, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁদের অন্যতম। প্রথম দিকে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা হলেও পরে তাঁকে সম্ভবত বাদ দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে একটি চিঠি সংবাদপ্রভাকরে বেরিয়েছিল।[১৩৫] এই চিঠির শেষে একটি পদ্যও ছিল। চিঠি এবং পদ্যের লেখক 'অহং বেহালার পোড়ারমুখো'। এই ধরনের ছদ্মনাম ঈশ্বর গুপ্ত নিজেই অনেক সুপরিচিত কবিতায় ব্যবহার করেছেন; যেমন 'অহং পেটুক', 'অহং বিরক্ত', 'অহং কালজয়ী', 'অহং প্রাকারিক'। এই চিঠিখানা ছদ্মনামে ঈশ্বর গুপ্তই লিখেছিলেন কিনা বলা যায় না—

'পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করিবেন যে সময়ে 'হরিভক্তিপ্রদায়িনী' সভার সূত্রপাত হয় সেই কালীন সভাস্থ সকলে এমত ধার্য করিয়াছিলেন যে তাঁহারা ঐ সভার উন্নতি জন্য সংবাদপ্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কে সাহায্যার্থে অনুরোধ করিবেন, কিয়দ্দিবসান্তে এই অভিপ্রায় গুপ্ত মহাশয়ের নিকট প্রকাশ করিলে পর তিনি উক্ত বিষয়ে নানা প্রকার সদাভাস প্রকা…য়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সভা…কাণ ফুটিয়াছে, হাত পা হই…টার পো কি আর চ্যাটায়… ঈশ্বরের সাহায্যের অপে ..অথবা তাহার গুণ কীর্ত্ত ..বিরত ব্রত থাকিবে,… ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়দ্বয় সভায় সমাগত হইলে সভার কি চমৎকার শোভাবৃদ্ধি হইত, এ বিষয়ে অদ্য এই পর্যন্ত লিখিলাম, যে কারণ হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা সম্পাদক গুপ্ত মহশয়কে আহ্বান না করিয়া তাঁহার প্রতি অতি অকৃতজ্ঞতা ও অজ্ঞতা দর্শাইয়াছেন।

পয়ার

অবিরত পাঠ যথা ভগবৎ স্মৃতি।
কি রূপে হইল তথা ঈশ্বরে বিস্মৃতি॥
সবার সভার আদি হন যেই জন।
এ কি গো কবার কথা তারে বিসর্জন॥
শঙ্করের গুরু যেই অহমিকাহীন।
রঙ্গ করে ভুলে তায় কতগুলা হীন॥

যাঁহার দৃষ্টিতে দৃষ্টি নাহি ভাবে মনে।
তাহার হইলে রিষ্টি বাহিবে কেমনে॥
ঈশ্বর উদ্দেশ্য যথা, সভা বলি তারে।
যার তার নাহি তায় ধিক তার তারে॥
সকল কল্যাণ হেতু প্রভাকর কার।
উপকার করে তাঁর সাধ্য আছে কার॥
লোভ নাই ক্ষোভ নাই জ্ঞানের আধার।
কে পারে শুধিতে তাঁর এক ধার দ্বার॥
যে করে তাঁহারে ধ্যান সেই তাঁয় পায়।
সে ধন পাইতে ধন নহে যে উপায়॥
প্রয়াস তাঁহার যিনি তিনি তার প্রতি।
কোন্ তুচ্ছ তার কাছে শতেক ভূপতি॥
গাড়ি ঘোড়া জামা যোড়া নাহি তিনি চান
সবার সভাব প্রতি সমভাবে চান॥
হেন জনে আবাহনে কিবা ছিল ভয়।
যাঁহার স্মরণে হয় সতত অভয়॥
বেঁচে যেত গাড়ি ভাড়া না হইত দায়।
ব্যয় করে কত টাকা হতেন বিদায়॥
অহং বেহালার পোড়ারমুখো।

ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুতে বেহালা হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার সম্পাদক গুরুদয়াল রায় শোক প্রকাশ করে গদ্যেপদ্যে মেশানো একটি পত্র সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশ করেন।[১৩৩]

কবির দলে

ঈশ্বর গুপ্ত বাল্যকালে কবিগানের পরিবেশেই লালিত এবং অভ্যস্ত হয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা বিশেষভাবে বলেছেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে জননীর মৃত্যুর পর ঈশ্বর গুপ্ত কলকাতায় মাতুলালয়ে বাস করতে থাকেন। এখানে এসেও তিনি কবিগানের চর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়িতে মহেশচন্দ্র নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রায়ই মুখে মুখে কবিতাযুদ্ধ হত। বাল্যকালের এই অভ্যাস ঈশ্বর গুপ্ত সারা জীবনেও বর্জন করতে পারেন নি যদিও ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কবিগানের

আদর একেবারেই লুপ্ত হয়েছিল এবং যদিও তিনি এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে শহরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এই কবিগান-প্রীতিতেই ছিল ঈশ্বর গুপ্ত এবং প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত এ-কথা আগেই বলা হয়েছে।

ঈশ্বর গুপ্ত যখন কলকাতায় আসেন তখন উত্তর কলকাতায় আখড়াই ও অন্যান্য কবিসঙ্গীতের যথেষ্ট প্রসার। তিনজন প্রধান সঙ্গীতরচয়িতা রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯), হরু ঠাকুর (১৭৪৯-১৮২৪) এবং রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮) এই সময়ে জীবিত। উত্তর কলকাতায় বিশেষত পাথুরিয়াঘাটা, শোভাবাজার, বাগবাজার, যোড়াসাঁকো, বড়বাজার প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকগুলি আখড়াই ও কবির দল গড়ে ওঠে।[১৩৭] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ঈশ্বর গুপ্তের মাতুলালয়ের সঙ্গে পরিচিত পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরপরিবার কবিগানের এক প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই পরিবারের যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে সংবাদপ্রভাকর পত্রিকা প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যে আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। নিধুবাবুর শিষ্য মোহনচাঁদ বসু ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হাফ-আখড়াই সঙ্গীতের প্রবর্তন করেন।[১৩৮]

এই সব বিভিন্ন দলে ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকার স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটা এই সময়ের হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই বর্ণনা কতদূর নির্ভরযোগ্য তা বলা যায় না—

'সভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে নিধুবাবুকে দিয়া একটি নূতন ধরনের দল প্রস্তুত করাইলেন। একটি সভাবাজারে, অন্যটি বাগবাজারে। দলের মধ্যে বিশেষ প্রতিভা কাহারও ভাগ্যে ফুটিয়া উঠিল না। কেবল মোহনচাঁদ বসু নামে একটি বালক দিন দিন প্রতিভার পরিচয় দিতে লাগিল। রামনিধি গুপ্ত কেবল তাহারই উপর আশা স্থাপন করিয়া রাজাবাহাদুরের তাপিত হৃদয়ে শান্তিবারির অভিষেক করিতে লাগিলেন। রচয়িতার অভাব হইল না ; বাণীর বরপুত্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সভাবাজারের দলে প্রবেশ করিলেন। কমলার বরপুত্রের পদসেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। যোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটা হইতে তাঁহার 'প্রভাকর' পত্রে শ্লেষ ও ব্যঙ্গময় প্রবন্ধাদি লেখা চলিতে লাগিল। তিনিও "কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর। যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর ॥" ইত্যাদি কবিতা লিখিয়া নিজের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করিতে লাগিলেন।'[১৩৯]

কিন্তু এবারেও নিধুবাবু, ঈশ্বর গুপ্ত এবং মোহনচাঁদ থাকা সত্ত্বেও শোভাবাজার দল পাথুরিয়াঘাটার রামচাঁদবাবুর দলের কাছে পরাজিত হয়। উত্তর শেষ হলে জয়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে নিধুবাবু চলে গেলেন। ঈশ্বর গুপ্ত রীতি ভঙ্গ করলেন এবং মান প্রভৃতি আর গাইলেন না। সখীসম্বাদের পর একেবারে খেউড়ের অবতারণা করে বসলেন।

গঙ্গাচরণের এই সঙ্গীতসংগ্রামের বর্ণনার উৎস কোথায় বলা যায় না। এর মধ্যে কয়েকটি অসঙ্গতি আছে। লেখকের মতে রাজা রাজকৃষ্ণ যখন কবির দল গঠন করেন তখন ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদপ্রভাকর প্রচারিত। কিন্তু রাজকৃষ্ণের মৃত্যু বস্তুত ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ আগস্ট[১৪০]; সে সময় ঈশ্বর গুপ্ত এগারো বৎসরের বালক, কলকাতায় বাস করবার জন্য সদ্য এসেছেন মাত্র। গঙ্গাচরণের বর্ণনায় আরও দেখা যায় মোহনচাঁদ বসু তখন বালক, তাঁর প্রতিভা বিকাশোন্মুখ মাত্র। অথচ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি যখন হাফআখড়াই সঙ্গীতের প্রবর্তন করলেন তখন তিনি পূর্ণপ্রতিভাসম্পন্ন।[১৪১] গঙ্গাচরণের মতে 'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর'…প্রভৃতি এই উপলক্ষে লিখিত। কিন্তু 'বাঙ্গালীর গান'-এ দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন[১৪২]—

'এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়। তিনি সেই অমূলক সংবাদ উপলক্ষ করিয়া প্রভাকরে একটি কবিতা লিখিযাছিলেন।

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।'

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদ রত্নাবলী পত্রিকা সম্পাদনা ত্যাগ করে ঈশ্বর গুপ্ত কটকে চলে যান। ১৮৩৬-এ তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। এই সময় থেকে ঈশ্বর গুপ্ত অভিজাত সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। সেই সময়েও কলকাতায় কবি-গানের যথেষ্ট প্রচলন ছিল যদিও ইংরেজিশিক্ষিত আধুনিক মনোভাবাপন্ন সমাজ কবিগানের রুচিকে ভালো চোখে দেখে নি।

নব্যশিক্ষিতরা যে কবিগান পছন্দ করত না তার সাক্ষ্য আছে নব্যবঙ্গের মুখপত্রে—

> It is said that the idol is pleased to hear the vulgar expressions used in Kubees and other hateful songs and that in the presence of the females.[১৪৩]

এই সময়েও ঈশ্বর গুপ্ত কবিগানে সমান ভাবেই উৎসাহী ছিলেন। ১৮৪৩-

এর কাছাকাছি সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে কবি রঙ্গলালের পরিচয় হয়।[১৪৪] রঙ্গলালের বয়স তখন ষোলো বৎসর। সম্ভবত ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবেই রঙ্গলাল কবিগান রচনায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন—

'রঙ্গলাল গুপ্তকবির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হওয়ায় কলিকাতার অভিজাত-সম্প্রদায়ের অনেকেরই স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তরুণ বয়সেই তাঁহার অপূর্ব সঙ্গীতরচনাশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ছাতুবাবু ও লাটুবাবু রঙ্গলালকে তাঁহাদের কবির দলের 'কবি' নিযুক্ত করিলেন।'[১৪৫]

কবিসঙ্গীত রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের কতখানি উৎসাহ ছিল তার আর-একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রমাণ আছে। ১৮৪৯-৫০এ ঈশ্বর গুপ্ত উত্তরভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে সংবাদপ্রভাকরে তিনি লিখলেন[১৪৬]—

'এক বৎসর অতীত হইল আমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম, সংপ্রতি দুই দিবস হইল শ্রীশ্রী ৺ বারাণস্যাদি ধাম দর্শন করণান্তর কলিকাতা মহানগরে প্রত্যাগত হইয়াছি।'

এই ভ্রমণের সময় তিনি যখন কাশীতে ছিলেন, তখন সেখানে কবি মনোমোহন বসুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মনোমোহন বসুর মৃত্যুতে হিতবাদীতে যে-শোকসংবাদ প্রকাশিত হয় তাতে কাশীতে হাফআখড়াইয়ের আসরের কথা আছে—

'শুনিতে পাই, একবার কাশীধামে হাফআখড়াইয়ের আসরে গুরুশিষ্যে দ্বন্দ্ব হইয়াছিল। মনোমোহন নিজগুরু কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত গীতিরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাশীর হাফআখড়াইয়ে 'শিষ্যাবিদ্যাই গরীয়সী' হইয়াছিল। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মনোমোহনের গুণপনায় এরূপ প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সেই সঙ্গীতক্ষেত্রে স্বয়ং হারি মানিয়া শিষ্যের গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন।'[১৪৭]

মনোমোহন বসু তাঁর অপ্রকাশিত ডায়ারিতে (তারিখ ২৩শে মাঘ, ১২৯৪) বলেছেন তিনি ৩৮ বৎসর পূর্বে কাশীতে আসেন।[১৪৮] সুতরাং সেটা ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। স্পষ্টতই ঈশ্বর গুপ্ত এবং মনোমোহন বসুর কাশীতে সাক্ষাৎকার এবং হাফআখড়াই এই সময়েরই ঘটনা।

যদিও ইংরেজিশিক্ষিত সমাজ কবিগানের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছে[১৪৯] ১৮৫০ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে দক্ষিণ কলকাতাতেও হাফআখড়াইয়ের কয়েকটি দল গড়ে ওঠে। অবশ্য আখড়াই গানের চর্চা ১৮৩২-এ হাফআখড়াইয়ের উদ্ভবের সময় থেকেই ক্ষয় পেয়ে অবশেষে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে

কবিগান বলতে হাফআখড়াইকেই বোঝাত। এরকম কয়েকটি দলের মধ্যে অন্যতম ছিল কালীঘাট এবং ভবানীপুরের দল। ১২৮৪ সালে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রাচীন কবিসংগ্রহ' প্রকাশ করেন। তার ভূমিকায় তিনি ভবানীপুর এবং কালীঘাটের দলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। ভবানীপুরের রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দল গঠন করেন। সেই সময় কালীঘাটের দল গঠন করেন হরলাল হালদার, ঈশ্বরচন্দ্র হালদার, কালীচন্দ্র হালদার এবং গঙ্গাকান্ত হালদার। এই ভবানীপুর এবং কালীঘাটের দলের গাহনা হয় রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। ভবানীপুরে দ্বিতীয়বার দল গঠন করে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই রাজনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদের সঙ্গে কালীঘাটের দলের গাহনা হয় দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের বাড়িতে। অতঃপর তৃতীয়বার ভবানীপুরের দল গঠিত করেন জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি গান রচনা করতেন, সুর দিতেন মথুরামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান গায়ক। মথুরামোহন মোহনচাঁদের মতোই বিখ্যাত সুরস্রষ্টা ছিলেন। ভবানীপুরের চতুর্থবার দল গঠন করেন বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ রায়চৌধুরী, শ্রীমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং 'প্রাচীন কবি সংগ্রহ'-কার গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঈশ্বর গুপ্ত কালীঘাট এবং ভবানীপুর দুই দলের গান রচনা করেছেন। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত ভবানীপুরের দলে হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নেই বটে, তবে তারও একটি দল সেখানে ছিল। এই দলে ঈশ্বর গুপ্ত অন্তত তিনটি গান রচনা করেছিলেন। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

'১২৫৪ সাল হইতে ১২৬১ সাল পর্যন্ত ক্রমে হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে শারদীয় পূজার সময় উভয় দলের গহনা হয়।'

এই উক্তি থেকে ভবানীপুরে ঈশ্বর গুপ্তের গান রচনা করার একটা সময় মোটামুটি আন্দাজ করা যায়, অর্থাৎ ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৪-এর মধ্যে। ১৮৫৪-এর বাইশে নভেম্বরের সংবাদপ্রভাকর পত্রে বাগবাজার এবং যোড়াসাঁকো দলের মধ্যে হাফআখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের বর্ণনা দিয়ে দুটি পত্র প্রকাশিত হয়।[১০০] দ্বিতীয় পত্রটি থেকে বুঝতে পারা যায় বাগবাজার দলের বাঁধনদার ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত।—

'রচকের নাম প্রকাশ নাই, গুপ্ত কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় গুপ্ত ও অগুপ্ত এবং সুর-দাতার নাম যদিও লুপ্ত কিন্তু মোহনসুরে চিত্ত মোহিত হওয়াতে সকলেই মোহন মোহন শব্দোচ্চারণ করিয়াছেন…'

বুঝতে পারা যাচ্ছে কবি ঈশ্বর গুপ্ত বাল্যকাল থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত কবিগানের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। নীচে ঈশ্বর গুপ্ত-রচিত দলের নাম সহ হাফ-আখড়াই সঙ্গীতের একটি তালিকা দিলাম। তালিকাটি প্রাচীন কবিসংগ্রহ ১২৮৪, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংগৃহীত গুপ্তরত্নোদ্ধার ১৩০১ এবং অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গীতবত্নমালা ১৩০৩ মিলিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে।[১৫১] বলা বাহুল্য এ ছাডাও ঈশ্বর গুপ্তের নিশ্চয়ই আবও বহু গান আছে, কিন্তু দল কিংবা সময় কিছু জানা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রেব সংগ্রহে নীলকর বিষয়ে প্রথম এবং দ্বিতীয় গীত দুটি 'কবির সুরে' রচিত।[১৫২] এর বচনার সময় মোটামুটি অনুমান করা যায় অর্থাৎ ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৮র মধ্যে। কিন্তু বিশেষ দলে গাওয়া হয়েছিল কিনা বলা কঠিন।

কালীঘাটের সখেব দলে গীত—

১। সলিলে কমল হয় সৈ। সদা সবে কয়

গীতরত্নমালা, পৃ ৫৬৪, গুপ্তরত্নোদ্ধার পৃ ২৪৭ ; ভবানীপুর নিবাসী ৺পার্বতী চরণ চক্রবর্তীব বাটীতে কালীঘাটের দলে গীত ৺মোহনচাঁদ বসুর সুর ; প্রাচীন কবি সংগ্রহ পৃ ১২৬, 'রাসলীলা'।

২। যতনে মন প্রাণ তোমায় দান করেছি, লো প্রাণ

গুপ্তরত্নোদ্ধার পৃ ২৫১, কালীঘাট নিবাসী মথুরামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুর ; প্রাচীন কবি সংগ্রহ পৃ ১৪৪।

৩। এই দশা ঘটিল ক্রোধে শ্রীরাধার

প্রাচীনকবিসংগ্রহ পৃ ১৫৬, নেপাউ ভট্টাচার্যের বাড়িতে ভবানীপুরের দলে গীত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরতার উত্তরে কালীঘাটের দলে গীত ঈশ্বর গুপ্তের উত্তর।

ভবানীপুবে হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে গীত—

১। এ দানি এ দানী সৈ! কে গো ঐ? আহা মবে যাই

গীতরত্নমালা পৃ ৫৫৯ ; গুপ্তরত্নোদ্ধার পৃ ২৪৯, রামকৃষ্ণপুরে ভবানীপুরের দলে গীত, ৺মোহন চাঁদ বসুর গীত ; প্রাচীন কবিসংগ্রহ পৃ ১৩৫

২। বঞ্চিতা করে আমারে কালাচাঁদ জুড়ালে

গীতরত্নমালা পৃ ৫৯৫ ; গুপ্তরত্নোদ্ধার পৃ ২৫০ ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের দলে গীত, মোহনচাঁদ বসুর সুর ; প্রাচীন কবিসংগ্রহ পৃ ১৩৭

৩। শ্রীকৃষ্ণের আশায় হয়ে নিরাশায়

গীতরত্নমালা পৃ ৬৬২ ; গুপ্তরত্নোদ্ধার পৃ ২৪৮, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে গীত, মোহনচাঁদ বসুর সুব ; প্রাচীন কবিসংগ্রহ পৃ ১৩৪।

রসময় বসুর দলে গীত—

১। ভানু উদযে নন্দালয়ে শ্রীদাম যায

গীতরত্নমালা পৃ ৫৫৯

২। নিশি সুপ্রভাতে বাখালগণ, ঐ নন্দালয

গীতরত্নমালা পৃ ৫৫৪

উদয়চাঁদ দাসের দল—

১। কুঞ্জে শ্রীবাধার ধরে পদে, পদে ২ রসময়

গীতরত্নমালা পৃ ৫৮৮

২। কৃষ্ণ দেখে তোমাব এ দুর্দশা ভগ্নদশা প্রাণ

গীতরত্নমালা পৃ ৫৮৯

ভ্রমণকাবী বন্ধু

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'শেষ অবস্থায ঈশ্ববচন্দ্রেব দেশ পর্যটনে বিশেষ অনুরাগ জন্মে'। অন্তত ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই যে তিনি ভ্রমণে বের হতেন। তার প্রমাণ এখনও পর্যন্ত সংরক্ষিত সংবাদপ্রভাকব পত্রিকা থেকেই পাওয়া যায়। সংবাদপ্রভাকরে 'ভ্রমণকারি বন্ধুর' পত্রে নাম দিয়ে তাঁব ভ্রমণের বৃত্তান্ত তিনি প্রকাশ করতেন। 'ভ্রমণকারি বন্ধু' যে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই—এ বিষয়ে সংশয়েব বিশেষ অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র বর্তমান জীবনচরিতে ঈশ্বর গুপ্তের ভ্রমণের যে যে স্থলের উল্লেখ করেছেন, সেই সব স্থলের বিবরণই এই সব পত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর ভ্রমণের বিশেষত্ব ছিল। তিনি শুধু দেশভ্রমণের আনন্দেই ভ্রমণ করতেন না। তাঁর উদ্দেশ্য থাকত শিক্ষা ধর্ম রীতি নীতি ইত্যাদির প্রসার পর্যবেক্ষণ করা। কলকাতার শিক্ষালয় থেকে যাঁরা শিক্ষা লাভ করে বাইরে নানা কর্মে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা কিভাবে সামাজিক অগ্রগতির সহায়তা করছেন, সেইটি দেখতেই ঈশ্বর গুপ্তের ছিল বিশেষ ঔৎসুক্য। তাঁর আর একটি ঔৎসুক্যের বিষয় ছিল বাংলা শিক্ষার প্রসার লক্ষ্য করা। বস্তুত তিনি নিজের ব্যক্তিগত

ভালোমন্দ বা সুবিধা-অসুবিধার কথা বলেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনচরিতে যে সামান্য বলেছেন সেটা অন্য সূত্রে তিনি জেনেছিলেন মনে হয়। ইংরেজের নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থায় লোকজীবনে কতখানি অগ্রগতি এসেছে, সেটাই ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণের বিষয়। প্রসঙ্গত তিনি কবিতাও রচনা করেছেন। তাতে তাঁর ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭-এ জুনের সংবাদপ্রভাকরে 'ভ্রমণকারি বন্ধু' লিখছেন—

'দুই বৎসব হইল আমি ভ্রমণচ্ছলে রাজশাহীপ্রদেশে আগমন করিয়াছিলাম, সংপ্রতি পুনরাগমন পূর্বক পূর্বাবস্থার সহিত বর্তমানাবস্থার অনেক বৈলক্ষণ্য দেখিলাম।'

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দেরই ২৭-এ জুলাইতে দেখি—

'সম্পাদক মহাশয়, আপনার স্মরণ থাকিতে পারে ১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসে আমি নৌকাযোগে জলপথে ভ্রমণকালীন রঙ্গপুর স্কুলের সংক্ষেপ বিবরণ বর্ণনা পূর্বক আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, আপনি তদবিকল প্রকটন পুরঃসর পাঠকগণের সুগোচব করিযাছিলেন…'

এর থেকে স্পষ্টতই বুঝতে পারা যাচ্ছে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বর গুপ্ত একবার উত্তরবঙ্গ ভ্রমণে বেরিযেছিলেন।[৫৩] ১৮৪৮-এর ২৩-এ জুন থেকে দ্বিতীয়বারের যাত্রায তাঁর মুরশিদাবাদের অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। এই পত্রে এই জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অতি উচ্চপ্রশংসা আছে। প্রসঙ্গত বলা হয়েছে—

'প্রজাগণের প্রার্থনা যে নবীনবাবু মাজিষ্ট্রেটি পদের পরিপূর্ণ পরাক্রম প্রাপ্ত হইয়া উক্তস্থানে চিরকাল প্রভুত্ব করেন, বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উল্লেখিত কর্মে যদ্রূপ যশস্বী হইযাছিলেন নবীনবাবু সকল বিষয়েই অবিকল তদনুরূপ অনুরাগসংগ্রহ করিয়াছেন, বরং ভবিষ্যতে কোন ২ বিষয়ে অধিক প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হওনের সম্ভাবনা আছে, আমি ছদ্মভাবে ছল করিয়া অনেকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে অতি সামান্য ইতর লোকেরাও কথিত বাবুকে মনের সহিত সুখ্যাতি করিল।'[৫৪]

তখন নবীনচন্দ্রের বয়স '২৩ বৎসরের অধিক নহে'।

মুরশিদাবাদ থেকে তিনি যান রাজশাহী। ২৭-এ জুন ১৮৪৮-এর সংবাদ-প্রভাকরে তিনি এখানকার অভিজ্ঞতা লিখে পাঠিয়েছেন। এখানে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ঈশ্বর গুপ্ত বিশেষ করে দুজনের নাম করেন, লোকনাথ মৈত্র এবং কিশোরী-

চাঁদ মিত্র। লোকনাথ মৈত্র মাসিক পঁচিশ টাকা ব্যয় করে একটি পাঠশালা চালান—

'অতএব এমত ভয়ঙ্কর দেশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক অহরহ অসভ্য সমাজে অবস্থান করত বাবু লোকনাথ মৈত্র মহাশয় যখন বিদ্যা বিতরণ বিষয়ে এতদ্রূপ অনুরাগী হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে কিরূপ প্রশংসা করিতে হইবেক তাহা সুধীজনেরা বিবেচনা করুন। উক্ত বাবুর এমত প্রতিজ্ঞা যে ইহাতে অপর ব্যক্তির কিছুমাত্র সাহায্য গ্রহণ করিবেন না, ঐ বিদ্যালয়ের উত্তর ২ যে পরিমাণে উন্নতি হইবেক সেই পরিমাণে স্বয়ং আনুকূল্য করণে স্বীকৃত হইয়াছেন, সুতরাং এতৎ মহদভিপ্রায় জন্য তাবতেই তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিবেন।

সংপ্রতি আমি এ বিষয়ের নিমিত্ত কেবল কিশোরীচাঁদ বাবুকে অধিক প্রশংসা করিব, কেননা তিনিই ইহার প্রধানোদ্‌যোগী...'[১৫৫]

কিশোরীচাঁদের উদ্যোগেই সেখানকার স্কুলগৃহে একটি বিতর্কসভা স্থাপিত হয়েছে। সভায় ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই আলোচনা চলত। সভ্যদের মধ্যে হুগলি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অনকবিনেণ্ট এসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর বাবু নীলমণি বশাখ[১৫৬] এবং তদনুজ সদ্বিদ্বান্ বাবু কমলকান্ত বশাখ প্রভৃতির নাম আছে।

২৮-এ জুনের সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত পত্র[১৫৭] বহরমপুর থেকে লেখা। এতে লেখকের বিশেষ কোনো সংবাদ দেওয়া নেই, কিছু ব্যক্তিগত খবর আছে—

'প্রিয় সম্পাদক! আমি শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে সমীরণ সেবনার্থ নৌকারোহন পূর্ব্বক জলপথে ভ্রমণ করিতেছি, কলিকাতা পরিত্যাগ পুরঃসর যত উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিতেছি ততই দেহ গেহে বলদেবের আবির্ভাব হইতেছে।'

২৪-এ জুলাইএর পত্রটি লেখক লিখেছেন বগুড়া থেকে। পত্রের নীচে তারিখ অথবা উল্লেখ নেই কিন্তু বক্তব্য থেকে বোঝা যায় ১৭ই আষাঢ় অর্থাৎ ২৯-এ জুন ১৮৪৮-এ করতোয়া এবং নাগর নদীর সঙ্গমে পৌঁছে ১৮ই অর্থাৎ ৩০-এ জুন বগুড়ায় উপস্থিত হন। এখানে এসে তিনি খুসি হন—

'কারণ তথাকার জলবাতাস অতি উত্তম এবং পথঘাট সকলি ভাল, বাজারে উত্তমরূপ মিষ্টান্ন ব্যতীত সকল প্রকার খাদ্য ও ব্যবহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাজারে হিন্দুস্থানি মহাজনেরদের কুঠি ও দোকান কয়েকটা পাকা আছে, ঐ স্থান

হইতে রামপুর, রঙ্গপুর এবং দিনাজপুর গমনার্থ গবর্নমেণ্ট কর্তৃক ভিন্ন ২ তিন পাকা রাস্তা নির্মিত হইয়াছে।'

এখানকার রাজকর্মচারীদেরও লেখক প্রশংসা করেন। ঈশ্বর গুপ্ত এখানে দুটি পাঠশালা দেখেছিলেন। প্রথম শ্রেণীর পাঠশালা শেরপুরে। ঈশ্বর গুপ্ত প্রথম দিনই অর্থাৎ ১৮ই আষাঢ় শেরপুরের পাঠশালায় গিয়ে ছাত্রদের পরীক্ষা করেন। পবীক্ষায় তিনি সন্তুষ্ট হন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এই পাঠশালাটি স্থাপিত হয়। স্বল্পকালে স্থাপিত এই পাঠশালাটির উন্নতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেও তিনি লিখেছেন—

'এই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব পাঠশালার উন্নতি কল্পে অত্যন্ত মনোযোগী, তিনি অনেক সাহায্য কবিয়া থাকেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে গবর্নমেণ্ট এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা বিষযে কিছুমাত্র অনুরাগ প্রকাশ করেন না·· আমারদিগের গবর্নমেণ্ট সদর রিবিনিউ বোর্ডের কর্তা সাহেবদিগের হস্তে এতদ্বিষয়ের কর্তৃত্বভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা ভাব গ্রহণ করিয়াও ভারির ন্যায় কর্ম্ম করেন না।"

পরবর্তী ২৫ জুলাই ১৮৪৮-এর প্রকাশিত পত্র বগুডার বিখ্যাত শহর শেরপুর সম্বন্ধে নানা বিবরণ সম্বলিত। প্রসঙ্গত লেখক শেবপুরের বিখ্যাত ধনী মাধবচন্দ্র সান্যালের[১৫৮] উল্লেখ করেছেন। বগুড়ার সম্বন্ধে তিনি পৌরাণিক কিংবদন্তীরও অবতারণা করেছেন।—

'এই দেশ পাণ্ডববর্জিত দেশ কি না? এই বলিয়া অত্যন্ত বিবাদ হয়, কেহ ২ কহেন পাণ্ডবেরা করতোয়া নদীর উভয় পারস্থ গ্রাম ও গহন প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, কেহ ২ কহেন তাঁহারা উক্ত নদীর পশ্চিম ভাগে আসিয়াছিলেন, পূর্বভাগে আসেন নাই···ফলতঃ মহাকবি বেদব্যাসের লিখিত ভারতের সহিত যুক্তির ঐক্য করিলে অবশ্যই প্রামাণ্য হইবেক যে পাণ্ডবেরা করতোয়া নদীর উভয় তীর পর্যাটন করিয়াছেন কারণ তাঁহারদিগেব অজ্ঞাতবাস উপলক্ষে করতোয়ার নাম উল্লেখিত হইয়াছে।···'

২৭-এ জুলাই ১৮৪৮-এর প্রভাকর পত্রিকায় লেখক রঙ্গপুরের স্কুলের একটি বিবরণ দিয়েছেন। এরপর ২৮, ২৯, ৩১ জুলাই এবং ৫, ৮, ১৯-এ আগষ্ট পর্যন্ত রংপুরেরই বর্ণনা ধারাবাহিক ভাবে দেওয়া হয়েছে। ২৯-এ আষাঢ় লেখক রংপুরে পৌছেন। ৩০-এ আষাঢ় বুধবারই তিনি সেখানকার স্কুল দেখতে যান। স্কুল-বাড়িটি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন কোচবেহারের স্বর্গীয় রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ, তাছাড়া তিনি বহু টাকাও চাঁদা দিয়েছিলেন। তৎকালীন গবর্নমেণ্ট এই স্কুলে কোনো সাহায্য করতেন না। সেখানকার জজ নাথানিএল স্মিথ স্থানীয়

জমিদারদের আহ্বান করে তাঁদের সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানকার প্রধান শিক্ষক হরিহর মুখোপাধ্যায় হিন্দু কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। 'হরিহর বাবু ইংরাজী বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী, অতি সুলেখক ও সুবক্তা, পূর্বে গবর্নমেণ্ট সংক্রান্ত সম্ভ্রান্ত কর্ম করিয়াছিলেন।' বাংলাশিক্ষক ছিলেন ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য।

স্মিথ সাহেবের পর স্কুলের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। লেখক লিখেছেন—

'১২৫৩ সালে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া ইহার সদুপায় নির্ণয় নিমিত্ত আপনার প্রভাকর পত্রে জমীদারদিগের প্রতি বিস্তর আক্ষেপ প্রকাশ করাতে কুণ্ডি পরগণার ভূম্যধিকারি স্বদেশবন্ধু পরম কারুণিক সুধার্মিক বাবু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় এবং মদীয় বন্ধু মহানুভব বাবু দুর্গাপ্রসাদ বসুজ মহাশয় বিশেষ উৎসাহের সহিত এক বিশেষ সভা আহ্বান করত অনেক সুনিয়ম নিবদ্ধ করিয়াছিলেন।'[১৫৯]

এই পত্রে উল্লিখিত দুর্গাপ্রসাদ বসু রংপুরের সুপ্রতিষ্ঠিত উকিল। এঁর সম্বন্ধে ৮ই আগষ্টের পত্রে লেখক বিস্তৃত সুখ্যাতি করেছেন। রংপুর-সম্বন্ধীয় অন্যান্য পত্রগুলিতে সেখানকার চিকিৎসাব্যবস্থা, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, ধর্ম, জাতি, পুণ্যস্থান প্রভৃতি নানা বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন।[১৬০] শহরের নিকটবর্তী এক প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গত একটি কবিতাও লিখে ফেলেন। তার প্রথম কয়েক পংক্তি—

কালক্রমে সব হয়, কালক্রমে সব লয়,
কালক্রমে শিশু হয় বুড়া
কালে দীর্ঘ কায় ধরি, চন্দ্র সূর্য স্পর্শ করি
ভেঙ্গে পড়ে পর্বতের চূড়া॥

১৯-এ আষাঢ় লেখক বগুড়া থেকে করতোয়া নদী দিয়ে রংপুরের দিকে যাত্রা করেন। রংপুর থেকে পরে উজানে ফিরে গোবিন্দগঞ্জ আসেন। সেখান থেকে নানা কাটাখাল দিয়ে ঘাঘর নদীতে পড়লেন। লেখক বলেছেন তিনি ফকিরগঞ্জ থেকে একটি নদীপথ অনুসরণ করে পুনর্ভবা নদীতে আসেন। সেখান দিয়ে দিনাজপুরে পৌছান।[১৬১] ঘাঘর নদীর ধারে নিসবেতগঞ্জে এসে নানা ছোটখাট নদী বা খাল দিয়ে সম্ভবত ফকিরগঞ্জে পৌছান। হাণ্টারের মানচিত্র থেকে অবশ্য এ বিষয়ে ভালো বোঝা যায় না।[১৬২]

পরবর্তী ৩১ আগস্ট ১৮৪৮-এ প্রকাশিত পত্র দিনাজপুর থেকে লেখা।[১৬৩]

পত্রটি ক্ষুদ্র। দিনাজপুরের আচার-ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। দিনাজপুর থেকে লেখা পত্র দুটি মাত্র পাওয়া যায়। ১লা সেপ্টেম্বরের পত্রে সেখানকার সরকারী কর্মচারীদের কথা আছে। প্রধান মুনসেফ রাধামোহন রায়চৌধুরীর খুব প্রশংসা করা হয়েছে। রাধামোহন রংপুরের জমিদার। ৬ই সেপ্টেম্বরের সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদকীয় বিভাগে রাধামোহন সম্বন্ধে মন্তব্য আছে—

'ভ্রামকের লিপির মধ্যে দিনাজপুরের সদর মুন্সেফ বাবু রাধামোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের কার্যদক্ষতা ও সুখ্যাতির বিষয় যাহা বর্ণিত হয় তাহা অতি যথার্থ, যেহেতু তিনি সর্বতোভাবে প্রশংসিত, কিন্তু খেদের বিষয় এই যে উপরের কর্তা সাহেবরা তাঁহার প্রতি এ পর্যন্ত বিশেষ দয়া প্রকাশ করিলেন না।'

৭ই সেপটেমবরের পত্রটি ও দিনাজপুর থেকেই লেখা।[১৬৪] কিন্তু এতে একটি ডাকাতির বিবরণ ছাড়া আর কিছু নেই।

৮ই সেপটেমবরেব পত্রে দেখা যায় লেখক মালদহে পৌছেছেন।[১৬৫] মালদহের আবগারি সুপারিনটেনডেন্ট তখন হরচন্দ্র ঘোষ 'এইখানে অতি প্রশংসিতরূপে স্বীয় কার্য সম্পন্ন করিতেছেন, তিনি ১৮৪৪ সালের নবেম্বর মাসে বোয়ালিয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপ্রেন্টেণ্ডেন্টেব পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, পরে ৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মালদহে আসিয়া প্রথম শ্রেণী ভুক্ত হয়েন, এইস্থানে ইঁহার আগমনাবধি ক্রমশই আবকারির উৎপন্ন বৃদ্ধি হইতেছে, পূর্বে বাইশ হাজার টাকার অধিক হইত না, হরচন্দ্র বাবু আসিয়া ১৮৪৬।৪৭ সালে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু খেদের বিষয় এই যে এমত সুযোগ্য ব্যক্তির পদোন্নতি বিষয়ে রাজপুরুষেরা কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না।'

৯ই সেপটেমবরের প্রকাশিত পত্রে মালদহেব প্রথম শ্রেণীর বাঙ্গালা পাঠশালার প্রশংসা আছে। পাঠশালার শিক্ষক হারাণচন্দ্র ঘটক চার বছর হিন্দু কলেজ সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার পণ্ডিত ছিলেন।

১৮৪৯-এ সংবাদপ্রভাকরের যে কয়সংখ্যা পাওয়া যায়, তাতে ভ্রমণকারি বন্ধুর কোনো পত্র প্রকাশিত হয় নি। অতঃপর ১৮৫০-এর ২৯-এ জানুয়ারি (১৭ মাঘ ১২৫৬) 'নাটোরস্থ' বন্ধুর গত দিবস প্রকাশিত বিষয়ের শেষ' নামক রচনাটির পর 'ভ্রমণকারি' বন্ধুর লিখিত পদ্য। গতবারের শেষ। 'ত্রিপদী' এই শিরোনামায় একটি দীর্ঘ কবিতা মুদ্রিত হয়। কবিতার প্রথম কয়েক লাইন—

অরুণ উদয় কালে ছুটে যায় পালে ২
দাড়ি মাজি আর ২ যত।

প্রভাতের কর্ম্মসারি উঠে সব সারি সারি
নিজ নিজ কর্ম্মে হয় রত ॥

এই কবিতাটি ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলীতে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে। 'ভ্রমণকারি বন্ধু' -প্রণীত পত্রগুলি যে কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনা এটা তার পরোক্ষ প্রমাণ।

১৮৫০ এর ১৩ই মে সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদকীয় নিবন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের এলাহাবাদ ভ্রমণের বিবরণ প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর গুপ্তের নিজের নাম সেখানে উল্লিখিত ছিল না। 'ভ্রমণকারী বন্ধু হইতে নিম্নস্থ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অতি সমাদর পূর্বক অবিকল প্রকাশ করিলাম।'—এই ভাবেই সম্পাদকীয় রচনাটি ছাপা হয়। সম্পাদকীয় রচনা হিসাবে ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করায় স্পষ্টতই বোঝা যায় ভ্রমণকারী বন্ধু ঈশ্বর গুপ্ত ছাড়া কেউ নয়।

এই পত্রে এলাহাবাদ, কানপুর, ফরাক্কাবাদ, মথুরা. বৃন্দাবন, দিল্লী, মিরাট এবং বারানসী— এ সব জায়গায় জলবায়ু রাস্তাঘাট যানবাহন সরাই পুষ্করিণী কূপ প্রভৃতির কথা আছে। ঈশ্বর গুপ্ত এবারকার ভ্রমণে এলাহাবাদ পর্যন্ত গিয়ে আবার কাশীতে ফিরে আসেন। আরো উত্তরে যাওয়ার তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রচণ্ড গ্রীষ্মে আর যেতে পারেন নি।

'যদি এই ভীমতুল্য পরাক্রমশালী গ্রীষ্মদেবের প্রভানলে ভস্ম হইয়া না যাই, তবে নির্দয় নিদাঘের নিদানকালে ভ্রমণের আশা পরিপূর্ণ করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করিব।' অতঃপর তিনি রামনগরের রাজার বাড়ী, দেবালয়, সরোবর, কূপ, কাশীর বাঙ্গালীটোলা এবং জলাশয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন। রাস্তার পাশে পাশে সরাইখানার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত উল্লেখ আছে।

এই রচনাটি ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রভাকরের সব সংখ্যা পাওয়া যায় না বলে পরবর্তী অংশ অলব্ধ।

ঈশ্বরচন্দ্র উত্তর ভারত থেকে সম্ভবত ১৯-এ ডিসেম্বর ১৮৫০-এ কলকাতায় ফিরে আসেন। ২১-এ ডিসেম্বরের সংবাদপ্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রের একটি দীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়। সেই রচনার কিছু প্রাসঙ্গিক মূল্য আছে বলে সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করে দিলাম—

'হিতার্থি বন্ধু এবং পাঠকগণের নিকট প্রভাকর সম্পাদকের নিবেদন।

এক বৎসর অতীত হইল আমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম, সংপ্রতি দুই দিবস হইল শ্রীশ্রী৺বারাণস্যাদি ধাম দর্শন করনান্তর কলিকাতা মহানগরে প্রত্যাগত হইয়াছি, আমার অবস্থান সময়ে সহকারি সম্পাদক শ্রীযুত

বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের গুরুতর কর্ম্ম যে প্রকারে নিষ্পাদিত করিয়াছেন বোধ করি তাহাতে আপনারদিগের সংপূর্ণ সন্তোষ জন্মিয়া থাকিবেক। যেহেতু তিনি অতি সুনীতিক্রমে যথানিয়মে কার্য্যসম্পাদনে ত্রুটি করেন নাই, যদিও তদ্দ্বারা সর্ব্বতোভাবে মহাশয়দিগের অন্তঃকরণে তুষ্টি সঞ্চার না হইয়া থাকে তথাচ ক্রমশঃ বিংশতি বৎসর আমাকে যদ্রূপ কৃপাপূর্ণ স্নেহরসে অভিষিক্ত করিতেছেন এতদ্বিষয়ে কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না, কারণ আমি কেবল আপনারদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করত এই সম্পাদকীয় কার্য্যে এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থিরতররূপে উৎসাহ, যত্ন অনুরাগ এবং পরিশ্রমকে জাগরূক রাখিয়াছি, অতএব আপনারা কোনক্রমেই আমার প্রতি কৃপাবিতরণে কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না, তাহাতে আমার সাহস বিশেষরূপে বলবৎ জানিবেন।

মলঙ্গনিবাসি সুবিখ্যাত ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয়ের সুযোগ্য সুপাত্র পুত্র শ্রীমান বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক নানা বিষয়ে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন তাহাতে আমাকে কৃতজ্ঞতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া যাবজ্জীবন তাঁহার নিকট মহোপকার স্বীকার করতে হইবেক, অধুনা আমি তাঁহাকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আপন কার্য্যের সমুদয় ভার আপনিই গ্রহণ করিলাম, অদ্যাবধি আমি বিল, পত্র ও অন্যান্য তাবদ্বিষয়ের কাগজপত্রে পূর্ব্ববৎ স্বয়ং স্বনাম স্বাক্ষর করিব।

সম্বৎসরের পর পুনরায় আমি স্বকার্যে প্রবৃত্ত হইলাম, এইক্ষণে আপনারা যথাযোগ্য দয়া দানে ঔদাস্য করিবেন না, মহাশয়দিগের মনোরঞ্জনার্থ জগদীশ্বর আমাকে যে পর্যন্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন তাহা সুসম্পন্ন করণে কখনই আলস্য করিব না, মধ্যে বহু দিবস বিদেশে থাকাতে বিষয় কর্ম্মের যে ২ অংশে বিশৃঙ্খলা হইয়াছে তাহা পরিপূরণ করণে এবং আর ২ কার্য্য সাধন করণে কিছুদিন আমাকে বিশিষ্টরূপে মনোযোগ করিতে হইবেক, সুতরাং এতজ্জন্য আপাততঃ সমুদয় অনুগ্রাহক বন্ধুর সমীপস্থ হইয়া প্রত্যেকের সহিত পৃথকরূপে সাক্ষাৎ করত আনন্দ লাভ করণে অক্ষম হইলাম, অবিলম্বেই সুযোগ করিয়া তদ্বিষয়ের আক্ষেপ নিবারণ করিব। অপিচ আমার প্রত্যাগমনকালে যে সকল বিদেশীয় গ্রাহক ও প্রভাকরের হিতার্থি পাঠক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহারদিগের কথাই নাই, তাঁহারা আপনাপন বিষয় আপনারা মনে ২ জ্ঞাত আছেন, অতএব লেখা বাহুল্য মাত্র, তন্মধ্যে যে ২ মহাশয়েরা গৃহীত পত্রের মূল্য

প্রদান না করিয়াছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সময়ে নিয়মিত মূল্য প্রেরণ করিবেন। অপরন্তু যে সমস্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করনের কোন উপায় ছিল না, তত্তন্মহাত্মাদিগের সহ কি প্রকারে সাক্ষাৎ করিতে পারি, সংপ্রতি উল্লেখিত প্রত্যেক মহাশয়কে পৃথকরূপে পত্র লেখা কর্তব্য বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত সমুদয় ব্যাপার নিষ্পন্ন করণ ও প্রভাকর ও সাধুরঞ্জন পত্রের সকল উপস্থিত নিত্য নিয়মিত কার্য ধার্যকরণ কারণ নিয়ত নিযুক্ত প্রযুক্ত স্বাবকাশ শূন্য জন্য ক্ষুণ্ণ জানবেন, যাহা হউক, আমি এতৎপত্রযোগে পাত্র বিশেষে প্রণাম নমস্কার এবং যথাযোগ্য সম্বোধন সম্বলিত বিনয় প্রদান করিলাম, আপনার অনুকম্পাপুরঃসর গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ ও আহ্লাদিত করিবেন, আর এই পত্রদ্বয়ের বৃহৎ কার্য্য নিষ্পাদন নিমিত্ত আপনারদিগের যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম আপনারা তাহা অবশ্যই করিবেন, ইহাতে অনুরোধ করা বিফল মাত্র, কেননা সমাচারপত্রের গুরুতর কর্ম্ম নির্ব্বাহ-কল্পে যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন করে তাহা আপনারদিগের অবিদিত কি? অপিচ আমি যত শীঘ্র স্বতন্ত্র পত্র দ্বারা আপনারদিগের নিকট আপনাবস্থা জ্ঞাত করিতে পারিব তাহাই করিব।

অপরন্তু কলিকাতাস্থ পত্র গ্রাহক ও অনুগ্রাহক সাহায্যকারি বন্ধুদিগের নিকট বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন এই যে আপনারা পূর্ব্ববৎ কৃপা প্রকটন পুরঃসর আমাকে সংপূর্ণরূপে উপকৃত করিবেন।

যে সকল লেখক বন্ধু বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা দ্বারা সর্ব্বদা অস্মদাদির পত্র-দ্বয়কে সুশোভিত এবং প্রশংসিত করিতেন ও করিতেছেন তাঁহারা এইক্ষণে বরং তদধিক করিয়া আমাকে চিরবাধ্য রাখিবেন।

কলিকাতা, বারাণসী, দিল্লী, মিরাট, আগ্রা, রঙ্গপুর, বর্দ্ধমান এবং আর ২ নিকটস্থ ও দূরস্থ স্থানের সমুদয় ইংরাজী, বাঙ্গালা, পারস্য ও হিন্দি ভাষার সমাচার পত্রের সহযোগি সম্পাদক মহাশয়েরা ভ্রাতৃভাবে আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করত পূর্ব্বানুরূপ সম্মানান্বিত করিবেন এবং যন্ত্রালয়ে আমার পুনর্ব্বার নিযুক্ত হওনের সংবাদ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া উপকার ঋণে বদ্ধ করিবেন, ইত্যলং বিস্তরেণ।

কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সংবাদপ্রভাকর যন্ত্রালয় প্রভাকর সম্পাদক

৮ অগ্রহায়ণ, ১২৫৭

সংবাদপ্রভাকর পত্রিকার যে সব সংখ্যা আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে ১৮৫৪ সালে ঈশ্বর গুপ্তের উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ উল্লেখযোগ্য। ১২৬১-র ১ চৈত্রের সংবাদপ্রভাকরে তিনি লেখেন—

'অধুনা রাজসাহী, পাবনা, ফবিদপুর, বিক্রমপুর, বাজনগব, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, জাফরগঞ্জ, ঢাকা, রায়পুব, দালালবাজার, লক্ষীপুর, শান্তিসীতা, ভুলুয়া, সুধারাম, চন্দ্রশেখর, শম্ভুনাথ, সীতাকুণ্ড, বাড়বাকুণ্ড, কুমারীকুণ্ড, লবণাখ্যা, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বরিশাল, নলছিটি, ঝালকাঠি, মহারাজগঞ্জ, গুরুধাম, তুষখালি, সেয়ামতি, সাহেবের হাট, সুন্দরবন, বাদাবন, প্রাণসাযের, টাকী শ্রীপুর, বাগুণ্ডী, পুঁড়া, ঘোরগাছি, বাদুরে, বসুরহাট, চাদুড়ে, গোলাপনগর, বনগাঁ, কৃষ্ণগঞ্জ, শিবনিবাস হাঁসখালি ও রাণাঘাট প্রভৃতি পুরাতন ও অভিনব নগর, গ্রাম ও গঞ্জ, এবং তীর্থস্থানসকল ভ্রমণচলে অতিক্রমপূর্ব্বক অদ্য এতন্নগরে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় হইলাম। আমিই এ পর্য্যন্ত প্রভাকরের ভ্রমণকারী বন্ধুরূপে গণ্য ছিলাম, এইক্ষণে পুনরায় পূর্ব্ববৎ সম্পাদকীয় কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলাম। 'ভ্রমণকারি বন্ধুর লিখিত বিষয়' এই উপাধিব শ্রেণী মধ্যে যে বিষয় প্রকটিত হইয়াছে, এতদিন তৎসমুদয় মৎকর্তৃক বচিত ও প্রেরিত হইয়াছিল। ·'

ঈশ্বর গুপ্তেব এই পর্যাযের ভ্রমণবৃত্তান্ত অধ্যাপক মোহনলাল মিত্র 'ভ্রমণকারি বন্ধুর পত্র' নামক বইতে (১৯৬৩) সংকলন করে প্রকাশ করেছেন। বাহুল্যবোধে ভ্রমণের সেই বিবরণ এখানে আব দিলাম না।

বিচিত্র গ্রন্থ

এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে ঈশ্বর গুপ্ত তরুণ বযস থেকেই পুরনো বাংলা গান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হযেছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বরের সংবাদপ্রভাকরে রামপ্রসাদের জীবনী-রচনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন—

'পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল আমরা বামপ্রসাদি পদ্য সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত হইযাছি '

১৮৩৩ এই ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদের কালীকীর্তন পুস্তাকাকাবে প্রকাশ করেন। অতঃপর দীর্ঘকাল এই কাজে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন বলে সংবাদ পাওয়া যায় না বটে তবে ১৮৫৩ থেকে তিনি প্রভাকরে ধাবাবাহিক ক্রমে কবি ও কবিওযালাদের জীবনী ও পদ প্রকাশ করেছেন, তাতে অনুমান হয় এ-কাজের দীর্ঘ পূর্বপ্রস্তুতি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন ঈশ্বর গুপ্ত দশ বৎসর কাল নানা জায়গা

ঘুরে যথেষ্ট পরিশ্রম করে এইগুলি সংগ্রহ করেছেন। সম্ভবত এই সংগ্রহ যখন হচ্ছিল তখনই রঙ্গলাল বীটন সোসাইটিতে 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' পড়েন। সেই প্রবন্ধে রঙ্গলাল সেইসব কবিদের উৎকর্ষের কথাই বিশেষ ভাবে বলেছিলেন, যাঁদের জীবনী ও গান আর দু বছরের মধ্যেই ঈশ্বর গুপ্ত প্রকাশ করবার উদ্যোগ করছিলেন। এসব উপকরণ সংগ্রহে তিনি কী পরিমাণ ক্লেশ স্বীকার করেছিলেন তিনি নিজেই তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।[১২৬]

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন বাঙ্গালী জাতির মধ্যে 'ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগী'। একথা ঈশ্বর গুপ্ত নিজেও বলেছিলেন। কিন্তু এ-কাজে তিনি ব্রতী হলেন কেন? এক জায়গায় তিনি বলেছেন এসব গান লুপ্ত হয়ে চলেছে বলেই তিনি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। মনে রাখা দরকার, ঈশ্বর গুপ্ত নিজে বাংলার এই সাহিত্যধারারই কবি। নিজে যেমন সখীসংবাদ প্রভৃতি রচনা করতে পটু ছিলেন, তেমনি ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের কাব্যের তিনি একজন যথার্থ রসিক ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি নিজের রচনার মধ্যে রামপ্রসাদের প্রভাবকে যেভাবে অঙ্গীকৃত করেছিলেন, ছন্দ ও শব্দ-চাতুর্যে যেভাবে তিনি প্রবেশ করতে পেরেছিরেন তাতে একথা মানতেই হবে যে সেকালে তাঁর সমসাময়িক কবি আর কেউ ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের কাব্যের মর্মে সেভাবে প্রবেশ করতে পারেন নি। তাই প্রাচীন বাংলা কাব্য ও কবিজীবনকে রক্ষা করবার একটা আন্তরিক ব্যাকুলতা ছিল। এক ধরনের ইতিহাসবোধও যে ঈশ্বর গুপ্তের এই উদ্যমের মূলে ছিল, সেটাও অস্বীকার কবার কারণ নেই। আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ বিদ্বন্মণ্ডলীর সাহচর্যে ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেও এই সচেতনতার উদয় হয়েছে। কবিজীবনী রচনার প্রেরণারূপে কাজ করেছিল ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যপ্রীতি এবং ইতিহাসবোধের মিলিত চেতনা। বাংলা দেশের সাহিত্যইতিহাস রচনার সূত্রপাত ছিল এই ধারাবাহিক রচনাগুলিতে।[১২৭]

সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত ঈশ্বর গুপ্ত-রচিত প্রাচীন কবি সম্পর্কিত রচনা-গুলির তালিকা নীচে দেওয়া গেল—

এক। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন — চারটি রচনা, ১৬ সেপটেমবরের ১৮৫৩, ১৫ ডিসেমবর ১৮৫৩, ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৪, ১৩ মার্চ ১৮৫৫। এতে প্রসাদী সঙ্গীতগুলি ছাড়াও আছে 'সীতার বিলাপোক্তি সংগীত' 'শিবসংগীত' 'শবসাধন বিষয়ক সংগীত' 'নৌকাখণ্ডের সংগীত', কালী-

কীর্তনের গোষ্ঠলীলা ও রাসলীলা, কৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি, আগমনী বিজয়া, ষট্‌চক্রভেদের গীত।

দুই। রামনিধি গুপ্তের জীবনচরিত — দুটি রচনা ১৫ জুলাই ১৮৫৪ এবং ১৬ আগস্ট ১৮৫৪।

তিন। রাসু নৃসিংহ — একটি রচনা, ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫

চার। হরু ঠাকুর — একটি রচনা ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪

পাঁচ। নিত্যানন্দদাস বৈরাগী — দুটি রচনা ১৫ নবেম্বর ১৮৫৪, ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪

ছয়। রাম বসু — চারটি রচনা
১৬ ডিসেম্বর ১৮৫৪, ১৬ অক্টোবর ১৮৫৪
১৫ নবেম্বর ১৮৫৪, ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫

সাত। লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস—একটি রচনা ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫

আট। ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৫৫

নয়। 'প্রাচীন কবি' নামে তিনটি রচনা
১৫ নবেম্বর ১৮৫৪, ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪
১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫।

ঈশ্বর গুপ্তের বাসনা ছিল এক একজন কবিকে নিয়ে এক একটি বই বের করবেন। কার্যত ভারতচন্দ্রের জীবনী ছাড়া আর কোনোটিই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। সংবাদপ্রভাকরে এই রচনাগুলি প্রকাশিত হয় নি। সংবাদ প্রভাকরে এই রচনাগুলি প্রকাশিত হওয়ার এক শ তিন বৎসর পরে বর্তমান লেখকের সম্পাদনায় এগুলি 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী' (১৯৫৮) রূপে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের দেওয়া তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ সহ প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য ওই গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য। এখানে অধিকতর বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

ক ঈশ্বরচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত পুস্তক

১। রামপ্রসাদের কালীকীর্তন ১৮৩৩। পৃ ২৭।

বঙ্কিমচন্দ্র এই বইটির সংবাদ জানতেন বলে মনে হয় না, সেইজন্যই পরবর্তী বইকেই 'ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ' বলেছেন।

এই বইয়ের নামপত্র এই রকম—

শ্রীশ্রী তারা। ত্রিভুবন সারা। কালীকীর্ত্তন গ্রন্থ। লোকান্তর গত ৺রামপ্রসাদ

সেনের কৃত। শ্রীঈশ্বর গুপ্তের যত্নানুসারে সংগ্রহণ পূর্ব্বক সংশোধিত হইয়া কলিকাতাস্থ মৃজাপুরে শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তিব গুণাকব যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। এই গ্রন্থ গ্রহণে যাঁহার অভিলাষ হয় তিনি মোং জোড়াসাঁকো চাষাধোবা পাড়ায় শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট অথবা বাগবাজার নিবাসি শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষের বাটীতে স্বয়ং কিম্বা লোক প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পাবিবেন, ইতি। শকাব্দ ১৭৫৫ ইং ১৮৩৩ সাল।

এই বইয়ের ভূমিকা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি। ঈশ্বর গুপ্তের প্রথম মুদ্রিত বইয়ের ভূমিকা বলে এটি মূল্যবান্।—

ঈশ্বরস্য হৃদয়ে পদাম্বুজং সন্নিধায় শশিখণ্ডভালিকে।
চণ্ডমুণ্ডমুখমুণ্ডখণ্ডনপ্রাপ্তিমস্তবয় দেবি কালিকে॥
অথ কালীকীর্ত্তনানুষ্ঠান।

স্বস্তি কবিরঞ্জনাপরনাম রামপ্রসাদ সেন কালীভক্তাবতারাবতারিত নবীন পদবী কালীকীর্ত্তনাভিধান ভক্তিরসপ্রধান মধুর গান পদাবলী পুস্তক অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজন শ্রবণগোচর হয় নাই যদ্যপি গায়ক দ্বাবা অথবা অন্য কোনপ্রকারে তাহার যৎকিঞ্চিদংশ কোন ২ মহাশয়ের কর্ণপথগত হইয়াও থাকে তথাপি সমুদয় শ্রবণ ব্যতিরেকে তাদৃশাপূর্ব্ব রসাস্বাদন হইবার সম্ভাবনা হয় না ইহাতে তত্তন্মহাশয়েরদের যৎকিঞ্চিদংশ শ্রবণোত্তর কালে তত্তাবদংশ শ্রবণ স্পৃহাতে মনের ব্যগ্রতা সর্ব্বদা থাকে।

অপরঞ্চ কালীকীর্ত্তনব্যবসায়ি গায়ক যে কয়েকজন দৃষ্ট হয় তাহারদের উচ্চারণানভিজ্ঞতা ও সামান্যতো অজ্ঞতা প্রযুক্ত গীতকর্ত্তার অভিপ্রেত রস ভাবার্থব্যতিক্রমজন্য রসভঙ্গ হওয়াতে শ্রবণকালে মনে সুখোদয় না হইয়া বরং খেদোদয় হয় এবং এই পরকীয় দোষে গ্রন্থকর্ত্তার দোষানুমান হওয়াতে তাঁহার এই মহাকীর্ত্তিসুধাকরে কলঙ্কোদয় সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত নানা দোষ পরীহারার্থ এবং ঐ অপূর্ব্ব গীতগ্রন্থেব অবৈকল্য-রূপে ও প্রাচুর্য্যরূপে বহুকাল স্থায়িত্বার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূল পুস্তক আনয়নপূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্ত্তন পুস্তক মুদ্রিতকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে সাধু মহাশয়েরা নয়নাস্তপাত করিলে তাঁহাদের মনে কালীভক্তিকল্পলতাঙ্কুর বৃদ্ধি ও পরগুণগ্রাহিতা প্রকাশ হয় এবং গ্রন্থকর্ত্তার মহাকীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমারও এতাবৎ পরিশ্রমের সুফল সিদ্ধি হয়।

সংশোধিতামপি ময়া বহুলপ্রয়াসৈর্গীতাবলীং পুনরিমাং প্রতিশোধয়ন্তু। সন্তঃ সুশান্তনয়নান্তনিরীক্ষণেন কৃত্বা কৃপামিহ ময়ীশ্বরচন্দ্রগুপ্তে।

এই ভূমিকার পর 'কালীকীর্ত্তন সংগ্রহকারের উক্তি'— এই নামে পয়ার ও ও ত্রিপদীতে ঈশ্বরচন্দ্রের ভক্তিভাবমূলক দীর্ঘ পদ্য রচনা আছে। পয়ার-অংশের শেষে ভণিতা—

একান্ত বাসনা তাঁর যাহে লোক তরে।
তাইতো ঈশ্বব গুপ্ত মর্ম্ম ব্যক্ত করে॥

ত্রিপদীর-অংশের শেষে ভণিতা নেই। কিন্তু সর্বশেষে নাম স্বাক্ষর আছে 'শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তস্য'।

অতঃপর সংস্কৃতে চার শ্লোকের গুরুবন্দনা, এবং তার পরে 'অথ কালী-কীর্ত্তনারম্ভ'।

এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি শ্রীসনৎকুমাব গুপ্ত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত করেন[১৬৮], সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

'এই কালীকীর্ত্তন গ্রন্থ অতি দুষ্প্রাপ্য। ইহার এক খণ্ড রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে আছে। বর্ত্তমানে বাজারে প্রচলিত সাধক রামপ্রসাদের যে 'কালীকীর্ত্তন' আমবা পাই, তাহাব সহিত ইহার অনেক পার্থক্য আছে।'

২। ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত ১৮৫৫

এর সম্পূর্ণ আখ্যাপত্র—

কবিবর ৺ভারতচন্দ্র বায় গুণাকরের / জীবনবৃত্তান্ত / সংবাদপ্রভাকর সম্পাদক / শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত / কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া / কলিকাতা / প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। / ১ আষাঢ় ১২৬২ সাল। / এই গ্রন্থের মূল্য ১ তঙ্কামাত্র।

এই গ্রন্থের আট পৃষ্ঠার ভূমিকাটি 'ঈশ্বচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী' গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত আছে। ভূমিকাতে প্রসঙ্গত ঈশ্বরচন্দ্র বলেন,

ইহার পূর্ব্বে কোন মহাশয় এতদ্দেশীয় কোন কবির জীবনচরিত প্রকাশ করেন নাই ;— এবং এতৎ প্রকাশের কি ফল তাহাও কেহ জ্ঞাত হয়েন নাই— আমরা প্রথমেই ইহার পথপ্রদর্শক হইলাম। এতৎপাঠে বিশেষ উপকার বিবেচনা করিয়া যদি সকলে গ্রাহকতা ব্যাপারে উপযুক্তরূপ প্রযত্ন প্রকাশ করেন, তবে আমরা অশেষানন্দ লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে এই নিয়মে এক এক কবির বিষয়ে এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব ··

ভূমিকার তারিখ ১ আষাঢ় ১২৬২। প্রভাকর যন্ত্রালয়। মূল গ্রন্থের
। ৬১।

'কবিজীবনী' গ্রন্থে এই বইটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত এবং আনুষঙ্গিক তথ্য-অংশে ঈশ্বর গুপ্ত-প্রদত্ত তথ্যাদির আলোচনা আছে।

বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বর গুপ্ত বইযের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। প্রথম বিজ্ঞাপন বেরোয় ১৩ই জুনের সংবাদপ্রভাকরে।

বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বর গুপ্ত লিটারেরি গেজেটে সমালোচনার জন্য বই পাঠান। লিটারেরি গেজেটের দীর্ঘ সমালোচনা উদ্ধৃত করে তিনি ১ শ্রাবণ ১২৬২ (১৬ জুলাই ১৮৫৫) সংবাদপ্রভাকরে[১৬৯] লেখেন,

'আমরা বহু পরিশ্রম বহু যত্ন এবং বহু ব্যয় স্বীকারপুর্ব্বক কবিবর ও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করত মুদ্রাঙ্কিত করিয়া তাহার এক একখানি পুস্তক ইংরাজী পত্র প্রকাশক মহাশয়দিগকে উপহার দিয়াছিলাম, তন্মধ্যে কলিকাতা লিটারেরি গেজেট পত্রের সুকবি ও বিখ্যাত সুলেখক সম্পাদক মহাশয় ঐ পুস্তক বিষয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ বাধিত হইলাম। এইক্ষণে যে সকল ব্যক্তি বঙ্গভাষায় অথবা ইংরাজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ কিংবা তাহার ভাবার্থ প্রকাশ করেন, কদাচ কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ অথবা স্বয়ং লিখিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু আমরা যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ইহাতে কেবল রচনা অথবা ভাষান্তর করণের শক্তির আবশ্যক করে না। বহুকাল হইল যাঁহারা এই অবনী হইতে অবসৃত হইয়াছেন, শুদ্ধ কবিতা দ্বারা যাঁহারদিগের নাম দীপকেব ন্যায় প্রকাশ আছে, তাঁহারা কোন্ সময়ে কোন্ দেশে কিরূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে বিদ্যানুশীলন ও বৈষয়িক কার্য্যকদম্ব নির্ব্বাহ করিয়াছেন কিরূপেই বা তাঁহারদিগের কবিতাশক্তির উদ্দীপন হইয়াছে আমারদিগকে সেই সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্মানুসন্ধান করিতে হইতেছে, অতএব আমরা এক গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি এ বিষয়ে বিদ্যোৎসাহি মহোদয়গণ আমারদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিলে আমরা তাঁহার নিকট যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব।'

৩। প্রবোধপ্রভাকর ১৮৫৭

এর আখ্যাপত্র এই রকম—

ঈশ্বরোজয়তি / প্রবোধ প্রভাকর। / প্রথম খণ্ড। / জ্ঞানগুরু সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ / শ্রীযুত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃপায় / সংবাদপ্রভাকর সম্পাদক /

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক / বিরচিত হইয়া / কলিকাতা। / প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। / সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ / মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নম্বর ভবন। / ১ চৈত্র ১২৬৪।

অতঃপর 'বোধেন্দুবিকাশ' 'হিতপ্রভাকর' 'সংবাদপ্রভাকর' 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' সম্বন্ধে দুই পৃষ্ঠার বর্ণনা ও বিজ্ঞাপন। তারপর গদ্য-পদ্য মিশ্রিত আট পৃষ্ঠাব্যাপী মঙ্গলাচরণ। তারপর পনেরো পৃষ্ঠার বেশি কয়েক লাইনের ভূমিকা। ভূমিকার প্রয়োজনীয় অংশ নীচে উদ্ধৃত করা গেল

' এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য যাহা তাহা অতি দুঃসাধ্য গুরুতর সুকঠিন ব্যাপার। অর্থাৎ "প্রাণিতত্ত্ব-নিরূপণ" পূর্ব্বতন সর্ব্বজ্ঞকল্প জ্ঞানগুরু মহর্ষিগণ পরস্পর এই তত্ত্ব-নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া যথাসাধ্য শক্তিক্রমে বিচার-দ্বারা তন্ন তন্ন তন্ন তন্ন করত সার-সিদ্ধান্ত সঞ্চয়পূর্ব্বক পবিশেষ এককালীন সংশয়শূন্য হইয়াছিলেন কি না তাহাতে সন্দেহ করিলেও করা যাইতে পারে। ফলতঃ এতদ্বিষয়ে (এইটিই নিশ্চিত) স্বাধীনচিত্তে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করি, আমার এমন ক্ষমতাই বা কি ? পরম কারুণিক পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই ক্ষমতা এবং সেই শক্তি প্রদান করেন নাই। তবে তাঁহার অনুকম্পায় অধুনা যে দুই একজন সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ সুবিজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শি মহানুভব মহাপুরুষ এই অবনীমণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন কেবল তাঁহারাই বলিতে পারেন আমার মনে একপ বিবেচনার আলোচনা হইতেছে। কাশীবাসি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সংশযচ্ছেদক সন্তাপহারক জ্ঞানদাতা-গুরু শ্রীযুত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়। যিনি এইক্ষণে এতদ্দেশের অগ্রগণ্য মহামান্য শ্রীশ্রীযুত বর্দ্ধমানাধিপতি আশ্রয়ে বর্দ্ধমানে বাস করিতেছেন, তিনি এই জ্ঞানান্ধ-অকিঞ্চনের প্রতি অনুকূল হইয়া করুণা প্রকাশ-পূর্ব্বক সমূহে সমাদর সহকারে গুরুতর পরিশ্রমে যতদূর পর্য্যন্ত উপদেশ ও আনুকূল্য করিতে হয় তাহাই করিয়াছেন।...

আমি যথাযোগ্য-যত্নযোগে আদর্শস্বরূপ এই প্রথম খণ্ড প্রকটন করিলাম। ইহাতে যদিস্যাৎ গুণগ্রাহক অনুগ্রাহক অনুরাগিগ্রাহক পাঠক মহাশয়দিগের সম্ভাবিত আনুকূল্য এবং অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি, তবে খণ্ড খণ্ড করিয়া তিন চারি খণ্ডে এই গ্রন্থখানি শেষ করিব, নচেৎ খণ্ড খণ্ড কারিয়া এই খণ্ডকেই একেবারে শেষ করিব।...

এই পুস্তক গদ্য পদ্যে পরিপূরিত হইল ; একটী বিষয় দুই প্রকারে লিখিবার এই তাৎপর্য্য, একবার গদ্য পাঠ করিয়া পুনর্ব্বার পদ্য পাঠ করিলে তাহার ভাব,

অর্থ, অভিপ্রায়াদি অতি সহজেই পাঠকদিগের হৃদয়ঙ্গম হওনেব সম্ভাবনা।... এই পুস্তকে পিতা পুত্রের প্রশ্ন উত্তরচ্ছলে যে প্রবন্ধটী প্রকটন করিলাম, তাহার তাৎপর্য্যার্থ সাধারণের সাধারণ-বোধে সহজে সংগ্রহ হইবার নহে, ফলে শ্রীমান ধীমান্ পুমান্‌পুঞ্জের পক্ষে কখনই কঠিন হইবে না। নচেৎ অপর সকলকে প্রকৃষ্টরূপ প্রণিধানপূর্ব্বক মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবেক। এই প্রস্তাবে কি গদ্য, কি পদ্য, যতদূর পর্য্যন্ত সহজ শব্দ ব্যবহার কবা যাইতে পাবে, উভয় বিষয়ে তাহাই করা হইয়াছে। আমরা এমত একটী কঠিন শব্দ ব্যবহাব কবি নাই যাহা শুনিতে কর্কশ ও উচ্চারণ করিতে কণ্ঠের কষ্ট বোধ হয়। যে বিষয়টিব সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করিয়া প্রকৃত রূপ বর্ণনায় অভিপ্রায় ব্যক্ত কবা গদ্যেতেই কঠিন হইয়া উঠে, আমরা কিরূপ ললিত চলিত সরল এবং সহজ ভাষাব কবিতায় সেই বিষয়টী বর্ণনা করিয়াছি, পাঠক মহাশয়েরা তাহা দৃষ্টি করুন।...”

ভূমিকাব তারিখ, কলিকাতা প্রভাকব যন্ত্রালয় ১ চৈত্র ১২৬৪ সাল। অতঃপর একটি সংস্কৃত শ্লোক—

যোত্রাস্তি বর্ণরচনার্থ গতোমহীয়ান্
দোসোবিচক্ষণ জনেষু বিরক্তিকারী।
স ক্ষম্যতাং নিজধিয়া গুণিভির্ভবদ্ভিঃ
কৃত্বাকৃপামিহ ময়ীশ্বরচন্দ্র গুপ্তে॥

ভূমিকাসহ বইয়েব পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২২। দুই কলমে মুদ্রিত। সর্ব্বশেষে ‘লেখনী পরিত্যাগ সময়ে গ্রন্থকর্ত্তার নিবেদন’— পাঠকদের নিকট স্বকৃত দোষক্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা।।

প্রবোধপ্রভাকরের বিষয় দার্শনিক। সৃষ্টি, কর্ম, নিয়তি, সুখদুঃখের উৎপত্তি স্বভাবধর্ম ইত্যাদি নানা তত্ত্বালোচনা পিতাপুত্রের প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে রচিত।

থ. ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর ‘কবিতা সংগ্রহ’ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ

মৃত্যুর আগে ঈশ্বর গুপ্ত আরো দুটি বই প্রকাশের আযোজনে ব্যাপৃত ছিলেন। ছাপাও আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ‘হিতপ্রভাকর’ এবং ‘বোধেন্দুবিকাশ’ বই দুটির বিজ্ঞাপন তিনি প্রবোধপ্রভাকরেই দিয়েছিলেন। কি ভাবে এবং কি আকারে বই দুটি প্রকাশিত হতে চলেছে, বিজ্ঞাপনে তার বর্ণনা ছিল। কিন্তু তিনি মুদ্রণ সমাপ্তি দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর (১৮৫৯ জানুয়ারি) পর রামচন্দ্র গুপ্ত বই দুটি প্রকাশ করেন।

৪। হিতপ্রভাকর ১৮৬১

এর আখ্যাপত্র এই রকম—

HIT PROBHAKUR / By the Late / Baboo Issurchunder Goopto. / হিতপ্রভাকর / সংবাদপ্রভাকর সম্পাদক / শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক / প্রকাশিত হইযা / কলিকাতা / প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল / সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ / মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নং ভবনে। ১১ চৈত্র ১২৬৭।

এর পর আট পৃষ্ঠাব্যাপী রামচন্দ্র গুপ্তেব পুস্তকের উদ্দেশ্য ও ইতিহাস বিষয়ক ভূমিকা। মূল গ্রন্থের এই কয়টি ভাগ,— পরমেশ্বরের মহিমাবর্ণন ৯-২৭, মিত্রলাভ ২৮-৬৪, সুহৃদ্ভেদ ৬৫-৮৮, বিগ্রহ ৮৯-১৩৫, সন্ধি ১৩৬-১৯২ পৃষ্ঠা। বই দুই কলমে মুদ্রিত।

ঈশ্বরচন্দ্র বইয়ের অন্য একটি নাম দিযেছিলেন— হিতহার। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষেই সমাপ্তি-সূচক বাক্যটিতে 'হিতহার' নামটি আছে, হিতপ্রভাকর নেই।

প্রবোধপ্রভাকরে এই প্রকাশিতব্য বইটি সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন ছিল—

'হিতপ্রভাকর' নামে গদ্য-পদ্য-পরিপূরিত একখানি গ্রন্থ চারি খণ্ডে প্রকাশ করণের অভিলাষ করিযা তাহার প্রথম খণ্ড মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে কেবল নীতি এবং হিতোপদেশাদি বহুবিধ শিবকর বিষয লিখিত হইয়াছে, গদ্যের অপেক্ষা পদ্যের অংশই অধিক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

অবশ্য রামচন্দ্র চার খণ্ডকেই একত্র প্রকাশ কবেন। রামচন্দ্র ভূমিকাতে পরলোকগত অগ্রজ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে কিছু লেখেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন স্কুলে বাংলা কাব্য পডানো হয় না। হিতপ্রভাকর বস্তুতই সেই উদ্দেশ্য রচিত। রামচন্দ্র আরো বলেন, ঈশ্বরচন্দ্র ব্যক্তিগত বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বলে জীবিতকালে বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক রচনায় মন দেন নি। এই প্রসঙ্গে রামচন্দ্র শিক্ষাকাউন্সিলের সভাপতি বেথুনের একটি পত্র উদধৃত করে জানান যে বেথুন একবার ঈশ্বর গুপ্তকে বালকদের উপযোগী বই লিখতে অনুরোধ করে-ছিলেন। পত্রখানি এই—

7th July, 1851

Sir,

I receive many complaints from the conductors of female schools that there is no simple Bengali poetry fit for their use.

There is no doubt that much knowledge both in the way of moral precept and of general description, can be given in verse, in a form which is both more attractive to children to learn and more easy for them to remember than in prose.

I have heard from many persons that you are one of the best living writers of Bengali poetry, and you could not well be more usefully employed than in preparing a few poems for this express purpose. In England, many distinguished writers, have not thought it beneath them to compile works for the use of the young: indeed it is a far more difficult task than to write for those of full age, as will be readily acknowledged by any who have tried it, the object being to convey sound sterling sense or else beautiful and poetical ideas in simple language, suited to the comprehension of the young minds for whom they are intended. If you will devote some time to this task, and succeed in producing such a book as is wanted, your countrymen will have much reason to be obliged to you and to their gratitude I shall readily add mine. If you will call on me, I will shew you some specimens of English poems written for children, which might be of use to you. I need hardly remark on the necessity of excluding rigorously every loose or impure thought or indecent word from such a collection. I mention this, however, because it is a fault from which I understand some of your most admired writers are not wholly free.

Your sincerely
J D. W. Bethune

Baboo
Issurchunder Goopto.

হিতপ্রভাকরে সংস্কৃত হিতোপদেশের গল্পগুলিকে বিস্তৃত করে গদ্যে পদ্যে মিশিয়ে রচনা করা হয়েছে।

৫। বোধেন্দুবিকাশ ১৮৬৩

এর আখ্যাপত্র—

BODHAINDU BICASA / By the Late / Baboo Issurchander Goopto / Published / by Ramchander Goopto / Editor of the Probhakur / বোধেন্দুবিকাশ। / প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ / অর্থাৎ / স্বভাবানুযায়ি বর্ণন / মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত / প্রণীত। / প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুত রামচন্দ্র গুপ্ত / কর্তৃক প্রকাশিত। / কলিকাতা। / প্রভাকরযন্ত্রে মুদ্রিত। / সিমুলিয়া নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রিট নং ৫৪ / ১২৭০ সাল।

রামচন্দ্র গুপ্ত লিখিত উপক্রমণিকা এবং মূল বইটি মিলিয়ে পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪০। 'বোধেন্দুবিকাশ' নাটক ছয় অঙ্কে সমাপ্ত, কিন্তু বর্তমান সংস্করণে প্রথম তিনটি অঙ্ক মুদ্রিত। পরবর্তী খণ্ডে অবশিষ্ট অঙ্কগুলি প্রকাশ করবার পরিকল্পনা আছে— উপক্রমণিকায় রামচন্দ্র একথা বলেছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন যে পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার জন্য কবি এর কোনো কোনো অংশ পুনর্বার সংশোধন পরিবর্তন এবং নতুন করে রচনা করেন।

প্রবোধপ্রভাকরে বোধেন্দুবিকাশ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন ছিল—

"বোধেন্দুবিকাশ"

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ)

অর্থাৎ

স্বভাবানুযায়ি বর্ণন

যাহা গত ১ বৈশাখের প্রভাকরে প্রকাশারম্ভ হইয়া ১ ভাদ্রের প্রভাকরে শেষ হইয়াছে,—তাহার কোনো কোনো স্থান পুনর্ব্বার সংশোধিত পরিবর্ত্তিত এবং নূতনরূপে রচিত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে, কত পৃষ্ঠায় সমাধা হইবে তাহা নিশ্চিত করিতে না পারাতেই আপাততঃ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলাম না। এই নাটকে আমরা অধিক পরিশ্রম করিয়াছি এবং এ পর্য্যন্তও করিতেছি।—মূলগ্রন্থে যেরূপ আছে তাহা হইতে আমরা বিস্তর বাহুল্য রচনা করিয়াছি, কারণ প্রত্যেক বিষয়ের স্বভাব বর্ণনা করিতে হইয়াছে,—এরূপ না করিলে গ্রন্থের গৌরব এবং পাঠকপুঞ্জের প্রচুর পরিমাণে উপকার হইতে পারে না, বিষয়টি বাহিরের নহে, সুতরাং অত্যন্তই কঠিন, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞান বিষয়কে

যতদূর পর্য্যন্ত সহজে প্রকাশ করা যাইতে পারে তাহাই করা হইতেছে।— যাঁহারা নাট্য-ক্রীড়ার অনুরূপ প্রদর্শনে অনুরত হইবেন তাহারদিগের কার্য্যসাধনার্থ প্রত্যেকের বিচারাদি উক্তির শেষভাগ অতি সংক্ষেপেই লিখিযাছি। বহুবিধ ব্যাঘাতবশতঃ বিস্তর বিলম্ব হইযাছে, এইক্ষণে যত শীঘ্র পারি তত শীঘ্রই প্রকাশ করিতে সাধ্যের ত্রুটি করিব না।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, বোধেন্দুবিকাশ প্রথমত সংবাদপ্রভাকর পত্রিকা ১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখ থেকে ১লা ভাদ্র পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন 'পুরাতন সংবাদপ্রভাকর হইতে কতকগুলি মজার মজার কবিতা জোড়াতাড়া দিযা একটা 'অদ্ভুত নাট্য' খাড়া করিয়া, তাহাতে সুর বসাইযা ও-বাড়ীর বৈঠকখানায় মহা উৎসাহের সহিত তাহার মহলা আরম্ভ করিযা দিলাম। তাহাতে একটা গান ছিল,—

ও কথা আর বলো না, আর বলো না
বলছো বঁধু কিসের ঝোঁকে—
ও বড় হাসির কথা হাসির কথা
হাসবে লোকে, হাসবে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে।—'[১৭০]

এই মজার কবিতাগুলি নিশ্চযই এই সময়ের সংবাদপ্রভাকর পত্রিকা থেকে নেওয়া।

বোধেন্দুবিকাশ নাটক মূলত কৃষ্ণ মিশ্রের (একাদশ শতাব্দী) প্রবোধচন্দ্রোদয নাটকের বিস্তারীকৃত অনুবাদ। অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে কবি বহু দীর্ঘ স্বরচিত গদ্য পদ্য যোজনা করেছেন। বস্তুত নাটকটি ভাষা শব্দ ছন্দের দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি এবং ঈশ্বর গুপ্তের শিল্পীপ্রতিভার বিশিষ্ট নিদর্শন। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক সেকালে বহু পঠিত বহু প্রচলিত নাটক। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাধর ন্যাযরত্ন সংস্কৃত পাঠ এবং গদ্যে তার অনুবাদ দিয়ে নাটকটি প্রকাশ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত ঋণ স্বীকারে কৃপণ ছিলেন না। প্রবোধপ্রভাকরে পদ্মলোচন ন্যায়রত্নের নিকট সশ্রদ্ধ ঋণস্বীকার আছে—আখ্যাপত্রে এবং ভূমিকায়। সংবাদ-প্রভাকরের ইতিবৃত্তেও তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বোধেন্দুবিকাশ রচনায় কিংবা সংবাদপ্রভাকরের ইতিবৃত্তে গঙ্গাধর ন্যাযরত্নের উল্লেখ নেই। মনে হয়, ঈশ্বর গুপ্ত এই অনুবাদ অবলম্বনে নয়, মূল বই অবলম্বনেই বোধেন্দুবিকাশ রচনা করেছিলেন।

এটি একটি রূপক নাটক। মায়া-মোহ এবং বিভিন্ন আচারপ্রধান ধর্মসাধনার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়ে আত্মবোধের উদ্‌বোধনই এই নাটকের বিষয়বস্তু।

৬। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলীর সারসংগ্রহ ১৮৬২-১৮৬৪। রামচন্দ্র গুপ্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নির্বাচিত কবিতাসংগ্রহ আট খণ্ডে প্রকাশ করেন। এই খণ্ডগুলি একবারে বের হয় নি। প্রথম সংখ্যার[১১] আখ্যাপত্র—

ঈশ্বরো জয়তি। / মহাকবি / ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের / বিরচিত কবিতা-বলীর / সার সংগ্রহ / প্রথম ভাগ / প্রথম সংখ্যা / সংবাদপ্রভাকর সম্পাদক শ্রীরামচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা / সংগৃহীত হইয়া / কলিকাতা / সংবাদপ্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। সন ১২৬৯ সাল মূল্য প্রত্যেক ফরমার হিসাবে ৴০ এক আনা মাত্র।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যসাধক-চরিতে বলেছেন প্রথম তিন সংখ্যাই ১২৬৯ (= ইং ১৮৬২) সালে বের হয়। চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৭৬ (= ইং ১৮৬৯) সালে, পঞ্চম ষষ্ঠ এবং সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৮০ (= ইং ১৮৭৩) সালে এবং অষ্টম সংখ্যা বের হয় ১২৮১ (= ইং ১৮৭৪) সালে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে ১২৭৭ (=ইং ১৮৭০) সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংখ্যা আছে। (পুস্তক *৮৪ সংখ্যাত)। আর একটি বাঁধানো বইতে (পুস্তক ৮৩ সংখ্যাত) তৃতীয় সংখ্যা ১২৭৮ (= ইং ১৮৭১) পঞ্চম সংখ্যা ১২৮০ (= ইং ১৮৭৩) ষষ্ঠ সংখ্যা ১২৮০ (= ইং ১৮৭৩), সপ্তম সংখ্যা ১২৮০ (= ইং ১৮৭৩) এবং অষ্টম সংখ্যা ১২৮১ (=ইং ১৮৭৪) আছে। এই বাঁধানো বইয়ের তৃতীয় সংখ্যাটি দ্বিতীয় বারের মুদ্রণ, অন্যগুলি প্রথম মুদ্রণ। এই বইটির সম্পূর্ণ বিবরণ এই রকম—

তৃতীয় সংখ্যা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ১২৭৮

আখ্যাপত্রের পরেই পৃ ৬৫-৯৬ [১-৬৪ নেই]

পঞ্চম খণ্ড ১২৮০ সাল

আখ্যাপত্রের পরেই পৃ ১২৯-১৬০ [৯৭-১২৮ নেই

ষষ্ঠ সংখ্যা ১২৮০ সাল

আখ্যাপত্রের পরে পৃ ১৬১-১৯২

সপ্তম সংখ্যা ১২৮০ সাল

আখ্যাপত্রের পরে পৃ ১৯৩-২২৪

অষ্টম সংখ্যা ১২৮১ সাল

আখ্যাপত্রের পরে পৃ ২২৫-২২৬

পরিষৎ গ্রন্থাগারে কবিতাবলীর সারসংগ্রহ আর একটি বাঁধানো বই (পুস্তক সংখ্যা *৮১) আছে। কিন্তু তাতে আখ্যাপত্র প্রথম থেকে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত কোনো সংখ্যাতেই নেই, যদিও ১ থেকে ২৫৬ পৃষ্ঠা ধারাবাহিক এবং সম্পূর্ণ আছে, পূর্ব-বর্ণিত বইয়ের মতো ৯৭-১২৮ পৃষ্ঠা বাদে। অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে এই হৃত পৃষ্ঠাগুলি চতুর্থ সংখ্যার।

৭। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত কবিতাসংগ্রহ ১৮৮৫। এর বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

৮। কবিতাসংগ্রহ দ্বিতীয় ভাগ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত, ১২৯৩ (=১৮৮৬)

গ. কবিতাসংগ্রহের পর প্রকাশিত পুস্তক

৯। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত (বসুমতী, ১৩০৬=ইং ১৯০০) পৃ ৬+১৭০

১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত, প্রথম ভাগ ১৩০৮ (=ইং ১৯০১), পৃ ৪+১৩৭

১১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩২০ (=ইং ১৯১৩) বঙ্কিমের জীবনচরিত ও কবিত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধ সহ, পৃ ৭০

১২। গ্রন্থাবলী (দুই খণ্ডে) ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত-সম্পাদিত (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা) ১৩০৮ [=ইং ১৯০১] বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ এবং সম্পূর্ণ 'বোধেন্দুবিকাশ' নাটক সহ (২য় খণ্ডে) মুদ্রিত। প্রথম খণ্ড ৩৩৬ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ড ৩৭৬ পৃষ্ঠা।

এই বইয়ের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সম্পাদক বলেছিলেন '৺দাদামহাশয়ের কবিতাবলী পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে যেরূপ ভাবে কাটিয়া ছাটিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলীর প্রচারকালে আমরা সে পথ অনুসরণ করিব না ·· অবিকৃত ভাবেই তাহা প্রকাশ করিব।'

১৩। সত্যনারায়ণের ব্রতকথা ১৯১৩

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত। চুঁচুড়া সাহিত্য আলোচনা সমিতি হইতে প্রকাশিত। চুঁচুড়া সরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত। বিতরণের জন্য।

নিবেদনে বলা হয়েছে—

'চুঁচুড়া নিবাসী বালেশ্বরের প্রসিদ্ধ জমিদার ৺পদ্মলোচন মণ্ডল মহাশয় যখন তাঁহার জমিদারীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন পুরীধামে যাইবার পথে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। যথোচিত সমাদর-পূর্ব্বক মণ্ডল মহাশয় তাঁহাকে ছন্দোবন্ধে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন; তাহাতেই এই অমূল্য ব্রতকথা রচিত হইয়াছিল। · মূল পাণ্ডু-লিপি হইতে এই পুঁথি মুদ্রিত হইল।' ..১১১ বইখানি পুঁথির আকারের কাগজে মুদ্রিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২

ভূমিকার তারিখ ২৪এ ফাল্গুন, ১৩১৯ সাল।

ঘ সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ

১৪। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-বচিত কবিজীবনী, ভবতোষ দত্ত-সম্পাদিত, ১৯৫৮। সুশীলকুমার দের ভূমিকা ৬+লেখকের নিবেদন ৬+অবতাবণা ৫২+কবি ১৩১+কবিওয়ালা ১৩৫-৩২৪+পবিশিষ্ট ৩২৭—৩৬৪+আনুষঙ্গিক তথ্য ৩৬৭—৪৪০+কালপঞ্জী গ্রন্থপঞ্জী নির্দেশিকা ৪৪১—৪৮৯

১৫। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১৮৪০—১৯০৫ সংবাদপ্রভাকর পত্রিকাব রচনাসঙ্কলন, বিনয় ঘোষ-সম্পাদিত ও সংকলিত, ১৯৬২। শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের ভূমিকা ৭—১২+সম্পাদন-পদ্ধতি এবং সূচী ১৩—১৯+সম্পাদকীয় ২১—৪৫+রচনা-সংকলন ৪৯—৪৮৫+প্রাসঙ্গিক তথ্য ৪৮৭—৫৩৮+নির্ঘণ্ট ৫৩৯—৫৪৮।

১৬। ভ্রমণকাবি বন্ধুব পত্র, কবিবব ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত. মোহনলাল মিত্র-সম্পাদিত ১৯৬৩। ভূমিকা ১—১৬+সম্প.দকীয় [ঈশ্বর গুপ্ত-রচিত] ১৭—২৯+দেশ-বিদেশীয় পাঠক ও বন্ধুগণের প্রতি প্রভাকর-সম্পাদকের নিবেদন ৩০—৩৪+ 'ভ্রমণকারি বন্ধু' হইতে প্রাপ্ত ৩৫—১৪৩।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু ও স্মৃতিরক্ষাপ্রয়াস

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রথমত নানারোগে আক্রান্ত হন। সেই রোগ বৃদ্ধি পেয়ে প্রবল জ্বরে পরিণত হয়। রোগের প্রথম দিকে গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত এবং দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। মনে হয়েছিল চিকিৎসার ফল পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোগ বৃদ্ধির

দিকেই গেল। এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সঙ্গে দেশীয় ঔষধ জয়ন্তীপাতা দিয়ে বাঁধবার ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু রোগের উপশম দেখা না যাওয়াতে ইংরেজ ডাক্তার এলান ওয়েককে নিয়ে আসা হয়। তিনি এসে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন। বন্ধু রাজেন্দ্র দত্ত এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের উপস্থিতিতে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।

৯ই মাঘ ১২৬৫-র সংবাদপ্রভাকরে ঈশ্বর গুপ্তের ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত রোগের বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেন। ১০ই মাঘ শনিবার তিনি জানালেন,

'প্রভাকরের জন্মদাতা অথবা স্বয়ং প্রভাকর স্বরূপ শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এক্ষণে প্রায় মুমূর্ষু দশাপন্ন হইয়াছেন।'

সেই দিনই তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত্রি প্রায় একটার সময় ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুতে স্বভাবতই বাঙালি মাত্রই মর্মাহত হয়। শোকপ্রকাশক বহু গদ্য-ও পদ্য-রচনা সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সাতই ফাল্গুনের প্রভাকরে রামচন্দ্র লেখেন,

'প্রভাকর কর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের অকাল মৃত্যু সংবাদ পাঠে শোকাভিভূত হইয়া এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পত্রগ্রাহক মহাশয়েরা যে সমস্ত শোকসূচক গদ্য পদ্য বিরচন পূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিতে হইলে ছয়মাসের প্রভাকরেও স্থানের সংকীর্ণতা হয়…'

সংবাদপত্রগুলির মধ্যে দুটি পত্রিকার শোকসংবাদ উল্লেখযোগ্য। সোমপ্রকাশ লিখেছিল,[১৭৩]

'১০ মাঘ শনিবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় প্রভাকর সম্পাদক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সমাচার পাইয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। বাংলা ভাষায় পদ্য রচনা বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। ইদানীন্তন লোকের মধ্যে তাঁহার তুল্য কবিত্বশক্তি সম্পন্ন লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।'

হিন্দু প্যাটরিয়ট সাপ্তাহিক সংবাদে ঈশ্বর গুপ্তের সম্পর্কে লিখেছিল[১৭৪]

The Papers mention the death of Baboo Issur Chander Goopto, the editor of the PROBHAKAR newspaper. As a writer of light satiric verse, he had, we believe no equal among Bengali writers.

হিন্দু প্যাটরিয়টের পরবর্তী সংখ্যায়[১৭৫] ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে বিস্তৃততর উল্লেখ ছিল—

The death of Baboo Issur Chunder Goopto, wellknown as the editor of the Probhakur, recorded in our last issue sugggests reflections on the position and prospects of the metropolitan vernacular newspapers. The deceased, though he possessed in a rare proportion some of the finest qualities of the mind, was by no means a good adept in the contemporarv politics of the country; nevertheless his influence on current vernacular political literature was great. He was a powerful satirist and piquant song writer and the *Probhakur* in its palmy days bore no small resemblance to the Anti-Jacobian of the Canning-Free Giffard school in the fierceness of the satiric, the effectiveness of its irony and the general boldness of its style, though some times its fancy degenerated into low facetiousness, humour into vulgar abuse, and its point into meaningless verbiage. In the death of its editor, the *Probhakur* especially, and the vernacular press generally have however sustained severe loss The paper may continue, but the talent which lent it its previous importance cannot be replaced.

ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য নানা প্রস্তাব হয়েছিল। অনেকে কবিভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্তের কাছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এজন্য টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিলেন কবির একটি প্রস্তরমূর্তি কোনো প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন করা হক। কেউ বলেছিলেন, মেসার্স আর এম বসু কোম্পানী রামমোহন রায়ের যেমন চিত্রপট প্রস্তুত করেছেন, তারই মতো একটা কিছু করা হক। নেপালপ্রবাসী কেশবলাল ঘোষ লিখেছিলেন, চার হাজার টাকার মূলধন সংগ্রহ করে তার থেকে কোম্পানীর কাগজ কেনা হক। তার থেকে দুটি ছাত্রবৃত্তি এবং দুটি পদকের ব্যবস্থা করা হলে ভালো হয়। প্রসঙ্গত তিনি বলেন,[১৭৬]

'ঈশ্বর বাবুর দ্বারা কোনো না কোনো প্রকার উপকৃত না হইয়াছেন, এমত একটি মনুষ্যও বাঙ্গালিতে নাই···ঈশ্বরবাবুর গুণগ্রাহক দেশ-বিদেশস্থ পাঠক পুঞ্জও এত আছেন যে, তাঁহারাই মনে করিলে সকল করিতে পারেন, অন্যের

কোনো সাহায্যে আবশ্যক করে না উপরন্ত অনেকানেক সুপাত্র ছাত্র ও কবি ভ্রাতাগণ ঈশ্বরবাবুর প্রসাদাৎ কাব্যকলাপে সুসমর্থ হইয়াছেন, আবার অনেকানেকেই তাঁহার নিত্য প্রকাশিত প্রভাকর বিনামূল্যে (বরং বিনা ব্যয়ে) ঘরে বসিয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত পাঠ করিবা জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, ইত্যাদিতে উন্নতি সাধন করিয়াছেন, অতএব তাহাদের এ সময়ে কিছু মনোযোগ করা চাই নচেৎ কৃতঘ্নতার এক শেষ হইবেক ’

ঈশ্বর গুপ্তের সদাশয় চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যটির উল্লেখ বঙ্কিম করেছেন, কেশব লাল ঘোষের এই বর্ণনায় তাঁর সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রস্তাব কিংবা স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে কোনো প্রস্তাবই কার্যকরী হয়েছিল বলে মনে হয় না।

প্রায় ছয় মাস পরে একটি সম্পাদকীয়তে এ বিষয়ে আবার আলোচনা হয়।[১৭৭] কয়েকজন গুণগ্রাহী বন্ধু প্রতিকৃতি-শোভিত একটি জীবনী গ্রন্থ এবং সেই সঙ্গে একটি কবিতাসংকলনের সংকল্প করেন। রামচন্দ্র গুপ্ত নিজের ব্যয়েই জীবন-চরিত প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সকলের সাহায্যে এ কাজ আরম্ভ হলে বই বেশি সমাদৃত হবে, এ-কথা ভেবে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কাজ করেন নি। জীবনচরিত রচনার কাজ পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটিও তৈরি হয়েছিল। প্রভাকরের সহকারী সম্পাদক শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনী রচনার ভার গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের বন্ধু, দীর্ঘকাল তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন। কবির জীবনের ঘটনা অনেক কিছুই তাঁর জানা থাকবার কথা। কিন্তু এই বইখানি কখনো লেখা হয়েছিল বলে জানি না। ১৮৬৯-এ প্রকাশিত কবিচরিতে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তের একটি অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়েছিলেন, তার পরেই প্রামান্য দীর্ঘ জীবনচরিত রচনা করলেন বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। কবিতা সংকলনও তিনি করলেন। অবশ্য এ কাজ রামচন্দ্র গুপ্ত আগেই আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। এই বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে কবির কোনো চিত্রপটও শেষ পর্যন্ত হয় নি। ঈশ্বরচন্দ্র যখন অত্যন্ত পীড়াগ্রস্ত সেই সময় নিউল্যাণ্ড সাহেবকে যন্ত্রালয়ে আনিয়ে ডাগ্রোডাইপ যন্ত্রদ্বারা তাঁর একটি চিত্র প্রস্তুত করা হয়। কবির মৃত্যুর পর আশুতোষ কর নামক জনৈক ব্যক্তি সেই ছবি নিয়ে যান। অনেক কষ্টে সেই ছবি তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করা হল বটে, কিন্তু সংবাদভাস্করের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় আশুতোষ ফটোগ্রাফি করে সেই ছবির এক হাজার কপি প্রস্তুত করেছেন এবং এক টাকা করে বিক্রি করেছেন।[১৭৮] ঈশ্বর গুপ্তের যে একটি

মাত্র ছবি পাওয়া যায়, তা সেই শায়িত অবস্থার। এটিই সেই নিউলেণ্ড সাহেবের তোলা ছবি।

ঈশ্বর গুপ্ত নিঃসন্তান ছিলেন। সংবাদপ্রভাকরের সমস্ত স্বত্ব উইল করে ভাই রামচন্দ্র গুপ্তকে তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। সমাচার চন্দ্রিকা লিখেছিল—

'মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল, শুনিলাম একখানি ঐচ্ছিক পত্র লিখিয়া গিয়াছেন, প্রভাকর যন্ত্রাদি তাবৎ সম্পত্তি তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান রামচন্দ্র গুপ্তকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন আমরা ভরসা করি উক্ত পত্র চলিতে থাকিবেক।'[১৭৯]

বিনয়কৃষ্ণ দেব কলিকাতার ইতিহাসে একটি কথা বলেছেন, সে-কথাটির সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারি নি। কথাটি এই—

'কিন্তু জীবনের শেষ দশায় তিনি দারুন দুরবস্থায় পতিত হন এবং মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আশ্রয়ে তাঁহার খড়দহস্থ বাগানবাটীতে বাস করেন। তথায় ঈশ্বরচন্দ্রের কুঞ্জ নামক একটি কুঞ্জ অদ্যাপি তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে।[১৮০]

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা

সংবাদপ্রভাকরে এবং সংবাদ সাধুরঞ্জনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনাগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত বঙ্কিমরচনাবলীর 'বিবিধ' খণ্ডে উদ্‌ধৃত আছে। শচীশ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত বঙ্কিমজীবনীর তৃতীয় সংস্করণের সমালোচনা উপলক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৩৮-এর 'শনিবারের চিঠি'তে বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচনাগুলি নিয়ে কার্তিক ও তৎপরবর্তী সংখ্যায় একটি বিবরণাত্মক আলোচনা করেন। তাতে তিনি বলেন 'বঙ্কিমচন্দ্র কখন নিজ নামে কখনও "শ্রী ব, চ, চ" অথবা "শ্রীঅষ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায়" আবার কখনও বা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নামে সংবাদপ্রভাকরে লিখিতেন।'[১৮১] এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীঅষ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-স্বাক্ষরিত দুটি কবিতাও উদ্‌ধৃত করেছেন, যথাক্রমে কার্তিক এবং মাঘ সংখ্যায়। অষ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার শিরোনাম এই—

রূপক

শ্রীরাধিকা নিশাবসানে স্বীয় সখীগণে সম্বোধন পুরঃসর সকল দিগ্‌দর্শন করিয়া স্বাভিপ্রায় প্রকটন করিতেছেন।

চন্দ্ররেখা চতুষ্পদী।

দেখ সব সখীগণ নলিনীর সুলক্ষণ
কুমুদিনী বিলক্ষণ হইছে মুদিত গো।...[১৮২]

শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্ধৃত কবিতাটি গদ্য পদ্য মিশ্রিত। প্রথম অংশ গদ্যে রচিত।—

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

স্বপ্ন রূপক

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং।

সম্পাদক মহাশয়! সদুক্তি কতিপয় পঁক্তি আক্ষেপোক্তি ভবদীয় প্রধান পক্ষপাত-বিহীন প্রভাকর পত্রৈক প্রান্তে স্থান দান করিয়া উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

একদা যামিনীযোগে নিদ্রাবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বিবিধ বিটপিপরিবেষ্টিত কোন নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলাম। তথায় তৎসময়ে কুসুম সময় সম্ভব নানা জাতি প্রসূন তরুণ তরু লতাগণে দ্বিজগণের বেদধ্বনি হইতেছিল। আর দক্ষিণ হইতে সুশীতল মলয়বাত অচিরাৎ সুগন্ধ সহিত মন্দ মন্দরূপে বহিতেছিল। স্থানে স্থানে অত্যুচ্চ পর্ব্বত গুহাতে কত শত বনচরগণ পরিভ্রমণ করিতেছিল।...[১৮৩]

অষ্টমাবতারের কবিতার নীচে ছিল 'হুগলি কালেজ সাং গৌরীভা', শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার নীচে ছিল 'হুগলি কালেজের ছাত্র। সাং গৌরীভা। ১৯ চৈত্র ১২৫৯ সাল।' উল্লেখযোগ্য এই যে বঙ্কিমচন্দ্রেব স্বনামাঙ্কিত কবিতার নীচে কোনো স্থানের নাম নাই। তিনি তখন কাঁটালপাড়া থেকে যাতায়াত করতেন।

এই দুই নাম যে বঙ্কিমচন্দ্রেরই ছদ্মনাম—একথা মনে করবার কোনো কারণের উল্লেখ ব্রজেন্দ্রনাথ করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধীয় সেকালের নানা স্মৃতি-কথা বা রচনাতেও এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।[১৮৪] এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁর রচনাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাসের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ বাংলা সনে, তাতেও তাঁরা এই রচনাগুলি অন্তর্ভুক্ত করেন নি। এর থেকে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এই দুই লেখকের অভিন্নতা বোধহয় তাঁরা আর বিশ্বাস করতেন না, অন্তত এ বিষয়ে তাঁদের সংশয় ছিল, সেইজন্যই এদের বঙ্কিমরচনাসংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি।

বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র যে অষ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এই ছদ্মনাম দুটি ব্যবহার করেছিলেন এ কথার পক্ষে কোনো প্রমাণই নেই। রচনা পরীক্ষা করলেও এই রকমই মনে হওয়া স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষরিত যে দুটি গদ্য রচনা[১৮৫] পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হয়েছে তাদের সঙ্গে তুলনায় শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যরচনা অনেক সরল। এক বৎসরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনা সরল হয়ে গিয়েছিল, এমন অনুমানও যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা সন্দেহ। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলী কলেজের জুনিয়র ডিপার্ট-মেণ্টের ছাত্র, সেই বছর তাদের ফল খুব শোচনীয় হয়। তাঁদের নম্বর গড়ে ছিল এগারো আর কৃষ্ণনগরের ছাত্রদের ছিল গড়ে আটাশ। এ রকম অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ে সকলেই বিস্মিত হয়ে যান। অধ্যক্ষ মহাশয় এর জন্য পরীক্ষককেই দোষারোপ করেন।—

> The Principal explained it, probably with perfect truth, as due to "some bias in the mind of the Examiner in regard to what he considers a good vernacular style." The examiner for that year was Iswarchandra Vidyasagar, who, as a product of the Sanskrit College had "imbibed the notion that that only is a good Bengali style in which there is a considerable infusion of high Sanskrit words.[১৮৬]

অধ্যক্ষ মহাশয়ের এই কৈফিয়ৎ যে অন্তত বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ঠিক নয়, তার প্রমাণ ১৮৫২-র ২৩-এ এপ্রিল সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'গদ্য' নামে রচনাটি। এই গদ্যরচনাটি এবং ১০ই জুলাই ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের 'বর্ষাঋতু' নামে রচনাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের যে নমুনা পাই, তাকে কোনো মতেই সরল বলা চলে না। অনুপ্রাস এবং দুরূহ শব্দে রচনা দুটি কণ্টকিত। প্রায় এক বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র যদি শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নামে সংবাদপ্রভাকরে রচনা পাঠিয়ে থাকেন, তবে বলতে হয় এক বৎসরে তিনি চেষ্টা করেই গদ্যরীতিকে সরল করে ফেলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষরিত এবং সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত প্রথম কবিতা 'পদ্য'।[১৮৭] এর প্রথম চারিটি পংক্তি—

চন্দ্রাস্য সহাস্য করে, ঊষাকালে সতী।
প্রিয়করে করি করে, কহে পতি প্রতি॥
প্রিয়া প্রতি পতি তার করিছে উত্তর।
চরণে চরণে দেয়, উত্তর সত্তর॥

এই কবিতাটি ২৫-এ ফেব্রুয়ারি ১৮৫২-তে প্রকাশিত হয়। কবিতাটির শেষে সম্পাদকের মন্তব্য ছিল—

'উক্ত ছাত্রের বযস অত্যল্প, কিন্তু এই পদ্য অতি প্রধান কবির রচনার ন্যায উত্তমরূপে রচিত হইযাছে এজন্য সকলেই তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন।'

প্রং সম্পাদক।

এই কবিতাটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত কবিতা অন্য বিপরীত প্রমাণের অভাবে এই সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য। এই কবিতাটি সম্বন্ধে বঙ্কিমরচনালীর সম্পাদকেরা বলেছেন[১৮৮]—

'ইতিহাসের দিক দিযা এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫-এ ফেব্রুয়ারি তারিখের সংবাদপ্রভাকরে সম্ভবতঃ তাঁহার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়, তাঁহার বয়স তখন ১৪ বৎসর পূর্ণ হয নাই। ইহার পর ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সংবাদপ্রভাকরেই রচনা প্রতিযোগিতা ও কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয।'

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয প্রকাশিত কবিতা 'বিরলে বাস'। এই কবিতাটি 'সমাচার-দর্পণ' পত্রিকায় ২৮ ফেব্রুযারি ১৮৫২-তে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাব একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে, সে-ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। যতদূর মনে হয়, কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্র সংবাদপ্রভাকরেই প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু যে-কারণেই হক সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত কবিতাটি প্রকাশ করেন নি। অতঃপর এই কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্র সমাচারদর্পণ-এ পাঠান। সেখানে প্রকাশিত হয, কিন্তু কয়েকটি ছাপার ভুল হয়। তাতে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ রুষ্ট হন এবং সংবাদপ্রভাকরেই আবার এ সম্বন্ধে লেখেন। সেই পত্র থেকে জানা যায় কবিতাটি প্রকাশ না করায বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তকে রূঢ ভাষায পত্রাঘাত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয পত্র—

'শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয সমীপেষু। যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ অত্র অকিঞ্চন মূঢতা প্রযুক্ত তল্লিখিত পত্রে প্রেরিত পত্রাদি অপ্রকাশ বিষয়ে কিঞ্চিৎ রূঢ ভাষা প্রয়োগ হইয়াছিল, এইক্ষণে কৃতাপরাধী দয়াবীর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। পত্র প্রকাশেই সন্তুষ্ট থাকিবেক।

সংপ্রতি সমাচারদর্পণ সম্পাদক মহাশয় আমাব বিস্তর হানি করিয়াছেন। মহাশয়ের আশ্রয়ে তদ্বিপক্ষে লেখনী ধারণ করিতেছি অনুকম্পা সম্পাদনে আশ্রয় প্রদান করিবেন, অর্থাৎ নিম্নলিখিত বিষয় প্রভাকরে প্রকটনে পরম বাধিত করিবেন।

দর্পণ

"দর্পণ পারাহারা হইলে" কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব সুন্দররূপে দৃষ্ট হয় না।

"শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"* অস্মন্নাম ইত্যঙ্কিত মৎকরণক অনুবাদিত বিষয় ৪৪ সংখ্যক দর্পণে প্রকটি[illegible] গুণেই হউক বা মুদ্রাঙ্কনের দোষেই হউক, সেই অনুবাদের উল্‌টা শ্রী হইয়াছে, তাহা পাঠমাত্র দন্তে কপাট লাগিবেক, আর অন্য পাঠ থাকিবেক না।

দর্পণের ৩৫২ পৃষ্ঠায় চতুর্থ স্তম্ভে তাহাব প্রথম চরণ নিম্ন প্রকার প্রকাশ হইয়াছে।

বিষয়ে রিক্ত হয়া স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে।

সম্পাদক মহাশয় আপনী ও পাঠকগণ সুপণ্ডিত বটেন, ইহার অর্থ কি বলিতে পারি না, আপনাবা কহিবেন যে ইহা প্রকৃত nonsense আরো ত্রয়োদশ অক্ষবে পয়ার কখন শুনিয়াছেন ? আমি প্রথম চরণে লিখিয়াছিলাম।

বিষয়ে বিরক্ত হয়ে স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে ॥

কিসে কি হইয়াছে "দেব গঠিতে বানর হইয়াছে।

অপিচ নবম পংক্তিতে।

অভিমানেতে জন্মে, যে প্রশংসা বায়।

ত্রয়োদশাক্ষরে পয়ার। আরো honour অর্থ কি অভিমান। এবং অভিমানে কি প্রশংসা জন্মায় ? আমি লিখিয়াছিলাম।

তুচ্ছমান হতে জন্মে, যে প্রশংসা বায়।

ভাল। ভাল।

অন্যান্য সামান্য দোষের তালিকা ৪ পংক্তিতে 'মহাপ্রেম' পরিবর্তে 'নিত্যপ্রেম' হইবেক।

১০ পংক্তিতে 'মলয়াতে' 'মলয়জে' হইবেক। ১১ পংক্তিতে পুষ্প পরিবর্ত্তে 'পুষ্পে' হইবেক।

অতএব দর্পণ সম্পাদককে অনুরোধ করি যে আগত সংখ্যায় ভ্রম সংশোধন করিবেন এবং ভবিষ্যতে এই প্রকার না হয় এমত ··বেন ইতি।

পুনশ্চ···

দৃশ···'১৮৯

* My own name.

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কবিতাটি একটি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ। সমাচারদর্পণে সম্পাদকীয় সংশোধন-উপলক্ষে অনুবাদে ভুল অর্থ হওয়ার কথা বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া 'অনুবাদিত বিষয়' বলেও এর উল্লেখ করেছেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই কবিতার মূল নির্ণয় করতে পেরেছি। কবিতার লেখক উইলিয়ম ড্রামণ্ড (১৫৮৫-১৬৪৯)। কবিতাটি এই—

Thrice happy he who by some shady grove
Far from the clamorous world, doth live his own,
Though solitary, who is not alone,
But doth converse with that eternal love,
O how more sweet is birds harmonious moan,
Or the hoarse sobbings of the widow'd dove,
Than those smoth whisperings near a prince's throne,
Which good make doubtful, do the evile approve !
O ! how more sweet is zephyr's wholsome breath,
And sighs embalm'd, which newborn flowr's unfold
Than that applause vain honour doth bequeth !
How sweet are streams to poison drank in gold !
The world is full of horrors, troubles, flight :
Woods' harmless shades have only true delight.[১৯০]

এই কবিতাটি রিচার্ডসনের *Selections from the British Poets* পৃ ৩৩৯-এ সংকলিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত সেখান থেকেই অনুবাদ করেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে ১৮৫১-৫২ সালে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন, তখন রিচার্ডসনের বই পড়তে হত না। এ বই উচ্চতর শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল।[১৯১]

২৩-এ এপ্রিল ১৮৫২-র সংবাদপ্রভাকরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গদ্যরচনা প্রকাশিত হয়। 'গদ্য' এবং 'ছাত্র হইতে প্রাপ্ত' এই কথা কয়টি ছাড়া এতে আর কোনো শিরোনামা ছিল না। মানবজীবনের নশ্বরতা এবং ভোগসুখের বিফলতা এই রচনার বিষয়। বর্ণনার রীতি ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতকের অনুরূপ। রচনাটি বেশি বড়ো নয়, ভাষাও সংস্কৃতশব্দবহুল এবং অনুপ্রাসপূর্ণ। এই রচনার প্রথম বাক্য

'গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পা সকাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহঃরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে।'[১৯২]

এই রচনাটির নীচে ছিল 'শ্রী ব. চ চ' ও 'হুগলী কালেজ'। ঈশ্বর গুপ্তে মন্তব্য ছিল—

'ইহার লিপিনৈপুণ্য জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের উপ অধিক নিভর না করেন এবং অক্ষরগুলীন স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

প্রভাকর সম্পাদক।'

সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় কবিতার নাম 'জীবন ও সৌন্দ অনিত্য'।[১৯৩] ২৮ এ মে ১৮৫২-র সংখ্যায় প্রকাশিত এই কবিতায় কোনে সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল না।

৯ই জুলাই ১৮৫২ সংবাদপ্রভাকরে 'সৎপ্রবন্ধ' নামে একটি গদ্যরচনা প্রকাশিত হয়। লেখক 'কস্যচিৎ হুগলি কালেজস্থ ছাত্র'। এই ছাত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রই কিনা বলা যায় না।

পরের দিনই অর্থাৎ ১০ই জুলাই 'শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায হুগলী কালেজ' স্বাক্ষরিত 'বর্ষা ঋতু' নামে একটি গদ্যরচনা মুদ্রিত হয়।[১৯৪] উপরে একটি ক্ষুদ্র বিবরণ ছিল—

(গুণাকর জনসহ সাক্ষাদভিলাষে নিবাশ জনস্য বিবচিত)

এতেও সম্পাদকের কোনো মন্তব্য ছিল না।

২১-এ জুলাই ১৮৫২ সংবাদপ্রভাকরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বর্ষায় মানভঞ্জন' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটি ত্রিপদী ছন্দোবন্ধে নায়িকার প্রতি নায়কের উক্তি। মাঝে মাঝে পয়ারে কবির মন্তব্য। কবিতার সর্বশেষের কয় পংক্তি—

নিবিড নীরদ নব, নিরখি নয়নে।
বাহিরেতে গিযা ধনী, ভাবিতেছে মনে॥
ঘন ঘন ঘননাদ, গভীরা যামিনী।
পলকে পলকে তায, নলকে দামিনী॥
মানে মানে মান হরি, মানিনী ভামিনী।
গরবেতে গৃহে যায়, গজেন্দ্রগামিনী॥
মানের নিগূঢ ভাব, শেষ গেল বোঝা।
সুখেতে বঙ্কিমচন্দ্র, হইলেন সোজা॥

কবিতার শেষে ঈশ্বর গুপ্তের মন্তব্য—

'এই পদ্য সর্ব প্রকারেই উত্তম হইয়াছে, আমরা সানন্দে প্রকাশ করিতেছি এতৎপাঠে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন, এই স্থলে কবিভ্রাতাদিগো অনুরোধ করি

তাঁহারা ভগ্নোদ্যম না হইয়া ক্রমশঃ রচনাকল্পে অনুরাগি হইবেন এবং উত্তম উত্তম বিষয় সকল মনোনীত করিয়া লইবেন আর তাঁহার দিগের রচিত কবিতার যে যে পদ সংশোধিত হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, অপিচ যদি ইংরাজী হইতে কোন পদ্যের অনুবাদ করণে নিতান্তই অভিলাষ করেন তবে এমত সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন যাহার যথার্থ মর্ম্মার্থ সহজে প্রকাশ হইতে পারে, ইংরাজী-ভাষানভিজ্ঞ জনেরা তাহা পাঠ মাত্রেই সুখি হইতে পারেন এবং ইংলণ্ডীয় কবির সেই কবিতার শরীরে যেন গুরুতর আঘাত না হয়। আমরা এইরূপ অনুবাদিত পদ্য এত অধিক প্রাপ্ত হই যাহা কেবল দোষে পরিপূর্ণ। তৎসমুদয় কোনমতেই শোধিত হইতে পারে না। অতএব লেখকেরা যদি এ বিষয়ে বৃথা পরিশ্রমে বিরত হইয়া মনের ভাবে পদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন তবে কত সখের [সুখের ?] ব্যাপার হয়। তাহাতে অনর্থক সময় নষ্ট হয় না অথচ বহুল উপকার সম্ভাবনা। বিলাতী কবিতার ভাবভঙ্গী অভিপ্রায়াদি এদেশের সহিত সংপূর্ণরূপে বিপরীত সুতরাং তাহার তাৎপর্য রক্ষা করিয়া বঙ্গভাষায় কবিতা রচা বড সহজ নহে, প্রায় হয় না বলিলেই হয়, এ কারণ যাঁহাব যাঁহার রচনা অপ্রকাশিত থাকে তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইবেন না, যে লেখার সর্ব্বাঙ্গ অপকৃষ্ট তাহাই অগ্রাহ্য করা যায, নচেৎ আমরা বহু যত্নে সংশোধন করিয়া প্রকটন করণে ত্রুটি করি না যাহা হইক অধুনা হিন্দু, হুগলি, কৃষ্ণনগর কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের কোন কোন সুপাত্র ছাত্র গদ্য পদ্য উভয় বিষয়েই আমাদিগকে পরিতুষ্ট করিতেছেন।

প্রভাকর সম্পাদক'

এর পরে ১০ই জানুয়ারি ১৮৫৩ প্রকাশিত হয় 'হেমন্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন'। এর প্রথম কয়েক পংক্তি—

পতি

লঘু ত্রিপদী

রাখ রাখ প্রিয়ে, বসনে ঢাকিয়ে,
জলদ চাঁচরচয়।
দেখে জলধর, ভয়ে শশধর,
হুতাশেতে ম্লান হয়॥

এই কবিতাটির নীচে সম্পাদকের মন্তব্য ছিল 'উৎকৃষ্ট প্রং সং।'

অতঃপর ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩ তে শিশির বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রী পতির কথোপকথন প্রকাশিত হয়। এই কবিতার প্রথম কয়েক পংক্তি এই রকম—

লঘু ললিত

স্ত্রী। হইয়াছে জল বড়ই শীতল
ছুঁইলে বিকল, হইতে হয়।
আগে যে জীবন, জুড়াত জীবন,
সে বন এখন, নাহিক সয়॥

এই কবিতায় রচনা-তারিখ ছিল ৭ মাঘ [১২৫৯]। নীচে সম্পাদকের দীর্ঘ মন্তব্য ছিল—

'বঙ্কিমচন্দ্রের বিরচিত কবিতার সুবঙ্কিম ভাব কৌশল সকল অতিশয় সন্তোষ-জনক, ইনি রূপক বর্ণনাস্থলে নায়ক নায়িকার কথোপকথন ছলে যে সমস্ত প্রগাঢ় ভাব ব্যক্ত করেন তদ্দৃষ্টে সুপণ্ডিত ভাবুক মাত্রেই প্রীত হইয়া থাকেন। ইনি অতি তরুণ বয়সে অতি প্রবীণ সুরসিক জনের ন্যায় মন হইতে অতি আশ্চর্য্য নূতন নূতন ভাবসকল উদ্ভূত করিতেছেন। এ অংশে ইঁহার প্রশংসা বর্ণনে বর্ণাবলী বলহীনা, ফলে এইস্থলে একটি অনুরোধ এই, যে, বঙ্কিম পদ্য রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাবগুলীন্ প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিম ভাষা ব্যবহার না করেন, যত ললিত শব্দে পদ বিন্যাস করিতে পারিবেন ততই উত্তম হইবেক। এবং "এবে, করয়ে, ছেনু, গেনু ইত্যাদি প্রাচীন কবিগণের প্রিয় শব্দগুলীন পরিহার করিতে পারিলে আরো ভাল হয়। অপিচ প্রতিনিয়তই আদিরসের সেবা না করিয়া এক একবার অন্য রসের উপাসনা করা কর্ত্তব্য হইতেছে, তাঁহার পদ্য অস্মদাদির অন্তঃকরণ প্রেমাভিষিক্ত করিয়া থাকে এজন্য অবিলম্বে আদ্য ছাড়িয়া অপর কোন রসের এক প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন।

প্রভাকর সম্পাদক'

'দূরদেশ গমনের বিদায়' কবিতাটি পরবর্ত্তী ১৭ই ফেব্রুয়ারির প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। এতে সম্পাদকের কোনো মন্তব্য ছিল না। এর প্রথম কয়েক পংক্তি—

পতি

ললিত

একবার দেখি আর দেখি দেখি এইবার
দেখি ফিরে বিধুমুখ দেখি আঁখি ভরি-লো।
আজিকার নিশী ভোরে, লয়ে যাবে কোথা মোরে,
কতদিন তোমা বিনে, রহিব কি করি-লো॥

দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর গুপ্তের নিষেধ সত্ত্বেও এই কবিতায় বঙ্কিম পতি-পত্নীর কথোপকথনছলে আদিরসই পরিবেশন করেছেন।

এর পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কামিনীর প্রতি উক্তি' প্রকাশিত হয় ১৮ই মার্চ ১৮৫৩। দ্বারকানাথ আধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে কবিতা-প্রতিযোগিতা হয়েছিল এই কবিতাটি তারই অন্যতম। এর আরম্ভ এই রকম—

রূপক

কামিনীর প্রতি উক্তি

তোমাতে লো ষড়ঋতু।

পয়ার

অপরূপ দেখ একি শরীরে তোমার।
এক ঠাই ষড়ঋতু, করিছে বিহার॥
নিদাঘ, বরষা, আর শরদ হেমন্ত।
নিরখি শিশির আর দুরন্ত বসন্ত॥
এ সবার সেনা আদি, তোমাতে বিহরে।
গ্রীষ্ম, বর্ষা শরদাদি, কহি পরে পরে॥

এই কবিতা সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের কোনো মন্তব্য ছিল না। প্রতিযোগিতার কবিতা বলেই তিনি নীরব ছিলেন। কিন্তু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং বিশ্বম্ভর দাসবসু যে মন্তব্য করেছিলেন যথাস্থানে সেগুলি উদ্‌ধৃত হয়েছে।

৩০ মার্চ ১৮৫৩ 'চন্দ্রদূত' কবিতাটি মুদ্রিত হয়। সম্পাদকের মন্তব্য ছিল না। এর আরম্ভ—

রূপক

ত্রিপদী

দ্বিযাম যামিনী যায় আমরি কি শোভা তায়,
নিরখি নির্ম্মল নদী তীরে।
নিরমল নীলাকাশ, সীমা বিনা সুপ্রকাশ
মাঝে হেরি মধুর শশিরে॥

২৮-এ এপ্রিল ১৮৫৩ প্রকাশিত হয় 'বসন্তের নিকট বিদায়'। এর আরম্ভ—

ত্রিপদী

হা বসন্ত মনোহর, হা মোহন রূপধর
হা রে হৃদি বিচঞ্চলকর।
লইয়ে রূপের ভার, কেন কর পরিহার
এ মহী মণ্ডল মনোহর॥

এতেও সম্পাদকের কোনো মন্তব্য নেই।

এর পরে ২৭-এ মে ১৮৫৩ প্রকাশিত হয় 'বিচিত্র নাটক'।[১৯৫] এই কবিতা বস্তুত 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের' অন্তর্গত। কবিতাব সম্পূর্ণ নাম 'বিচিত্র নাটক / (তিন মিত্রের কথোপকথন)'। এর আরম্ভ—

প্রথম মিত্র

কি বিষাদে মুখখানি, হাসি-ভবা নাই।
বেণা বনে বোসে কেন উঠ উঠ ভাই॥

এই কবিতায় সম্পাদকের কোনো মন্তব্য ছিল না।

সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী রচনা 'বর্ষা বর্ণনাছলে দম্পতির রসালাপ।'[১৯৬] এর আরম্ভ—

কামিনী

ত্রিপদী

দেখি কি হে ভয়ঙ্কর গরজিয়ে গর গর
ব্যাপিল গগনে নবঘনে
নবনীল নিরুপম অর্দ্ধ তমস্বিনী সম
জ্বলিছে দামিনী ক্ষণে ক্ষণে॥
ঘনঘোর গরজনে বিদারে গগনে বনে
তীক্ষ্ণ তীর সম বরিষয়।
বল বল প্রাণনাথ কেন কেন অকস্মাৎ
গরজন বরিষণ হয়॥

২৭ সেপটেম্বর ১৮৫৩-তে কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের অন্তর্গত আর একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়—

'কালেজীয় কবিতার মারামারি
বিষম "বিচিত্র নাটক
অর্থাৎ
কবিদের মজলিশ এবং ঐ
নাটক দর্শন।

এই শিরোনামের 'মারামারি' শব্দটার একটি পাদটীকা ছিল—

শুনিতে পাই প্রভাকরে নাকি দুটো বীর আসিয়া বড় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। একটি না কি আবার আশে পাশে কামড় মারিতে আরম্ভ করিয়াছে বেশ আমিও একবার এই সময় সাহেবদের সেলাম ঠুকিয়া যাই কিন্তু নিজে বীর নহি, যুদ্ধ করিব না, চড়টা চাপড়টা মারামারিই ভাল।'

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী কবিতা 'শরদ্বর্ণনাছলে দম্পতির কথোপকথন' ৩ অকটোবর ১৮৫৩ সংবাদ সাধুরঞ্জনে প্রকাশিত হয়েছিল।

সংবাদ সাধুরঞ্জনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশিত দ্বিতীয় কবিতা 'বসন্তবর্ণনাছলে দম্পতির কথোপকথন'। প্রকাশের তারিখ ২৪ অকটোবর ১৮৫৩।

শচীশ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন পনেরো ষোলো বছর বয়স থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র সংবাদপ্রভাকরে কবিতা লেখা ছেড়ে দেন। কথাটা সত্য হতে পারে। কারণ এর পর সংবাদপ্রভাকরে বঙ্কিমের কোনো কবিতা প্রকাশের কথা জানা যায় না। তবে কিছুদিনের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'ললিতা ও মানস' বইটি বেরোয়। ১৮৫৬ সালের ৩০-এ জুনের প্রভাকরে বইটির একটি বিজ্ঞাপন বেরোয়—

বিজ্ঞাপন
ললিতা ও মানস

উক্ত উভয় পুস্তক পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে মতকর্তৃক বিরচিত হইয়া সংপ্রতি প্রকাশ হইয়াছে। যাঁহার প্রয়োজন হয় প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা পটলডাঙ্গার ৮৬নং নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরিতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। ঐ পুস্তকদ্বয় একত্রে বান্ধা হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়[২৭]

বইটির সমালোচনা করেন ঈশ্বর গুপ্ত ২৮-এ জুলাই ১৮৫৬ (১৪ শ্রাবণ ১২৬৩) তারিখের সংবাদপ্রভাকরে—

'হুগলি কালেজের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গভাষায় যেরূপ সুলেখক ও সুকবি তাহা প্রভাকর পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত আছেন। তাঁহার লিখিত অনেক কবিতা এতৎপত্রে প্রকাশ হইয়াছে, বিশেষতঃ হিন্দু কালেজ কৃষ্ণনগর কালেজ এবং হুগলি কালেজের ছাত্রদিগের কবিতাবিষয়ক সংগ্রাম সময়ে তিনি একজন মহারথী সেনাপতি ছিলেন, সম্প্রতি বঙ্কিমবাবু 'ললিতা ও মানস' নামে একখানি পুস্তক রচনাপূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কন করিয়া আমারদিগের নিকট পাঠাইয়াইছেন আমরা তাহা পাঠ করতঃ পরম পুলকিত হইলাম, যেহেতু এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বিলক্ষণ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইয়াছে, লেখক মহাশয় স্থানে স্থানে যে সমস্ত সদ্ভাব করিয়াছেন তাহাও উত্তম হইয়াছে, আমরা পাঠক মহাশয়দিগের পাঠার্থ ঐ পুস্তক হইতে এক স্থানের লেখা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম· [১৯৮]

কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ ও কবিতাপ্রতিযোগিতা

সংবাদপ্রভাকরে দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দ্বারকানাথ অধিকারী নিয়মিত কবিতা লিখতেন। তখন তাঁরা সকলেই স্কুলের বালক। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী কালে দীনবন্ধু-প্রসঙ্গে লিখেছেন

'ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঈশ্বর গুপ্ত তরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন।'

আমাদের আলোচ্য তিনজনের মধ্যে দীনবন্ধুই সর্বপ্রথম সংবাদপভাকরে কবিতা লেখেন। কবিতাটির নাম 'জামাইষষ্ঠী' (৫ জুন ১৮৫১)। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, দীনবন্ধুর প্রথম রচনা 'মানবচরিত্র' সংবাদ সাধুরঞ্জনে বেরিয়েছিল। তখন দীনবন্ধুর বয়স অল্প। সেই কবিতা পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কবিতা 'চন্দ্রাস্য সহাস্য করে' সংবাদপ্রভাকরে বেরোয় ১৮৫২, ২৫ ফেব্রুয়ারি। যতদূর জানা যায় দ্বারকানাথ অধিকারীর প্রথম কবিতা 'তত্ত্বপ্রকরণ' ওই পত্রিকায় বেরিয়েছিল ১৮৫২ ৩ জুলাই।

১৮৫৩-র মে মাস থেকেই আরম্ভ হল 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ'। শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' লিখেছেন,

'তখন প্রভাকরে উত্তরপ্রত্যুত্তরে কবিতা লেখা যুবক লেখকদিগের একটা

মহা উৎসাহের ব্যাপার ছিল। এই সকল বাক্‌যুদ্ধ কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ নামে গ্রথিত হইয়াছে।'

তখনও নতুন বাংলা কাব্যের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। মুদ্রাযন্ত্র যখন ছিল না, তখন মুখে মুখে কবিতা রচনা করা এবং উত্তরপ্রত্যুত্তর রচনা করা ছিল সাহিত্যামোদ। ঈশ্বর গুপ্ত সেই সময়ের অভ্যাস দিয়ে আরম্ভ করেছিলেন সাহিত্য-জীবন। তারপর মুদ্রিত পত্রিকার সম্পাদক ও কবি হয়ে মুদ্রিত রচনার মধ্যে দিয়েই সেকালের সাহিত্য-প্রথাকে অনুকরণ করেছিলেন। 'কালেজীয় কবিতা-যুদ্ধ' পুরাতন এবং নতুন যুগের সন্ধিস্থলের সাহিত্যরীতির সর্বশেষ নিদর্শন। দীনবন্ধু কলকাতা থেকে, বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি থেকে এবং দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর থেকে সংবাদপ্রভাকরে উত্তর-প্রত্যুত্তর রচনা করে পাঠালেন। এই কবিতাযুদ্ধ সর্বপ্রথম আরম্ভ করেন দ্বারকানাথ অধিকারী। 'কালেজীয় কবিতা-যুদ্ধের সন্ধিপত্রে' দ্বারকানাথ একটি মন্তব্যে এ-কথাই মনে হয়,

'এই ঘৃণিত বিবাদের সূত্রপাত আমা হইতেই হয়, এজন্য আমি ইহাতে সংপূর্ণ দোষী তাহা স্বীকার করিয়া উক্ত কবি ভ্রাতাদ্বয়ের বিশেষত মিত্র মিত্রের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা কারতেছি।'

দ্বারকানাথের এই প্রথম কবিতাটি পাওয়া যায় নি। সম্ভবত ১৮৫৩-র মে মাসে লিখেছিলেন এবং ২৫ মের আগেই বেরিয়েছিল। অতঃপর রচনাগুলির কালানুক্রমিক তালিকা এই—

১। সত্যের মহিমায় পাপের পরাজয়
দীনবন্ধু মিত্র ২৫ মে ১৮৫৩

২। বিচিত্র নাটক
বঙ্কিমচন্দ্র ২৭ মে ১৮৫৩

৩। দ্বারকানাথের একটি কবিতা (আংশিক)
জুন ১৮৫৩

৪। সরস্বতীর খেদ ও দ্বিতীয় বরপুত্রের সহিত কথোপকথন
দ্বারকানাথ অধিকারী জুলাই ১৮৫৩

৫। চোখে আঙুল দিয়ে বুঝাইয়ে দিই
দীনবন্ধু ৯ আগস্ট ১৮৫৩

৬। অসভ্য ও তদীয় পালকপুত্রের বৃত্তান্ত
দ্বারকানাথ ৯ সেপটেমবর ১৮৫৩

৭। কালেজীয় কবিতার মারামারি / বিষম বিচিত্র নাটক
বঙ্কিমচন্দ্র ২৭ সেপটেমবর ১৮৫৩

৮। হাতে হাতে পাপের ফল
দীনবন্ধু ১৭-১৮ নভেমবর ১৮৫৩

৯। কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের সন্ধিপত্র
দ্বারকানাথ ৩১ জানুযারি ১৮৫৪

এই কবিতাযুদ্ধে দ্বারকানাথ অধিকারীর উৎসাহই সবচেয়ে বেশি ছিল, মনে হয়। সূত্রপাত তিনিই কবেন। বঙ্কিম বলেছেন, দ্বারকানাথের কাব্যপ্রকৃতি ছিল ঈশ্বর গুপ্তের অনুরূপ। কবির লড়াইযের প্রবৃত্তি সম্ভবত ঈশ্বব গুপ্তের থেকেই তিনি পেযেছিলেন। বর্তমান বইতে দ্বারকানাথের কবিতাগুলি—যে গুলি পাওয়া যায়, দেওয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুব বচনাগুলি তাঁদের গ্রন্থাবলীতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে বলে দেওয়া হল না। এই প্রসঙ্গে কৌতূহলী পাঠক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ- এবং সাহিত্যসংসদ-প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী দেখে নিতে পারেন। দ্বারকানাথের রচনাবলী প্রকাশিত হওযার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেই জন্য সংবাদপ্রভাকর থেকে তাঁর লেখা পবিশিষ্টে সংকলন করা গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র যে কবিতাপ্রতিযোগিতা এবং প্রাইজ পাওয়াব কথা বলেছেন, সেই প্রতিযোগিতা হয ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৪ই এবং ১৫ই মার্চ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা 'বিজয কামিনী' সংবাদপ্রভাকবে প্রকাশিত হয়। ১৬ই এবং ১৭ই মার্চ কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারীর 'সত্যবতীর সহিত পাপিনীর বিবাদ' প্রকাশিত হয। দ্বারকানাথের কবিতাটি এই সংখ্যা থেকে এবং অবশিষ্ট অংশ তাঁর বই 'সুধীরঞ্জন'-এর প্রথম সংস্করণ (১৮৫৫) থেকে নীচে মুদ্রিত হল। দ্বারকানাথ এবং তাঁর বইয়েব পরিচয়ও পরে দেওয়া গেল। ১৮ই মার্চ হুগলি কলেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা 'কামিনীব প্রতি উক্তি' মুদ্রিত হয়।

এই প্রতিযোগিতার কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি সংবাদপ্রভাকরে বেরিয়েছিল বলে মনে হয় না। সংবাদপ্রভাকরের কোনো কোনো সংখ্যা পাওয়া যায় না বলে এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলা যায় না। রংপুরের কুণ্ডী পরগণার বিদ্যোৎসাহী জমিদার এবং সাহিত্যিক কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী কবিতাগুলি প্রকাশের পর একটি পত্র লিখে পুরস্কার দেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন। অবশ্য সম্পাদক প্রতিযোগিতার সূচনাতেই শ্রেষ্ঠ কবিকে পুরস্কৃত করতে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

বর্তমান উপলক্ষে এই বিবরণের সূত্রে তিনজনের মধ্যে শুধু দ্বারকানাথের রচনাই সংকলন করছি দুষ্প্রাপ্য বলে। দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা তাঁদের গ্রন্থাবলীতেই (সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত) পাওয়া যাবে।

দীনবন্ধুর কবিতা দিয়ে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন[১৯],

'হিন্দুকালেজের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুত দীনবন্ধু মিত্র, হুগলি কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র শ্রীযুত দ্বারকানাথ অধিকারী, এই ছাত্রত্রয়ের বিরচিত গদ্য পদ্য পরিপূরিত তিনটি প্রবন্ধ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এই সকল রচনায় কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ও সংশোধন না করিয়া অবিকল প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমারদিগের সহযোগিগণ এবং গুণ-গ্রাহক গ্রাহক ও পাঠকগণ বিশেষাভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া যাঁহার রচনা যেরূপে ও যেভাবে উৎকৃষ্ট বোধ হইবেক, তাঁহাকে সেইরূপে সেইভাবে পুরস্কৃত করিবেন। আমরা এ বিষযে অগ্রে কোন কথাই উল্লেখ করিব না। সদ্বিদ্বান সজ্জন সমূহের বিবেচনাপথে অর্পণ করিলাম, ইহাতে কোন মহাশয় কিরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত কবেন তাহা জ্ঞাত হইয়া পরিশেষ স্বাভিমত প্রকাশে উৎসুক হইব।

হিন্দু কালেজে সকল কলেজর প্রধান, সুতরাং এই কালেজের পাঠার্থি প্রণিত প্রবন্ধ প্রথমেই প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বোধে মিত্র মিত্রের পদ্য অদ্য সানন্দচিত্তে পত্রস্থ করিতেছি, সকলে অনুকম্পাপূর্ব্বক নয়নান্তপাত করুন।

ছাত্রের রচিত

রূপক

দম্পতি প্রণয়

বিজয় কামিনী

কাঞ্চন নগরাধিপ, রাজা সদাশয়।
বিজয় নামেতে তাঁর একই তনয়॥
অপরূপ রূপ তাঁর, সুগুণ অশেষ।
ধর্ম্মশীল নীতিবেত্তা, নাহি পাপ শেষ॥

দীনবন্ধুর কবিতা সংবাদপ্রভাকরের দুই সংখ্যায় (১৪ই এবং ১৫ই মার্চ ১৮৫৩) প্রকাশিত হয়। তার পরে প্রকাশিত হয় দ্বারকানাথ অধিকারীর রচনা 'সত্যবতীর সহিত পাপিনীর বিবাদ'।[২০]

অদ্য কৃষ্ণনগর কলেজের সুশিক্ষিত ছাত্র শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ অধিকারির

প্রণীত গদ্য পদ্য পরিপূরিত প্রবন্ধ প্রকাশারম্ভ হইল, পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করুন।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত

"সত্যবতীর সহিত পাপিনীর বিবাদ॥

রূপক।

পূর্ব্ব কালে বিশ্বপুরে বিশ্বেশ্বর নামে এক পরম কারুণিক ও ন্যায়বান্ অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছাবতী নাম্নী পরম রূপবতী এক মহিষী ছিল, তদীয় গর্ভে রাজার এক কন্যা ও এক পুত্র জন্মে। রাজা কুমার ও কুমারীর বদন-সুধাকর সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হওত দুহিতার নাম সত্যবতী ও পুত্রের নাম ধর্ম্মরাজ রাখিলেন। ধর্ম্মরাজ তরুণ অরুণের ন্যায় সুশোভিত ও সুদৃশ্য হইয়া পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক হইলে একজন বিচক্ষণ আচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, ঐ নৃপনন্দন যখন বয়োপ্রভাবে পূর্ণ প্রভাকরের ন্যায় প্রভাপন্ন ও অশেষ গুণসম্পন্ন হইলেন, তখন বিশ্বেশ্বর স্বীয় সন্তানের প্রতি সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং প্রচ্ছন্ন-বেশে বনবাসী হইলেন। ধর্ম্মরাজ অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শ-পূর্ব্বক পিতার প্রণীত সুচারু নিয়মাবলম্বন দ্বারা প্রজাগণকে সুশাসন ও পুত্রের ন্যায় পরম যত্নে পালন করিতে লাগিলেন। সত্যবতী যৌবন সীমায় উত্তীর্ণা হইলে ধর্ম্মরাজ ন্যায়বানের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন এবং ভারতবর্ষে এক মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করত তাহাদিগকে বাস করিতে কহিলেন। সত্যবতী ভ্রাতৃবাক্যে সম্মতা হইয়া স্বীয় স্বামির সহিত উল্লেখিত স্থানে উপস্থিত হইয়া পরমানন্দে রহিলেন। এখানে ধর্ম্মরাজ প্রজাপুঞ্জের অবস্থালোকনে অভিলাষি হইয়া একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে নাক প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় সুখদা নাম্নী এক সুরূপসী কন্যার রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং নবোঢা প্রণয়িনীর সহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন করত পরমানন্দে কালযাপন করিতেছিলেন, এমত সময়ে তথায় এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইল।

বিশ্বপুরের অন্তঃপাতি নিরয় নামে এক নগর আছে। তথায় নীচ বংশোদ্ভব পাতক নামে এক উত্তমর্ণ বাস করে, সে বহুদিন পর্য্যন্ত বাণিজ্য ব্যবসায় বিলিপ্ত থাকিয়া বহু সংখ্যক ধন সংগ্রহ করত ঐ নগরের পাপিনী নাম্নী এক বিকটাকারা কন্যাকে বিবাহ করিল। অল্পকালমধ্যে পাপিনীর গর্ভে বহুসংখ্যক পুত্র জন্মিল, পুত্রেরা বয়স্ক হইলে স্ব স্ব পরাক্রম প্রভাবে অনেককে করতলে আনিয়া আপনাদের

জয় পদবী বিস্তার এবং ধর্ম্মরাজের রাজ্য লুণ্ঠন, প্রজাপীড়ন প্রভৃতি অশেষ অনিষ্ট করিতে লাগিল। ধর্ম্মানুচরেরা বারম্বার বারণ করিলে তাহারা নিষেধ না মানিয়া বরং তিরস্কার করিত। প্রজারা নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া রাজার নিকট আবেদন করিলে রাজা পাতকের সহিত যুদ্ধ করাই শ্রেয় বোধ করিলেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়। যখন সেনাপতির প্রতি সৈন্য সংগ্রহের আদেশ করিলেন তখন দেখিলেন যে অনেকেই প্রতিপক্ষের পক্ষ হইয়া দুর্ব্বাক্য বলিতেছে। নৃপতি হতাশ্বাসে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া নিজাবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসির বেশে সুখদার সহিত বিপিনবাসী হইলেন। সত্যবতীও ভ্রাতার দুরবস্থা শ্রবণে অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়া রোদন-বদনে ধর্ম্মান্বেষণে গমন করিলেন। এ দিগে পাপরাজা স্বীয় সৈন্য-সামন্ত সহকারে ভারতবর্ষ আক্রমণ করত ধর্ম্মকীর্ত্তি বিনষ্ট করিয়া স্বাভীষ্ট সিদ্ধ করিল এবং পাপিনীর জন্য এক মনোরমা হৰ্ম্ম্য নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্নিকটে এক মনোহর সরোবর খনন করিয়া দিল। একদিন সত্যবতী ভ্রাতৃশোকে অধীরা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অত্যন্ত শ্রান্তা হইয়া পাপিনীর সরোবরের তীরে উপবেষ্টা হইলেন। ঘটনাক্রমে পাপিনীও সেই সময়ে উপস্থিতা হইয়া সত্যবতীকে জিজ্ঞাসা করিল "তুই কে, কিজন্য এখানে আসিয়াছিস্ আমাকে বল্"। সত্যবতী তাহার ভীষণাকার দর্শনে ভীতা হইয়া কোন বাক্যালাপ না করিয়া অধোবদনে রহিলেন, তাহাতে পাপরাণী রাগান্ধা হইয়া নিম্নলিখিত মত ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য বিষয়।]

পাপিনীর উক্তি।২০।

দীর্ঘ ত্রিপদী

কে তুমি কাহার নারী, বদন করিয়া ভারি,
বসি আছ নিজ অভিমানে।
আমার পতির ডরে দেবতা কিন্নর নরে
আসিতে না পারে এইখানে॥
মাথা হেঁট করি রহ, ডাকিলে না কথা কহ
ভাবে বুঝি নাহি চিনো মোরে।
ঘুচাইব অভিমান, কেটে লোয়ে নাক কাণ,
বিদায় করিয়া দিব তোরে॥

সত্যবতীর উক্তি।

পয়ার

পাপ রাণী পাপিনীর তাড়নার ত্রাসে।
সত্যবতী সতী অতি মৃদুভাষে ভাষে॥
না জেনে এসেছি যদি সরোবর তীরে।
ক্ষমা কর অপরাধ যাই আমি ফিরে॥
যেই রূপ অপরূপ তব রূপ খানি।
অনুভবে বুঝি তুমি হবে রাজ রাণী॥
প্রকাশিয়া বলিতে স্বমনে শঙ্কা হয়।
নিজ পরিচয় দিয়া নাশহ সংশয়॥

পাপিনীর উক্তি।

ত্রিপদী

শুনিয়া পাপিনী কয়, শুন মোর পরিচয়,
মহারাজ রাণী হই আমি।
গুণবান্ ধীর শান্ত, মহাবল পরাক্রান্ত,
পাতক রাজন মোর স্বামী॥
বাহু বলে মোর পতি, শাসিলেক বসুমতী
ভয়ে কাঁপে দেবতা অসুর।
নিরয় নগরে ধাম, পাপিনী সুন্দরী নাম,
মিছারাম আমার শ্বশুর॥
স্বামীর আদেশ ক্রমে, সহচরগণ ক্রমে
বিনাশ করিতে রাজ নারী।
কার সাধ্য করে রণ, সকলেই করে রন,
ইন্দ্র চন্দ্র আদি আজ্ঞাকারি॥
মম প্রিয় পুত্র দ্বেষ, জয় করি বঙ্গদেশ,
মন সুখে সদাকাল হরে।
কলিঙ্গেতে পরদার, ভ্রমি[illegible]
কার সাধ্য কে বারণ করে॥

দেখিয়া দেশের গতি, করিলেন মোর পতি
বিশ্বাস ঘাতকে সেনাপতি।
নাহি ভয় অপমানে, সকলে সমান মানে
নাহি জ্ঞান ভার্য্যার আর পতি ॥
আপনি রজনী অহ শ্বশুর পতির সহ
ভারতের রাজ্যে করি বাস।
সাধের কোলেব ছেলে না পারি থাকিতে ফেলে,
ভীরুকে রেখেছি নিজ পাশ ॥
কি কব অধিক আর, সমুদয় অধিকার,
ত্রিলোক আমার করতল।
অতএব পুনঃ পুনঃ বলিতেছি শুন শুন,
আপনার পরিচয় বল ॥

সত্যবতীর উক্তি।

লঘু ত্রিপদী

শুন যাহা জানি, পাতকের রাণী,
বিশ্বপুর আধিপতি।
ধর্ম্মের ভগিনী, আমি অভাগিনী,
নাম সত্যবতী সতী।
পাতকের ভয়ে, সশঙ্কিত হয়ে,
ভ্রাতা প্রবেশিল বন।
তাঁহার উদ্দেশে এসেছি এ দেশে
শুন সব বিবরণ ॥
কি বলিব হায়, বুক ফেটে যায়,
ভাসি শোক পারাবারে।
এ ভারত ভূমি যার কর্ত্রী তুমি
ছিল মম অধিকারে ॥
সত্য যুগে সবে, মহা মহোৎসবে,
পূজিত আমার পদ।
আমার বচনে, সবে প্রাণ পণে
করিত না মিছা মদ ॥

অনেকে ত্রেতায়, পূজিত আমায়,
কি বলিব মোর মাতা।
দাশরথি রাম, মোরে অবিরাম
কহিতেন মাতা মাতা॥
অপরে দ্বাপরে, মহা সমাদরে,
অনেকে শরণ নিল।
স্থির শান্ত ধীর ভীষ্ম যুধিষ্ঠির,
আমার অধীন ছিল॥
কত কাল তারা মুদিয়াছে তারা
অদ্যাপি তাদের যশ।
পক্ষিরূপ ধরি দ্বিপক্ষ বিস্তারি,
ভ্রমিতেছে দিক্ দশ॥
কাল পেয়ে কলি পাপ রাজ বলি,
স্ববলে হরিল সব।
কি করিতে পারি নিজে ক্ষীণা নারী
হোয়েছি জিয়স্তে শব॥
যদি পুনরায়, করতলে ধায়,
ভারত ভূমির লোক।
পাপ কুলনাশি, তোরে করি দাসী
তবে মোর যায় শোক॥
দস্যু বৃত্তি করি ধর্ম্ম ধন হরি,
সাজায় তোমার বেশ।
তোর পাপ পতি অতি মূঢ় মতি,
লোকেরে দিতেছে ক্লেশ॥

পাপিনীর উক্তি

পয়ার

শুনি বাক্য লোহিতাক্ষ পাপের ঘরণী।
এখনি নাশিয়া তোরে শাসিব ধরণী॥
নিজ বলে কথা কহ ওলো কালামুখি।
কোন্ কালে তোরে ভজে কে কোথায় সুখী

তোমার কারণ রাম গিয়াছিল বন।
ছল করি তার সীতা হরিল রাবণ॥
কাননে কাননে ভ্রমে রোদন করিয়া।
কি লাভ হইল বল তোমারে ভজিয়া॥

—

প্রাণের অধিক তব রাজা যুধিষ্ঠির।
তার সহ পাশা খেলে দুর্য্যোধন বীর॥
ছলে রাজ্য নিয়া দিল বনে পাঠাইয়া।
কি লাভ হইল বল তোমারে ভজিয়া॥

—

মহাবলী বলিরাজ তোমার কারণ।
বামনে করিল দান সব রাজ্য ধন॥
পাতালে রহিল শেষে সম্পদ ছাড়িয়া।
কি লাভ হইল বল তোমারে ভজিয়া॥

ত্রিপদী

বল পাপ অধিকারে অসুখী বলিব কারে
সদা সবে পায় সুখ পদ।
পরিবারে দিয়া ফাঁকি উপার্জ্জন করি চাকি,
অবিরত পান করে মদ॥
জননীরে পদাঘাত না দেয় ভার্য্যারে ভাত
বারাঙ্গনা হইয়াছে সার।
ধর্ম্ম গলে দিয়া ফাঁসি অনেকেই অভিলাষী,
সতত করিতে পরদার॥
রাজকর্ম্মচারি যারা উৎকোচ গ্রাহক তারা
ভূপালের সুবিচার নাই।
অর্থ পাইবার তরে নিজ হাতে নাশ করে
প্রাণাধিক সহোদর ভাই॥

সত্যবতীর উক্তি।

শুনি সত্যবতী সতী, কাতর হইয়া অতি
ধীরে ধীরে কন পাপিনীরে।
বলিয়া প্রজার দুখ, বিদার করিল বুক,
আমারে ভাসালি দুখনীরে॥
আহা মরি আর কবে ভারতবর্ষের সবে
ধর্ম্মরাজ অনুরাগী হবে।
কবেতে করিয়া শূল, নাশিয়া পাপের কুল,
পূর্ব্ববত সগৌরবে রবে॥
হাঁলো পাতকিনি রাণি আপন গুণের বাণী,
কি আর বলিব তোর কাছে।
অধম ভেকের দল, কেমনে জানিবে বল,
শতদলে কত গুণ আছে॥
ছাড়িয়া পাপের মত যে আমারে অবিরত
ভক্তিভাবে মনে মনে ডাকে।
তাহার না রহে দুখ সতত স্বমনে সুখ
শমনের ভয় নাহি থাকে॥

পয়ার

তাপিনী তাপিনী রাণী মহারাগে বলে।
এ মাগির কথা শুনে জলে অঙ্গ জ্বলে॥
মনে করিয়াছ হাঁলো সত্যবতি তুমি।
পুনরায় প্রাপ্ত হবে এ ভারত ভূমি॥
কৌশল করিয়া ক্রমে বিস্তারিয়া পাশ।
দিয়াছি সবার গলে অসত্যের ফাঁস॥

ত্রিপদী

পাতকিনী ক্রোধানলে, যত নিজ বলে বলে,
ঝরে জল সতীর নয়নে।
ছাড়ি সরোবর তীরে, চলিলেন ধীরে ধীরে
ব্রহ্মসভা লক্ষ্য করি মনে॥

প্রখর রবির করে, দগ্ধ করে কলেবরে,
তথাপি মা চিন্তা করে মনে।
কেমনে করিব পার, এই ভব পারাবার
ভারতভূমির পুত্রগণে॥
ওহে প্রিয় হিন্দুদলে, ভব সাগরের জলে
তরিতে তরণী যদি চাও।
ধরিয়া যুদ্ধের বেশ সহিয়া কিঞ্চিৎ ক্লেশ
সত্যবতী আনিবারে যাও॥

কবিতা-প্রতিযোগিতাব সবশেষ কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কামিনীর প্রতি উক্তি' ১৮ই মার্চ ১৮৫৩-তে প্রকাশিত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় বলে এই কবিতা এখানে উৎকলিত হল না। কবিতাটির আর একটি নাম ছিল 'তোমাতে লো ষড়ঋতু'। লক্ষ্য করবার বিষয় দীনবন্ধুর কবিতা 'দম্পতি-প্রণয়ে'র একজায়গায় বিজয় বলছে—

রূপসী রমণী হোলে মনে ধন্য মানে।
ষড ঋতু দেখে কেহ, কামিনী বয়ানে॥

—এতে অনুমান হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতাটি দীনবন্ধু আগেই দেখেছিলেন। এটাও সত্য যে দীনবন্ধু তখন কলকাতায় আর বঙ্কিম নৈহাটিতে। দুজনের সাক্ষাৎ-পরিচয় তা হলে এই সময় থেকেই।

কবিতা প্রকাশ শেষ হলে পাঠকেরা কেউ কেউ কবিতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে মন্তব্য পাঠান। দুটি মন্তব্য এখানে তুলে দিলাম। বিশ্বম্ভর দাসবসু সংবাদ-প্রভাকরের লেখক। তার নিজের কবিতা মাঝে মাঝে আগেও বেরিয়েছে।

প্রথমে প্রবাসী প্রভাকর পাঠকের পত্র[২০২]—

'.. অতএব ভিন্ন ভিন্ন রসের কাব্য লইয়া কখন সাদৃশ্য করা যাইতে পারে না, তবে উপস্থিত তিন রচিত প্রবন্ধের মধ্যে যে প্রবন্ধ যিনি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কি প্রকার রচনার নৈপুণ্য প্রকাশ হইয়াছে, যদি আমারদিগের ইহা বলিতে হয় তবে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র-বাবুর রচনার অভিপ্রায় অতি সুন্দর, কারণ তাঁহার রচনার মধ্যে সত্যবতী ও পাপিনীর কথোপকথন উপলক্ষে অনেক সদুপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বাস্তবিক ভারতবর্ষে এইক্ষণে যে প্রকার পাপাচার হইতেছে তিনি তদুপলক্ষে ছলক্রমে তাহা বর্ণনা করিয়া সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং অবশ্য

বলিতে হইবেক যে তাঁহার রচনার আদ্যন্তের শৃঙ্খলাও তিনি উত্তম রূপে রক্ষা করিয়াছেন, ইঁহার রচনার মধ্যে শান্তিরস ও করুণারসই অধিক বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দু কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু মিত্র ও হুগলি কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায, ইঁহারা উভয়েই আদ্যরসের কবিতা বর্ণনা করিয়াছেন, মিত্রবাবুর রচনার লালিত্যের কথা কি কহিব অতি আশ্চর্য্য মধুর রচনা হইয়াছে এবং আদ্যরস বর্ণনায় যে সকল তাৎপর্য্য আবশ্যক করে তাহা তিনি সুন্দররূপে রক্ষা করিয়াছেন, আদ্যরস কবিতার মধ্যে অতি কোমল রস, ইহাতে কদাপি গুরুতর শব্দের ভাব সহ্য হয় না এবং যেমত কোন লজ্জাশীলা কুলকামিনী তাহার আপন সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া শতগুণে তাহার গৌরব বৃদ্ধি করে এবং লজ্জাহীনা বারবিলাসিনী কামিনী আপন সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিতে গিয়া তাহার গৌরব নষ্ট করে ও জনসমাজে নিন্দিতা হয় সেই রূপ আদ্যরসের কবিতার ভাব যত প্রচ্ছন্নভাবে থাকে ততই রমণীয় হয়। আর যত সেই ভাব ব্যক্তরূপে বর্ণিত হয় ততই তাহার সৌন্দর্য্যের হানি হইতে থাকে। মিত্রবাবুর রচনার মধ্যে ইঁহার কোন বিষয়েরই ত্রুটি দেখা যায় না, বিশেষতঃ তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে তিনি বিজয় নামক রাজপুত্রের বন্ধুগণের বাক্য উপলক্ষে বিবাহের অনেক উত্তম তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন এবং বিজয় কামিনীর কথোপকথন ছলে স্বামি ও স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত প্রণয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে কিছু মাত্র বিকৃতি নাই এবং প্রবন্ধের মধ্যে যে যে স্থলে অন্য রস বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহার ভাব ভাল আছে, কিন্তু ইঁহার রচনার লালিত্যই বিশেষ প্রশংসনীয়। বঙ্কিমবাবুর কবিতার ছটা বিলক্ষণ হইয়াছে, এক স্ত্রী অঙ্গে ষড় ঋতু বর্ণন বড় সামান্য ব্যাপার নহে, ইহাতে ইঁহার বিলক্ষণ কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে এবং শব্দবিন্যাসও মন্দ হয় নাই, তবে কাব্য রচনা দ্বারাই কবিদিগের মনের ভাব প্রকাশ পায়। অভিপ্রায়, রচনার লালিত্য এবং কবিত্ব তিন জনের তিন গুণ।

আমি প্রবাসি প্রভাকর পাঠক।'

তারপর বিশ্বম্ভর দাসবসুর পত্র[২০৩]—

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মহদাশয়েষু।

সম্পাদক মহাশয়। আপনকার প্রভাকর পত্র মধ্যে হিন্দু কালেজ, হুগলি কালেজ ও কৃষ্ণনগর কালেজ, এই কালেজ ত্রয়স্থ শ্রীদীনবন্ধু মিত্র, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদ্বারকানাথ অধিকারি এই তিনজন সুপাত্র ছাত্রের রচিত যে

তিনটি প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশ্য হইয়াছে তৎপাঠে সানন্দচিত্ত হইয়া তাঁহারদিগের রচনা বিষয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

হিন্দু কালেজীয় সুশিক্ষিত ছাত্র শ্রীদীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের প্রণীত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এমন বোধ হয় যে উক্ত মহাশয় মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছেন, কারণ স্বীয় প্রবন্ধ মধ্যে মনের রূপ বর্ণনাচ্ছলে ঐ বিদ্যার বাহুল্য পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ভাষাও মনস্তত্ত্ব বিদ্যার ন্যায় আমার পক্ষে সহজ নহে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে রসোল্লেখ করিয়া আপনার রসিকতা ও কবিতা শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই।

হুগলি কালে [জ] স্থ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত পদ্য পাঠে তাহার সুকোমল ভাব সন্দর্শন করিয়া বোধ হয় যে উক্ত ব্যক্তি যদ্যপি আমারদিগের সুসময়ে ভারতভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিতেন তবে তিনি সুকবি কবিকঙ্কণ কিম্বা রায় গুণাকরের ন্যায় অত্যল্পকালের মধ্যেই গুণাকর হইয়া উঠিতেন, কিন্তু এ সময়েও তিনি সকলের আদরণীয় হইতে পারেন, যদাপি ভাষাপক্ষে আপনার নামের গুণ না প্রকাশ করেন, অতএব আমার অভিপ্রায় এই যে তাঁহার ভাবসকল উত্তম বটে, কিন্তু তাঁহার ভাষা কোনমতেই তেমন নহে। এক সন্দেহ এই যে তিনি কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের প্রকাশিত ভাবসকল হরণ করিয়া স্বজাতীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তথাচ তাহাকে কবিত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণনগর কালেজস্থ ছাত্র শ্রীদ্বারকানাথ অধিকারি বিরচিত গদ্য পদ্য পরিপূরিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হর্ষ সাগরে মগ্ন হইলাম, তিনি আপনার অসাধারণ কবিতা শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন ও অতি সবল ভাষায় আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহা একবার মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন তিনি মরণকাল পর্য্যন্তও তাহা বিস্মরণ হইতে পারিবেন না, অধিকারি মহাশয়ের কবিতা তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে মুদ্রাক্ষরের ন্যায় চিরকাল মুদ্রাঙ্কিত থাকিবেক তাহার সন্দেহ নাই, আর অধিকারী মহাশয় যে সংপূর্ণ রূপে কবিতা শক্তির অধিকারী হইয়াছেন তাহা তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া ক্ষণকাল বিবেচনা করিলেই অবধারিত হইতে পারে, কারণ তিনি অতি সুন্দর কৌশলে ও সহজ ভাষায় স্বদেশের দুরবস্থা স্বজাতিদিগের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে সর্ব্বমতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীবিশ্বম্ভর দাসবসু।

এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে নববর্ষে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য করেন[২০৪]—

'হিন্দু কালেজ, হুগলি কালেজ এবং কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র সকল গদ্য পদ্য রচনায় বিশিষ্টরূপে মনোযোগি হওয়াতে আমরা অত্যন্ত সুখি হইয়াছি, তাঁহারদিগের রচিত বিষয় সকল সর্ব্বদাই উৎসাহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া থাকি। তৎপাঠে অনেকেই সন্তুষ্ট হয়েন, মধ্যে তিন কালেজের তিনজন ছাত্রের তিনটি প্রবন্ধ যাহা গত ২ চৈত্র অবধি ৬ চৈত্র পর্য্যন্ত পাঁচ দিবসেব প্রভাকরে প্রকটিত হইয়াছে, বোধ করি তাহাতে পাঠক মাত্রেবই মনোরঞ্জন হইযা থাকিবে, কারণ তরুণবয়স্ক ছাত্রদিগের দ্বারা এ সমযে এতদপেক্ষা রচনাব অধিক পারিপাট্যের আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? ঐ বালকেরা যদ্রূপ লিপিনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছে অনেক সম্পাদকের দ্বারা তদ্রূপ হয় কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে।'

অতঃপর রংপুরের বিদ্যোৎসাহী জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী পারিতোষিক দেওয়ার প্রস্তাব করে এই চিঠি দেন[২০৫]—

প্রেরিত পত্র

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক দীর্ঘায়ুঃষু।

গত ২ চৈত্র অবধি ৬ চৈত্র পর্যন্ত পাঁচ দিবসের প্রভাকরে হিন্দু কালেজ, হুগলি কালেজ, এবং কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্রত্রয়ের প্ররচিত যে প্রবন্ধত্রয় প্রকটিত হইয়াছে, আমি তত্তাবদভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করত অতি সন্তুষ্ট হইলাম, কারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা গদ্যপদ্য রচনায় ইদানীং যদ্রূপ বৈচক্ষণ্য ও নৈপুণ্য দর্শাইতেছেন তাহাতে দেশের পক্ষে পরম সৌভাগ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। ইহারদিগের গ্রথিত বর্ণহার দৃষ্টে আর কি স্বর্ণহারের প্রতি দৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হয়? কেননা বর্ণহারে, স্বর্ণহারে, স্বর্ণহার কেবল বাহ্য শোভাকর মাত্র। বর্ণহার কি এক অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় শোভা ধারণ করত শরীর এবং অন্তঃকরণকে সুশোভিত করিতেছে। স্বর্ণমালারূপ সম্পদে বহুল বিপদের সম্ভাবনা, বর্ণমালা রূপ সম্পদে বিপদের বিষয় কি! তদ্দ্বারা পদে পদেই সম্পদের সঞ্চার হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমি এই স্থলে প্রফুল্লচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, হিন্দু কালেজের বিদ্যার্থি শ্রীযুত দীনবন্ধু মিত্রের বিরচিত কবিতার ভাব অতি উৎকৃষ্ট। কৃষ্ণনগর কালেজের পাঠার্থি শ্রীযুত দ্বারকানাথ অধিকারির গদ্য পদ্য রচনার প্রসাদগুণ বিলক্ষণ আছে, এবং ভাষাও অতি কোমল, সুতরাং সর্ব্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের নানা ঘটনা লেখাই কবিদিগের উচিত কর্ম্ম। হুগলি কালেজের

ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পদ্য অতি উত্তম বটে ; কিন্তু ভাব কিছুই নূতন নহে। ঋতুসংহার প্রভৃতি গ্রন্থ দর্শন করিলেই জানিতে পারিবেন, তথাচ তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হইবেক। পরন্তু আমি যে বিষযে প্রীত হইয়াছি, সেই বিষয়ে প্রেমপাত্র ছাত্রকে প্রেমপূরিত অনুরাগ সহযোগে যথাসম্ভব পারিতোষিক প্রদানের কল্পনা করিয়াছি, তাহা অবিলম্বেই মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইবে।

শ্রীকালীচন্দ্র রায়চৌধুরী

২৫ চৈত্র ১২৫৯ রঙ্গপুর। কুণ্ডী।

কালীচন্দ্রের পত্রটি যে-সংখ্যায মুদ্রিত হয়, সেই সংখ্যাতেই সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত এই মন্তব্য করেন—

'সর্ব্বপ্রিয় বিদ্যানুরাগি সুকবি রায়চৌধুরি মহাশয়ের পত্র সন্তোষপূর্ণ কৃতজ্ঞচিত্তে প্রকটনপূর্ব্বক উল্লেখ করিতেছি, যে, ইনি জগদীশ্বরের যথার্থ করুণা ও প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন। কারণ, ইনি যেমন নানাবিধ সৎপ্রবন্ধ রচনাদ্বারা মনের সার্থকতা করিতেছেন, সেইরূপ আবার বহুপ্রকার সৎকর্ম্মে সদ্ব্যয় ও সৎপাত্রে দানদ্বারা ধনের সার্থকতা করিতেছেন। কলিকাতা হইতে রঙ্গপুর প্রায় একমাসের পথ হইবে। কালীচন্দ্র বাবু তথা হইতে এখানকার সমাচার পত্র, বিদ্যালয় এবং আর আর দেশহিতজনক ব্যাপাবে যথাসাধ্য সাহায্য করণে ক্রটি করেন না বিশেষত বিদ্যাঘটিত বিবিধ ব্যাপারে অচল অনুরাগ দৃষ্টি করত আমরা নিয়তই পরম তুষ্টি লাভ করিতেছি।

হে যুবক লেখকগণ! তোমরা এই সময়ে কালীচন্দ্রবাবুকে ধন্যবাদ প্রদান কর। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হও। এবং অভিমানকে সর্ব্বপ্রকারে খর্ব্ব করত গদ্য পদ্য রচনায় যথাযোগ্য যত্ন কর। তোমরা এ বিষয়ে যত পারদর্শিতা প্রকাশ করিবে ততই দেশহিতার্থি সজ্জন সমাজে পুরস্কৃত হইবে।

প্রভাকর সম্পাদক'

পরবর্তী ১ আষাঢ় ১২৬০ সালের প্রভাকরে প্রকাশিত জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবরণ থেকে জানা যায় রঙ্গপুরের তুষভাণ্ডারের জমিদার রমণীমোহন রায়চৌধুরী এবং কুণ্ডীর কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী দুইজনেই পৃথকভাবে এই তিনজনকে একই পরিমাণ পুরস্কার দেন।—

'রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি তুষভাণ্ডারের সুবিখ্যাত বিদ্যানুরাগি যুবক জমিদার বাবু রমণীমোহন রায়চৌধুরী মহাশয় উত্তম গদ্য পদ্য রচনা জন্য কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারিকে ১৫৲, হিন্দু কালেজের ছাত্র দীনবন্ধু

মিত্রকে ১০৲ এবং হুগলি কালেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ১০৲ টাকা পারিতোষিক প্রদানার্থ আমারদিগের হস্তে মুদ্রা অর্পণ করিয়াছেন। ঐ জিলার কুণ্ডি পরগণার ঐ ঐ, বাবু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ঐ ছাত্রত্রয়কে ঐ ঐ।'[২০০]

হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ ২০-এ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪ তারিখে এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারিকে লেখা একটি পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের পুরস্কার পাওয়ার সংবাদ জানান। হুগলি কলেজের ইতিহাসে[২০৭] এর বিবরণ এই রকম—

As early as 1854 his Bengali writing, drew public attention. We read that Romony Mohun Ray and Kalli Churan Ray Chowdhury, Zemindars of Rungpore, gave twenty rupees to Bunkim who was then a pupil of the first class of the senior school, "for some good poetical compositions" which appeared in the Probakur newspaper.

এই সংবাদ জানিয়ে হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ কাউনসিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারিকে চিঠি দেন[২০৮]—

No 33

From

The Principal of the College of Mohammad Mohsin

To

The Secretary to the Council of Education Fort William

Dated Hooghly the 20th Feby. 1854

Sir,

I have the honor to report for information of the Council of Education that I have received twenty rupees to be awarded to Bunkim Chunder Chatterjee, a pupil of the first class of the senior school, for some good poetical compositions in Bengalee. The poetical compositions appeared in the Probakur Newspaper. The prize of twenty rupees was awarded by Baboos Ramony Mohun Ray and Kally Churn Ray Choudhuari Zemindars of Rungpur and was sent through Baboo Isser Chunder Goopto the Editor of the aboved named Journal.

I have the honor to be

Sir,

Your most obed' Servant

P. J. Kerr / Principal

দ্বারকানাথ অধিকারী এবং দীনবন্ধু মিত্রের পুরস্কার পাওয়ার সংবাদ তাঁদের কলেজের অধ্যক্ষরা সরকারকে জানান নি কারণ General Report-এ বঙ্কিম এবং এঁদের পুরস্কার পাওয়ার কোনো উল্লেখ নেই।

১ পূর্বোক্ত 'প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী', পৃ ৯০।

২ বঙ্কিমচন্দ্রের ধারাবাহিক বিবরণে মনে হয়, বাঙ্গাল গেজেটি সমাচারদর্পণের আগে প্রকাশিত হয়েছিল। এ বিষয়ে সংশয় আছে। ১৮৩০-৩১-এর সময়েই এ বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক পত্র', ১৩৫৪, পৃ ১১-১৫।

৩ *The Bengal Hurkaru and Chronicle*, Monday, January, 23, 1832. Native Press.

৪ সমাচারচন্দ্রিকার সংবাদ। সমাচারদর্পণে উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ ১৭২।

৫ Bengal Hurkaru, Saturday, June, 23, 1832. সংবাদরত্নাকর ১৮৩১-এর ২২-এ আগস্ট রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রকাশিত হয়। মাত্র ছয়মাস চলেছিল।

৬ বাংলা সাময়িক পত্র, ১৩৫৪, পৃ ৪৭

৭ দ্রষ্টব্য সমাচারদর্পণ, ৫ জানুয়ারি, ১৮৩৩। সমাচারচন্দ্রিকার মন্তব্য উদ্ধৃত— 'যদি কোন মহাশয় স্বীয় বুদ্ধিতে ধর্মসভার দোষ কিছু বুঝিয়া থাকেন, আর তজ্জন্য কিছু লেখেন তাহা রত্নাবলি পত্রে স্থান পাইবেক না এমত নিশ্চয় বোধ হইয়াছে যেহেতুক তৎপত্রাধ্যক্ষ ধার্মিকবর শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক তিনিও ধর্মসভার একজন অধ্যক্ষ।'

৮ জন্মভূমি, ৭ ভাগ, ১১ সংখ্যা, কার্তিক। 'বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস' প্রবন্ধ পৃ ৩২৭

৯ পূর্বোক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১০ বাংলা সাময়িক পত্র, পৃ ৪৮

১১ সংবাদপ্রভাকর, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮

১২ Bengal Harukaru, Oct I, 1836. The Native Press. ফ্রেণ্ড অব ইন্ডিয়া ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে সংকলিত।

১৩ The Friend of India, Nov. 8. 1838

১৪ The Friend of India, Feb 13, 1840-এ সংকলিত।

১৫ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য়, পৃ ৭৫২

১৬ Kissory Chand Mitra, *Memoir of Dwarkanath Tagore*, Calcutta 1870, p. 41. Dwarkanath thoroughly appreciated the merits of Issur Chunder Goopta, and accorded to him every assistance patronising largely the Probhakar and offering him valuable suggestions for the conduct of that paper.

১৭ নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয়চরিত, ১২৯৪, পৃ ১৩

১৮ 'তত্ত্বোধিনী ও প্রভাকরে যে যে প্রবন্ধ প্রকটিত হয়, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া ১৭৭৪

শকের শ্রাবণ মাসে চারুপাঠ প্রথম ভাগ ১৭৭৬ শকের উক্ত মাসে উহার দ্বিতীয় ভাগ এবং ১৭৮১ শকের ঐ মাসে উহার তৃতীয় ভাগ বাহির হয়।'

—নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩১

আমারদিগের আর একটী জীবনাধিক স্নেহান্বিত লেখকবন্ধু যিনি সম্মুখেই বিরাজ করিতেছেন তাঁহার অক্ষয় গুণ বর্ণনা করিতে লেখনীর মুখ কত ক্ষয় করিব। কারণ সে অক্ষয়, তাহার গুণো অক্ষয়।

—সংবাদপ্রভাকর, ১২ এপ্রিল ১৮৫৩

১৯ *The Friend of India* January 9, 1845

২০ এই প্রসঙ্গে পাঠক দেখতে পারেন সংবাদপ্রভাকব, ৩০ জুন ১৮৪৭-এ প্রকাশিত দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। তাছাড়া ১৮ মার্চ, ২৭ মার্চ, ৫ এপ্রিল ১৮৪৮-এর রচনাগুলি বিনয় ঘোষের 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' ১ম খণ্ড ৪০৯-১২ পৃষ্ঠায় সংকলিত হয়েছে।

২১ বাংলা সাময়িকপত্র, ১৩৫৪, পৃ ৯৬-৯৭।

২২ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ৩ সং, পৃ ২৩০-৩১

২৩ নবজীবন, ১২৯৩ আষাঢ় পৃ ৭৩০

২৪ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১, পৃ ২২১-২২২ প্রভাকরের লেখকগোষ্ঠী সম্পর্কে পত্র দ্রষ্টব্য।

২৫ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-লিখিত ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ। দ্রষ্টব্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৫৯ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা।

২৬ সংবাদপ্রভাকরের পুরনো সংখ্যা থেকে সংকলিত হয়ে এই জীবনীগুলি কয়েক বৎসর আগে বর্তমান লেখকের সম্পাদনায় গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী, ১৯৫৮।

২৭ অধ্যাপক মোহনলাল মিত্র সংকলিত 'ভ্রমনকারি বন্ধুর পত্রে' ১৯৬৩ রচনাগুলি গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ সংকলন সম্পূর্ণ নয়।

২৮ সংবাদপ্রভাকর ১৩ জুলাই ১৮৫২

২৯ সংবাদপ্রভাকর ২১ ডিসেম্বর ১৯৫০

৩০ ঐ ১৩ই এপ্রিল, ১৮৫১

৩১ হিন্দু কলেজ স্থাপনের ইতিহাস সম্পর্কে দ্রষ্টব্য Presidency College Centenary volume, 1956.

৩২ S. K. De, 'The Hindu College and the Reforming Young Bengal' in the *Sir P. C. Ray Commemoration volume*, 1932, p. 104. এই প্রবন্ধটি *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century*, 1962, গ্রন্থে সংকলিত (পৃ ৪৭৮-৪৯৮)।

৩৩ Calcutta Gazette. Thursday, January 17, 1828, *The Days of John Company 1824-1832* compiled and edited by Anil Chandra Dasgupta. 1959. ২৭৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৩৪ নিচে উল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩৫ The Calcutta Monthly Journal, March (প্রকাশিত ২২ মে 1837) Englishman পত্রিকা থেকে সংকলিত। The Hindoo নামে প্রবন্ধটি ইংলিশম্যানের ফেব্রুয়ারি থেকে সেপটেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম নেই। প্রথম সংখ্যা 'P' স্বাক্ষরিত। প্যারীচাঁদ মিত্র হওয়া বিচিত্র নয়। *Biographical Sketch of David H re*, 1877, গ্রন্থের বর্ণনার সঙ্গে তুলনীয়।

৩৬ ডিরোজিওর পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিও (১৭৭৯-১৮৩১) ছিলেন পর্টুগীজ বংশোদ্ভব প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টান। হেনরির মার নাম সোফিয়া জনসন। ফ্রান্সিস ও সোফিয়ার পাঁচ ছেলেমেয়ে—ফ্রাঙ্ক সঙ্গীত-প্রতিভার অধিকারী, কুড়ি বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন, হেনরি কবি ও শিক্ষক; ক্লডিয়াস স্কটল্যাণ্ডে শিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন কিন্তু ১৮৩৬-এ মৃত্যু হয় বাইশ বৎসর বয়সে ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর; ভগিনী সোফিয়া সতের বছর বয়সে মৃত; আমেলিয়া ডিরোজিওর মৃত্যুর পর শ্রীরামপুরে চলে আসে। সেখানে সম্পর্কিত ভাই আর্থার ডিরোজিও জনসনের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। আর্থার রাজপুতনার কোটার রাজা বিষণ সিংহের সেক্রেটারি ছিলেন। সেখানেই আমেলিয়ার বাইশ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। সোফিয়া-ডিরোজিওর মৃত্যুর পর (১৮১৫) ফ্রান্সিস আনা মারিয়া রিভার্স নামক একজন ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেন। ইনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

৩৭ Bengal Harkaru, Nov. 12, 1833. প্রবন্ধটির নাম *The Late H.L.V. Derozio/* Extracted from an article in the Calcutta Literary Gazette of Sunday. প্রবন্ধটির সম্পর্কে ওই সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল: We extract from the Literary Gazette of Sunday last some passages from an article on the late H.L.V. Derozio in which although it is from the pen of one who was a kind friend and patron of the youthful poet, we do not think the writer has in any degree exceeded the measure of praise which was justly due to the intellectual talents or the moral and social qualities of the subject of his biographical sketch.

ডক্টর গ্রান্ট ডিরোজিওর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সুহৃদ ছিলেন। উপরে উদ্ধৃত লেখাটিতে গ্রান্ট বলছেন, তিনি ডিরোজিওকে ইতিহাস এবং লাতিন ভাষায় লেখা মূল বই পড়তে উপদেশ দিয়েছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি 'জুবেনিস' স্বাক্ষরিত একটি সনেট প্রকাশার্থ পান। পরে বুঝতে পেরেছিলেন লেখক ডিরোজিও। তেমন উৎকৃষ্ট না হলেও সনেটটি তিনি ছেপেছিলেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ডিরোজিও ইন্ডিয়া গেজেটে নিয়মিত লিখতে থাকেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম বই *Poems* প্রকাশিত হয়। বইখানি লণ্ডনেও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে *The Fakeer of Jungheera* বেরোয়। ডিরোজিওর তিনটি কবিতা রিচার্ডসনের কাব্যসংকলনে স্থান পেয়েছে। তাঁর একটি গদ্যরচনা *The Modern British Poets*, Calcutta Literary Gazette, October 13, 1833-এ প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা কান্টের সমালোচনাটি পাওয়া যায় নি।

ডিরোজিও সম্বন্ধে এই বইগুলি দ্রষ্টব্য: Thomas Edwarads, *Henry Derozio The Eurasion Poet, Teacher and Journalist, Calcutta 1884*; Peary Chand Mitra, *A Biographical Sketch of David Hare, Calcutta 1877*; Elliot Walter Madge,

Henry Derozio, The Eurasian Poet and Reformer, edited by Subir Roychoudhuri, Calcutta 1966 ; যোগেশচন্দ্র বাগল, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, ১৯৬৩ ; বিনয় ঘোষ, বিদ্রোহী ডিরোজিও, ১৯৬১ ; S. K. De, *History of Bengali Literature in the Nineteeth Centnry* 1962 ; F. Bradley-Birt, *Poems of Henry Louis Vivian Derozio*, Oxford University Press, 1923 ; বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ পল্লব সেনগুপ্তের প্রবন্ধ 'হেনরী ডিরোজিওর কবিতা'।

৩৮ স্কুল ছাড়বার পরেও ডিরোজিও ড্রামনডের স্কুল-অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। ১৮২৪-এর ২০ জানুয়ারি এখানে 'ডগলাস' নামে একটি নাটকের অভিনয়ে ডিরোজিও ভূমিকা হিসাবে একটি স্বরচিত কবিতা পড়েন। তিনি এতে অভিনয়ও করেন। এই অভিনয়ের বিবরণ ২২ জানুয়ারি ১৮২৪-এর ইণ্ডিয়া গেজেটে বের হয়। ডক্টর গ্রাণ্ট পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন। সম্প্রতি কবিতাটি বিনয় ঘোষ সংকলিত করেছেন। দ্রষ্টব্য 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' পৃ ১৩৪-১৩৫। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ড্রামনড তাঁর ছাত্র ডিরোজিও সম্বন্ধে The Weekly Examiner, 26th September 1840 একটি প্রবন্ধ লেখেন।

৩৯ টমাস এডওয়ার্ডসের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৬৬

৪০ এ পর্যন্ত তালিকা দিয়েছেন সুখেন্দ্রলাল মিত্র। দ্রষ্টব্য 'Old Memories', *The Bengalee*, 7 May. 1925.

৪১ অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার নব্যসংস্কৃতি, বিশ্বভারতী ১৯৫৮।

৪২ Alexander's East India Magazine (London) June 1831, i. 7. 704। দ্রষ্টব্য A. F Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835*, Leiden, 1965, পৃ ৪১

৪৩ Alexander's East India Magazine, London, June, 1831, i, 7. 705, পূর্বোক্তগ্রন্থ। আলেকজাণ্ডার ডাফ তাঁর *India and India Mission*-এ (1840, পৃ ৬৩৮) লিখেছেন, তাঁর বক্তৃতা এবং হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের নির্দেশের প্রতিক্রিয়াতেই কলকাতায় অনেকগুলি বিতর্কসভা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ডাফ বক্তৃতা আরম্ভ করবার আগেই এ রকম সভার সৃষ্টি হয়েছিল।

৪৪ Calcutta Gazette, Thursday, February 14, 1828. দ্রষ্টব্য *The Days of John Company* 1824 1832, (1959) p 288, কিন্তু এই বিবরণে লেখকের নাম বলা হয়েছে কাশীনাথ ঘোষ। সেটা নিশ্চয়ই ভুল। গেজেটের পূর্ববর্তী সংকলিত অংশে (দ্র ২৭৪ পৃষ্ঠা) নাম আছে কাশীপ্রসাদ ঘোষ। কাশীপ্রসাদ আত্মজীবনীতেও এই অনুবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড (১৩৫৬) পৃ ৪৪১। কাশীপ্রসাদের রচনাটি ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮২৯-এর গবর্নমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত এবং এশিয়াটিক জার্নালে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

৪৫ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ ১৩৫। এর আগে ১৮২৫, ২২ জানুয়ারি সমাচার-দর্পণে সমাচারচন্দ্রিকার একটি সংবাদ উদ্ধৃত হয়—'বালকের ইংরাজী পোশাক'। দ্র. স-সে-ক ১ম, পৃ ১২৯

৪৬ হিন্দুকলেজ পবিচালকসভাব কার্যবিববণ (পাণ্ডুলিপি) পৃ ৩৬-৩৭

৪৭ এই বিববণ আলেকজাণ্ডাব ডাফ-এব *India and India Mission* (Edinburgh 1840) Appendix থেকে সংকলিত।

৪৮ সংবাদপত্রে সেকালেব কথা, ২য খণ্ড, পৃ ২৩৩

৪৯ স-সে-ক, ২য খণ্ড, পৃ ২৩১। সমাচাবদর্পণ সংকলনেব তাবিখ ৬, নবেম্বব, ১৮৩০

৫০ পাণ্ডুলিপি, পৃ ৩২

৫১ Bengal Hurkaru Thursday, July 19, 1838

৫২ *The Days of John Company* (West Bengal Govt. Press, Calcutta, 1959) edited by Anil Ch Das Gupta, p. 575

৫৩ সংবাদপত্রে সেকালেব কথা, ২য খণ্ড, পৃ ১৭২

৫৪ দ্রষ্টব্য সমাচাবচন্দ্রিকা ৯ মে ১৮৩১, সোমবাব। পেবিত পত্র / 'হিন্দু কালেজের বিষযে বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র মধ্যে কেবল চন্দ্রিকা ইদানীং পভাকব ইংবাজী পত্র জ্ঞানন্বেষণ এই পত্রত্রয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিববণ শুনিতে পাই ইণ্ডিযা গেজেট এব' হবকবা এবং অন্যান্য পত্র প্রকাশক মহাশযেবা তদ্বিষয়ে কি কাবণ চুপ কবিযা আছেন কিছুই বুঝিতে পাবি না...'

৫৫ স-সে-ক, ঐ পৃ ১৭০

৫৬ হিন্দু কলেজ পবিচালকসভাব ২৩-এ এপ্রিল ১৮৩১-এব সভাব কার্যবিববণ (পাণ্ডুলিপি পৃ ৪১

৫৭ ঐ, পৃ ৪২-৪৩

৫৮ স-সে-ক, ২য়, পৃ ১৫

৫৯ হিন্দুকলেজ পবিচালকসভাব কার্যবিববণ (পাণ্ডুলিপি), পৃ ৫৬

৬০ ঐ, পৃ ৬২

৬১ ঐ, পৃ ৭৯

৬২ স-সে-ক ২য খণ্ড, পৃ ২৩৭

৬৩ স-সে-ক ঐ পৃ ২৩৮

৬৪ ইষ্ট ইনডিযান ডিরোজিওব কর্মত্যাগেব পব এব এনকোযাবাব পায একই সময়ে ১৭ই মে প্রকাশিত হয়।

৬৫ এই সমযে নব্যবঙ্গ যুবকদেব বর্ণনা পাওযা যেতে পারে এই বইতে Woolstancraft, *Sketches of Hindu Youth* (Orient Peal, 1834)

৬৬ Bentinck Papers. দ্রষ্টব্য A. F. M. Salahuddin *Social Ideas and Social Change in Bengal*, 1965, pp 43-44

৬৭ মন্মথনাথ ঘোষ, 'বাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়', ১৩২৪, পৃ ৫০-৫৩ এই ঘটনাটি ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৫৩-তে সংবাদপ্রভাকয়ের সম্পাদকীযতে উল্লেখ কবেছিলেন। পবে দ্রষ্টব্য।

৬৮ স-সে-ক, ২য় খণ্ড, পৃ ১৭৬, 'সমাচারদর্পণ' ১৯ নবেমবর ১৮৩১-এ উদ্ধৃত।

৬৯ স-সে-ক, ২য় খণ্ড, পৃ ৫১-৫২। এর মূল ইংরেজিটি ছিল খুবই জোরালো—"Does he think to be friendly with us by trumpeting in his paper that we are the

promoters of his cause—in the Hindoo religion? Such hopes, we assure him, are fruitless : for if there be anything under heaven that either I or my friends look upon with the *most abhorrence* it is Hindooism. And if there be anything that we regard as the best instrument of evil, it is Hindooism....

৭০ *The Bengal Harkaru and Chronicle*, Monday Jan 23, 1832 সমাচারদর্পণ থেকে উদ্ধৃত সংবাদ। Works of Tom Paine—We understand that some time since a large number of works of Tom Paine, not far short of a hundred, was sent for sale to Calcutta from America.

৭১ Alexander Duff, *India and India Mission*. 1840, Appendix.

৭২ পূর্বোক্ত গ্রন্থ

৭৩ *The Bengal Harkaru and Chronicle*, পূর্বোক্ত সংখ্যা

৭৪ Long. *Descriptive Catalogue*, Tract Society's Tract no 381

৭৫ সমাচারদর্পণ, ১০ মার্চ, ১৮৩২

৭৬ ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় সংবাদপ্রভাকর পুনরুজ্জীবিত হয় ১৮৩৬, ১০ই আগষ্ট। তখন পত্রিকা সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হত। ১৮৩৯-এর ১৪ই জুন সংবাদপ্রভাকর দৈনিকে পরিণত হয়।

৭৭ Friend of India, February 13, 1840, পূর্বে উদ্ধৃত।

৭৮ Ramchandra Ghosh, *Biographical Sketch of the Rev. K. M. Banerjee LLD. CIE, Missionary Scholar and Patriot*, Calcutta 1893, p 53; গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখেছেন বইয়ের উপকরণ প্রধানতই তিনি কৃষ্ণমোহনের নিকট থেকেই সংগ্রহ করেছেন।

৭৯ সংবাদপ্রভাকর, ৮ই ডিসেম্বর ১৮৫৩

৮০ সংবাদপ্রভাকর, ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩। দ্রষ্টব্য বিনয় ঘোষ-সম্পাদিত 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' ১ম খণ্ড, ১৯৬২, পৃ ৩৩৭

৮১ সংবাদপ্রভাকর, ১২ই এপ্রিল ১৮৪৮

৮২ সমাচারদর্পণ. ১৮ ডিসেম্বর ১৮৩০। দ্রষ্টব্য সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ১৩৫৬, পৃ ১২৩। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার নাম প্রথমে রেখেছিলেন 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। ঈশ্বর গুপ্তের 'বঙ্গরঞ্জিনী' এবং তাঁর নিজের 'সর্বতত্ত্বদীপিকা' নাম দুটি মিলিয়েই কি 'তত্ত্বরঞ্জিনী'?

৮৩ সমাচারদর্পণ' ৩০ জুন, ১৮৩৮। দ্রষ্টব্য সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ঐ, পৃ ঐ।

৮৪ ২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২-র সমাচারদর্পণে উদ্ধৃত সমাচারচন্দ্রিকার বিবরণ। দ্রষ্টব্য স-সে-ক ২য় খণ্ড, পৃ ৫৮১

৮৫ স-সে-ক-২য় খণ্ড, পৃ ৫৯৫

৮৬ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ঐ। বস্তুত ১৮৩৩ থেকেই কলকাতায় নতুন নতুন দল তৈরি হতে থাকে। পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৮৭ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস, ১ম অধ্যায়।

৮৮ The Weekly Friend of India, April, 19, 1838

৮৯ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ ১৭৩

৯০ ২১ জানুআরি ১৮৩২। ৯ মাঘ ১২৩৮-এব সমাচারদর্পণে উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য স-সে-ক, ২য় খণ্ড, পৃ ১৮৫

৯১ Bengal Harukaru, October 1, 1836. The Native Press ২৯ সেপটেম্বর ১৮৩৬-এর ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া থেকে উদ্ধৃত।

৯২ The Friend of India, November 8, 1838, পূর্বে উদ্ধৃত।

৯৩ স-সে-ক, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৯৮

৯৪ ঐ, ২, পৃ ৭৫২

৯৫ ঐ পৃ ৩৯৯ ও পৃ ৪০৫

৯৬ আমন্ত্রণপত্রের তারিখ কলিকাতা ২০ ফ্রেব্রুয়ারি ১৮৩৮

৯৭ Preface, *Selection of Discourses Delivered at the Meetings of the Society for the Acquisition of General Knowledge*, 1840। দ্রষ্টব্য, Awakening in Bengal in early Ninteenth Century, vol I, 1965 edited by Goutam Chattopadhyaya এই ভূমিকাটি যোগেশচন্দ্র বাগলেব 'জাতিবৈব' ১৩৫৩ গ্রন্থের ৫০-৫৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল।

৯৮ কৃষ্ণনগরে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকাসভার অধিবেশনের একটি কৌতূহলজনক বিববণ পাওয়া যায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'বামাতোষিণী'তে। এখানে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি চরিত্ররা আছেন।

৯৯ জর্জ টমসন দ্বারকানাথের সঙ্গে ১৮৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় আসেন। ১৮৪৩ এর ১১ই জানুয়ারি জ্ঞানোপার্জিকা সভার এক অধিবেশনে তিনি নব্যবঙ্গের মুখপাত্রগণের সঙ্গে পরিচিত হন।

১০০ বেঙ্গল স্পেক্‌টেটব, ১ সেপ্‌টেম্বর, ১৮৪২। দ্রষ্টব্য বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলাব সমাজচিত্র, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৬৪, পৃ ৯৬-১০০।

১০১ —

১০২ নকুড় বিশ্বাস, 'অক্ষয়চবিত', ১২৯৪, পৃ ১৬

১০৩ 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসবের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত', ১৩৬০, পৃ ১৯

১০৪ 'আত্মজীবনী', ১৯৬২, পৃ ২৬

১০৫ নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, 'অক্ষয়চরিত', ১২৯৪, পৃ ১৬

১০৬ তত্ত্বোধিনী পত্রিকা, ১ আষাঢ় ১৭৬৬ শক, পৃ ৮৮

১০৭ তত্ত্বোধিনী সভার সাম্বৎসরিক আয়ব্যয়-স্থিতির নিরূপণ পুস্তক ১৭৬৮ শক—১৭৭৫ শক (বাঁধানো, এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে রক্ষিত)। এতে ১৭৬৯ শকের বিবরণ নেই। ১৭৬৮ শকে ঈশ্বর গুপ্তের দশ টাকা চাঁদা দেওয়ার উল্লেখ আছে।

১০৮ 'আত্মজীবনী', ষষ্ঠ পবিচ্ছেদ।

১০৯ *The Bengal Spectator*, vol II, no I, January 1, 1843

১১০ সাময়িকপত্রে সেকালের সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, ১৯৬২, পৃ ৩০

১১১ তত্ত্বোধিনী পত্রিকা, ১ মাঘ ১৭৬৭ শক, পৃ ২৫৬

১১২ তত্ত্বোধিনী পত্রিকা, ১ ফাল্গুন ১৭৬৮ শক, পৃ ৪৬০

১১৩ সংবাদপ্রভাকর, ২৭ জুন, ১৮৪৮

১১৪ 'পারমার্থিক কবিতা', 'তত্ত্ব'

১১৫ সংবাদপ্রভাকর, ৬ মে, ১৮৫০

১১৬ বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, ১৯৬২ দ্রষ্টব্য।

১১৭ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ আষাঢ়, ১৭৬৭ শক

১১৮ সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ ৭১-৭২

১১৯ নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয়চরিত, ১২৯৪, পৃ ১৩

১২০ সংবাদপ্রভাকর, ২রা মার্চ, ১৮৫২ মঙ্গলবার

১২১ নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, 'অক্ষয়চরিত', ১২৯৪, পৃ ১৭-১৮

১২২ বক্রলিপি আমাদের।

১২৩ *Calcutta Review*, 1864 Phases of Hinduism pp 368-376. এই সভার বিস্তৃততর বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মন্মথনাথ ঘোষ, 'কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র', ১৩৩৩, পৃ ৪৮-৬০।

১২৪ মন্মথনাথ ঘোষের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৮০ দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম ছিল না।

১২৫ Printed by P S D'Rozario and Co No 8 Tank-Square.

১২৬ 'কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র', পৃ ৫৭

১২৭ তুলনীয় চারুপাঠের (১ম) দয়া, সন্তোষ, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, আত্মগ্লানি প্রভৃতি প্রবন্ধ। তৃতীয় সংস্করণে (১৮৬৭) 'নীতিসূত্র' নামে একটি অধ্যায় যুক্ত হয়েছিল।

১২৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, ১৮৫৮ গ্রন্থের ৩৩৬ পৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত।

১২৯ 'প্রভা' ও 'প্রভাকর' ঈশ্বর গুপ্তের বহু গদ্য ও পদ্যে যমকরূপে প্রযুক্ত হয়েছে।

১৩০ দ্রষ্টব্য 'হিতার্থি বন্ধু এবং পাঠকগণের নিকট প্রভাকর-সম্পাদকের নিবেদন' সংবাদ-প্রভাকর, ২১ ডিসেম্বর, ১৮৫ ।

১৩১ ৩১ জুলাই, ১৮৫০। ১৭ই শ্রাবণ ১২৫৭

১৩২ সংবাদপ্রভাকর, ১৪ জানুয়ারি, ১৮৫২। ২ মাঘ, ১২৫৮

১৩৩ সংবাদপ্রভাকর, ২৪ ফাল্গুন, ১২৫৮। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম খণ্ড ১৯৬২) পৃ ১৮১-এ উদ্‌ধৃত।

১৩৪ সংবাদপ্রভাকর ১২ বৈশাখ, ১২৬১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২০১

১৩৫ সংবাদপ্রভাকর, ১২ জুন, ১৮৫৪। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১।

১৩৬ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, পৃ ৪৫৩

১৩৭ বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, ১৯৫৮, পৃ ১০৭-১০৮, ১১৩, ১২৮-১৩১

১৩৮ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪০৭-৪০৯

১৩৯ গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য, হাফআখড়াই সঙ্গীতসংগ্রামের ইতিহাস, ১৩২৬, পৃ ১৬

১৪০ সমাচারদর্পণ, ৩০ আগস্ট, ১৮২৩। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ১৩৫৬, পৃ ২৩৫

১৪১ মনোমোহন বসু, 'মনোমোহন গীতাবলী', ১৮৮৭, ভূমিকা, পৃ ।/০-॥৵

১৪২ 'বাঙ্গালীর গান', ১৩১২, পৃ ২৭১

১৪৩ *The Spectator*, 24th October 1843

১৪৪ মন্মথনাথ ঘোষ 'রঙ্গলাল' ১৩৩৬, পৃ ৫২

১৪৫ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৭৬। ছাতুবাবু এবং লাটুবাবুর আসল নাম যথাক্রম আশুতোষ দেব এবং প্রমথনাথ দেব। এঁরা বিখ্যাত রামদুলাল সরকারের পুত্র। ছাতুবাবুর মৃত্যু ১৮২৬ ২৯ জানুয়ারি, লাটুবাবুর মৃত্যু ১৮৬৯, ডিসেম্বর মাসে।

১৪৬ সংবাদপ্রভাকর, ২১ ডিসেম্বর ১৮৫০

১৪৭ হিতবাদী, ৪ঠা ফাল্গুন শুক্রবার, ১৩১৮ সাল। 'মনোমোহন বসু' সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ১৩৫২, পৃ ২৯ উদ্‌ধৃত।

১৪৮ 'মনোমোহন বসু' সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ১৩৫২, পৃ ২৩

১৪৯ *The Calcutta Review* 1851 January June Bengali Games and Amusement দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী' ১৩৫৮ পৃ [৪৩] তে উদ্‌ধৃত। প্রবন্ধটির লেখক বেভারেণ্ড লালবিহারী দে, দ্রষ্টব্য মন্মথনাথ ঘোষ, 'সেকালের লোক' ১৩৪৬ পৃ ১৭৬।

১৫০ 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী' ১৩৫৮, পৃ ৩৮৫-৩৬৪ দ্রষ্টব্য।

১৫১ ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে) বসুমতী সাহিত্যমন্দির থেকে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রকাশিত সংস্করণে ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কয়েকটি হাফআখড়াই গান সংকলিত আছে।

১৫২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কবিতাসংগ্রহ', ১২৯২ পৃ ৯৯ এবং ১০৩

১৫৩ ১২৫৩ সাল অর্থাৎ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সংবাদপ্রভাকরের ফাইল পাওয়া যায় না বলে এই বিবরণ দেখার সুযোগ হয় নি।

১৫৪ পত্রের তারিখ মরশিদাবাদ। ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫

১৫৫ পত্রের তারিখ রাজশাহী পুরপুর। ১ আষাঢ় ১২৫৫

১৫৬ 'পারস্য ইতিহাস' (১৮৩৯), 'আরব্য উপন্যাস' (১২৫৭), 'নবনারী (১৮৫২) ইত্যাদি প্রণেতা। মৃত্যু ১৮৬৪।

১৫৭ পত্রের তারিখ বহরমপুর ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫। এই পত্রটি বস্তুত পূর্বের পত্রের আগেই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল।

১৫৮ The Sanyals owe their wealth to service under the East India Company in the days when great power was still left in the hands of native officials Krishna Chandar Sanyal the founder of the family, commenced life as *Saristhadar* or head clerk in the Natore criminal court from which he was promoted to the same post in the large magistracy office of Murshidabad. He was then transfered to the office of head clerk of the Board of

Revenue in Calcutta Having amassed much wealth in these appointments, he set up as *Zamindar* and purchased several of the smaller estates of the Natore Raj in this district, having previously secured this valuable Calcutta post for his son Madhab Chandra—District Gazetteer, Bogra 1910, p 161.

১৫৯ পত্রের তারিখ রঙ্গপুর। ৩২ আষাঢ় ১২৫৫ সাল।

১৬০ ১৯-এ আগষ্ট ১৮৪৮। পত্রের তারিখ রঙ্গপুর। ৬ শ্রাবণ ১২৫৫।

১৬১ সংবাদপভাকর ২১ আগষ্ট ১৮৪৮। পত্রের তারিখ শিবগঞ্জ। ১২ শ্রাবণ ১২৫৫।

১৬২ *Statistical Account of Bengal* Vol VIII, 1876

১৬৩ পত্রের তারিখ দিনাজপুর ২০ শ্রাবণ ১২৫৫

১৬৪ পত্রের তারিখ দিনাজপুর ২৯ শ্রাবণ ১২৫৫

১৬৫ পত্রের তারিখ মালদহ। ১ ভাদ্র ১২৫৫

১৬৬ দ্রষ্টব্য 'প্রাচীন কবি' কবিজীবনী, ১৯৫৮

১৬৭ দ্রষ্টব্য ভবতোষ দত্ত-রচিত 'দীনেশচন্দ্র সেন ও ইতিহাস চর্চার প্রথম যুগ' প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩।

১৬৮ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৪৯শ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

১৬৯ বিনয় ঘোষ-সংকলিত সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪, ১৯৬৬, পৃ ৭৮০-৭৮৫। লিটারেরি গেজেটের সম্পূর্ণ দীর্ঘ সমালোচনা এখানে উদ্ধৃত আছে। বাহুল্যভয়ে আর এখানে দিলাম না।

১৭০ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, ১৩২৬, পৃ ৭১-৭২। উদধৃত সঙ্গীতাংশটি বোধেন্দুবিকাশ নাটকের প্রস্তাবনায় নটীর একটি গান। নাটকে একে বলা হয়েছে 'প্রকৃতিচ্ছন্দ'। উদধৃত গানের শেষ লাইনটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যোজনা।

১৭১ এই সংখ্যাটি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে আছে। কিন্তু তাতে আখ্যা পত্র নেই (পুস্তক নং ৩৮১)। সুশীলকুমার দে *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century* গ্রন্থে (পৃ ৫৭২) আখ্যাপত্র দিয়েছেন কিন্তু সেটা তারিখহীন (No date) সম্ভবত অসম্পূর্ণ। সাহিত্যসাধকচরিতে ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীতে (পৃ ১৮) আখ্যাপত্রটি সম্পূর্ণ উদধৃত আছে। বর্তমান বিবরণ দুই বই মিলিয়ে তৈরি।

১৭২ এই বিবরণ সা-সা-চ থেকে নেওয়া।

১৭৩ সংবাদ প্রভাকরে উদধৃত। দ্রষ্টব্য ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ সংখ্যা।

১৭৪ *The Hindoo Patriot* January 27, 1859 p. 26

১৭৫ পূর্বোক্ত গ্রন্থ February 3, 1859 p. 37 *Vernacular Newspaper.*

এই প্রসঙ্গে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ভাস্কর-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্বন্ধে এই পত্রিকাটি লেখে—

It also concerns us to hear that the editor of the *Bhaskar* too is labouring under a severe illness and though we fervently hope that he might be

spared to us a longer time than we have a right to expect, we cannot still resist the fear that his usefulness as a journalist has gone out of date from his advanced age. The *Bhaskar* was held by the vernacular reading portion of the English public as the exponent of the thoughts and feelings of the respectable classes of the Native community, and to this position its editor had some claim by reason of his intercourse with men of rank, wealth and intelligence. Did not his extreme fondness for giving in his columns an eclat to every religious ceremony and occurances mislead his journalistic instincts, his long experience as a writet of local politics, added to his knowledge of his views of certain enlightened members of the community on important questions of the day and the general purity of his language would make him a valuable member of the vernacular press.

এই সঙ্গে সোমপ্রকাশ এবং এডুকেশন গেজেট পত্রিকা দুটির বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে।

১৭৬ সংবাদপ্রভাকর ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯। সা-বা-স ১ম খণ্ড পৃ ৪৬৫ দ্রষ্টব্য।

১৭৭ সংবাদপ্রভাকর ২৯ আগস্ট ১৮৫৯

১৭৮ সংবাদপ্রভাকর ৩০ সেপটেম্বর ১৮৫৯

১৭৯ সংবাদপ্রভাকর ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯। সা-বা-স ১, পৃ ৪৫৪ দ্রষ্টব্য।

১৮০ বিনয়কৃষ্ণ দেব, 'কলিকাতার ইতিহাস', (সুবল মিত্রের অনুবাদ), পৃ ২৮২

১৮১ শনিবারের চিঠি ১৩৩৮, কার্তিক, পৃ ১৭২

১৮২ সংবাদপ্রভাকর ২৮ জুন ১৮৫২

১৮৩ সংবাদপ্রভাকর ১৩ এপ্রিল ১৮৫৩

১৮৪ 'বঙ্কিমজীবনী'কার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোনো কথা এ সম্বন্ধে বলেন নি। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অষ্টাবতার চট্টোপাধ্যায় ও বঙ্কিমকে অভিন্ন মনে করেছেন। দ্রষ্টব্য 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' ১৯৬১, পৃ ১৫০। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নামে বঙ্কিমচন্দ্রের এক সহপাঠীর বিবরণ দিয়েছেন, দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৫৪-৫৫।

১৮৫ 'গদ্য', শ্রীব চ চ. সংবাদপ্রভাকর ২৩-এ এপ্রিল ১৮৫২ 'বর্ষাঋতু', শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সংবাদপ্রভাকর, ১০ জুলাই ১৮৫২

১৮৬ K. Zachariah, *History of Hoogly College* 1836-1936 Chapter III, p 53

১৮৭ বঙ্কিমরচনাবলী (পরিষৎ সং), বিবিধ খণ্ডে উদ্ধৃত।

১৮৮ 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক' এর ভূমিকা (১৩৪৬)। শনিবারের চিঠির বাল্যরচনা-বিষয়ক প্রবন্ধেও ব্রজেন্দ্রনাথ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। দ্রষ্টব্য শনিবারের চিঠি ১৩৩৮, পৃ ১৭৪।

১৮৯ সংবাদপ্রভাকর ১০ মার্চ ১৮৫২। এই পত্রটি প্রথম প্রকাশিত হয় শনিবারের চিঠি ১৩৩৮, পৃ ২৮৯-৯১। অতঃপর বর্তমান সম্পাদক পুনর্বার প্রকাশ করেন, 'দেশ' ৭ ফাল্গুন, ১৩৬১। পরিষৎ-সংস্করণ বঙ্কিমরচনাবলীতে কবিতাটির সংশোধিত রূপ মাত্র উদ্ধৃত আছে।

১৯০ *The Poems of William Drummond of Hawthornden*, London, MDCCXC, p 144-145

১৯১ সাহিত্যসাধক-চরিত, 'বঙ্কিমচন্দ্র' পৃ ১০-১১

১৯২ বঙ্কিমরচনাবলী (পরিষৎ সং) বিবিধ খণ্ডে উদ্ধৃত।

১৯৩ পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদধৃত।

১৯৪ পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদধৃত।

১৯৫ পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদধৃত।

১৯৬ পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদধৃত।

১৯৭ দ্রষ্টব্য শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৩৮ পৃ ১৮৮।

১৯৮ ঈশ্বর গুপ্ত এই কবিতাটি উদ্ধৃত করেন— দেখিলাম দুই ধার মহারণ্যে অন্ধকার।

১৯৯ সংবাদপ্রভাকর ১৪ মার্চ ১৮৫৩ সোমবার ২ চৈত্র ১২৫৯

২০০ সংবাদপ্রভাকর ১৬ মার্চ ১৮৫৩, ৪ চৈত্র বুধবার

২০১ সংবাদপ্রভাকর ১৭ মার্চ ১৮৫৩ শুক্রবার ৫ চৈত্র ১২৫৯

২০২ ২৫ চৈত্র ১২৫৯, ৬ এপ্রিল ১৮৫৩ বুধবার।

২০৩ সংবাদপ্রভাকর ১১ এপ্রিল ১৮৫৩ ৩০ চৈত্র ১২৫৯ সোমবার। ৯ আপ্রিল ১৮৫৩, ২৮ চৈত্র ১২৫৯ শনিবারেও প্রকাশিত।

২০৪ সংবাদপ্রভাকর ১২ই এপ্রিল ১৮৫৩। ১লা বৈশাখ ১২৬০

২০৫ ৩ বৈশাখ ১২৬০ শুক্রবার ১৪ এপ্রিল ১৮৫৩

২০৬ সংবাদপ্রভাকর, ১৪ই জুন ১৮৫৩।

২০৭ K Zacharia, *History of Hoogly College 1836 1936* পৃ ৫২। এই বিবরণ হুগলি কলেজে রক্ষিত নথিপত্র ("letters used") নং ৩৩ থেকে সংগৃহীত।

২০৮ হুগলি কলেজে রক্ষিত হাতে-লেখা বিবরণ *Copies of letters sent for 1853*.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাব্যবিষয় ও প্রকাশরীতি

ঈশ্বর গুপ্ত যদিও পুরনো যুগের কাব্যের আবহাওয়ায় লালিত ও বর্ধিত হয়েছিলেন, তাঁর নিজের টান যদিও ছিল পুরনো যুগের সাহিত্যের প্রতি, তবু তাঁর নিজের রচনায় নতুন বিশেষত্ব ও লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বলেছেন যে, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ভারতচন্দ্র রীতি থেকে আলাদা আর-একটা রীতি ছিল—যে রীতিতে বাংলা ভাষা তেজস্বিনী হয়েছে। রাজনৈতিক সামাজিক এবং দৈনন্দিন ঘটনা যে কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারে, ঈশ্বর গুপ্তের আগে কেউ সেকথা ভাবে নি। এই অভিনবত্বের জন্যই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা আধুনিক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্রেণীর কবিতাই 'কবিতাসংগ্রহে' সংকলন করেছিলেন। হাফ-আখড়াই গান তিনি সংগ্রহ করেন নি।

অতএব আধুনিক পাঠকের কাছে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা তুলে ধরতে গেলে আধুনিক সাহিত্যরুচির নিরিখেই তার বিচার করে দেখা দরকার। এইজন্য এই পরিচ্ছেদের আরম্ভেই বঙ্কিম 'কবি'র সংজ্ঞা নিরূপণ করে নিয়েছেন। আধুনিক সংজ্ঞা দিয়েই ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব বিচার করতে গিয়েছেন।

কবি ও কবিত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন। উত্তর-চরিত প্রবন্ধে (১২৭৯ =১৮৭৩ খ্রী) তিনি ভবভূতির নাটক আলোচনা উপলক্ষে প্রাচীন আলংকারিক পদ্ধতি এবং আধুনিক পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনায় কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে নিজের ধারণা নির্দিষ্ট করে বলেন। গঙ্গাচরণ সরকারের 'ঋতুবর্ণন' কাব্যের সমালোচনা উপলক্ষেও তিনি কাব্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন (১২৮২=১৮৭৫ খ্রী)। তা ছাড়া দীনেশচরণ বসুর 'মানসবিকাশ' (১২৮০) কাব্যে এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে'র (১২৮১) সমালোচনাসূত্রেও তিনি কাব্যের উৎপত্তির কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'গীতিকাব্য' (১২৮০) প্রবন্ধটি সুপরিচিত। উল্লেখযোগ্য, এতে ঈশ্বর গুপ্তের নাম নেই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং দীনবন্ধু মিত্রের জীবনীতে প্রসঙ্গক্রমে স্বভাবতই কাব্যতত্ত্বের কথা এসেছে। এই সব প্রবন্ধের বক্তব্য মিলিয়ে কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমের বক্তব্যের একটা সাধারণ রূপ স্থির করে নেওয়া সম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি ঈশ্বর গুপ্তকে স্থাপন করেছেন।

বলা প্রয়োজন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধ **Bengali Literature** (১৮৭১)-এ ঈশ্বর গুপ্তকে মোটেই উচ্চ স্থান দেন নি বরং নিন্দাই করেছেন। জীবনীরচনাকালে (১৮৮৫) তিনি যে মত পরিবর্তন করে ঈশ্বর গুপ্তকে সার্থক 'কবি' হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তা মনে করবার কারণ নেই। এইটুকু অবশ্যই বলা যেতে পারে, সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনাকালে অবশ্যই সাহিত্যের উচ্চ আদর্শটি— বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায়, তাঁকে স্মরণে রাখতে হয়েছিল। জীবনী-রচনাকালে বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের দানের নিশ্চয়াত্মক (positive) দিকটির উপর জোর দিতে হয়েছিল। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যসাফল্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মত খুবই সতর্ক এবং সুচিন্তিত।

বর্তমান ক্ষেত্রে বঙ্কিম বলেছেন 'তাহার সৃষ্টিই বড নাই'। এ-কথা তিনি দীনবন্ধুর আলোচনাতেও বলেছেন, 'কবির প্রধান গুণ সৃষ্টিকৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না'। এই 'সৃষ্টি' শব্দটি প্রয়োগ করে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-সৃষ্টির একটি বড়ো মানদণ্ড ব্যবহার করলেন। এই তত্ত্বটি তিনি প্রথম ব্যাখ্যা করেন 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে। তাতে তিনি বলছেন,

'যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই। তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি— অনুলিপি মাত্র— তাহাকে "সৃষ্টি" বলা যায় না।'

কিন্তু প্রকৃতির অনুকরণ ছাড়া কাব্য হয় না। উত্তরচরিতেই বঙ্কিম দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন স্বভাবানুকরণ চাই কিন্তু স্বভাবানুকরণ হলেই প্রশংসনীয় হয় না। স্বভাবানুকরণ কথাটি বঙ্কিম অ্যারিস্টটলের অর্থে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় না। কারণ নৈসর্গিক দৃশ্য প্রকৃতির অনুকরণকে অ্যারিসটটল তাঁর বিচারের মধ্যে আনেন নি। তাঁর মতে মানবচরিত্রের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই শিল্পে অনুকরণীয়। বঙ্কিম স্বভাবানুকরণ বলতে দৃশ্য প্রকৃতির অনুকরণকেও বুঝিয়েছেন। তিনি বলছেন,[১]

'এই জগৎ শোভাময়। যাহা দেখিতে সুন্দর, শুনিতে সুন্দর, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুকোমল, তৎসমুদায়ে বিশ্ব পরিপূর্ণ। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য, কিন্তু সৌন্দর্য খুঁজিতে হয় না— এ জগৎ যেমন দেখি, তেমনি যদি লিখিতে পারি, যদি ইহার যথার্থ প্রতিকৃতি সৃষ্টি করিতে পারি তাহা হইলেই সুন্দরকে কাব্যে অবতীর্ণ করিতে পারিলাম। অতএব কেবল বর্ণনা মাত্রই কাব্য।'

কিন্তু এটা সাহিত্যকর্মের নিম্নতম পর্যায়। কালিদাসের ঋতুসংহার এবং

টম্‌সনের কাব্যে উৎকৃষ্ট বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনা আছে। 'উভয় গ্রন্থই আদ্যোপান্ত সুমধুর প্রসাদগুণবিশিষ্ট এবং স্বভাবানুকারী'। এই দুই বইতে অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও তারা প্রধান কাব্য নয়, তার কারণ তাতে 'সৃষ্টিচাতুর্য' নেই।[২] এই প্রসঙ্গে আলেফ লায়লার দৃষ্টান্ত দিয়ে বঙ্কিম বলছেন স্বভাবানুকারিতা নেই বলে এই বই অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য নয়। কেবল প্রকৃতিকে অনুকরণ করে মোটামুটি কাব্য লেখা যায়, কিন্তু স্বভাবানুকারিতার সঙ্গে সৌন্দর্যবোধ মিশ্রিত হলে আরো উচ্চতর কাব্য হয়—'উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় না।' সৌন্দর্যকে বঙ্কিম আত্মসৃষ্ট (subjective) বলেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন,[৩]

'আর এক শ্রেণীর কবিদের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন—যাহা সুন্দর, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া লইয়া, যাহা অসুন্দর তাহা বহিষ্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দর্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, "যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই" সেই আত্মচিত্তপ্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরো সুন্দর করেন—সৌন্দর্যের অতি প্রকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাহাদের সৃষ্টিতে অযথার্থ অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না।'

স্বভাবানুকারিতার সঙ্গে এই সৌন্দর্যবোধ মিলে হয় সৃষ্টি। এই সৃষ্টি ঈশ্বর গুপ্তের নেই। বঙ্কিম বাংলা কাব্য থেকে এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তবু এই সৃষ্টিই শ্রেষ্ঠতম কাব্য না। এর চেয়েও মহৎ বস্তু আছে। সেই কাব্যই শ্রেষ্ঠ যা শুধু উপভোগ্য নয়, যা পাঠকের চিত্তশুদ্ধিও ঘটায়। স্বভাবানুকারী হয়েও স্বভাবাতিরিক্ত এবং স্বভাবাতিরিক্ত হয়েও চিত্তশুদ্ধি করে যে কাব্য সেই কাব্যই মহত্তম। The artist may imitate things as they ought to be অ্যারিসটটলের এই কাব্যতত্ত্ব বঙ্কিমের ধারণার মূলে—'সেই উৎকর্ষের আদর্শসকল, আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি।' কিন্তু বঙ্কিম শিল্পের পক্ষে অনুকরণীয় বলে যার ধারণা করেছিলেন, অ্যারিস্টট্‌লের নির্দিষ্ট

বিষয়ের চেয়ে তা ব্যাপকতর। কাব্যসৃষ্টির উপায়রূপে আত্মচিত্ত-প্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণের সেই কল্পনাও রোমানটিক কাব্যতত্ত্বেরই অনুরূপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় রবীন্দ্রনাথও অনুকরণবাদকে স্বীকার করেন নি, তিনি এই মানসিক সৃষ্টিলীলাকেই মেনেছেন[৪]—

'মন সাধারণত প্রকৃতির মধ্য হইতে সংগ্রহ করে— সাহিত্য মনের মধ্য হইতে সঞ্চয় করে। মনের জিনিসকে বাহিরে ফলাইয়া তুলিতে গেলে বিশেষভাবে সৃজনশক্তির আবশ্যক হয়। এইরূপে প্রকৃতি হইতে মনে ও মন হইতে সাহিত্যে যাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠে, তাহা অনুকরণ হইতে দূরবর্তী।'

কাব্যসৃষ্টির এই আত্মকেন্দ্রিক উদ্ভব-তত্ত্বের ইতিহাস য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে আরম্ভ হয়েছে। লকের ভাবসাদৃশ্য (Association of Ideas)-তত্ত্ব হার্টলির চিন্তায় রূপান্তরিত হয়ে কোল্‌রিজের মতো রোমানটিক কবিদের কল্পনাবৃত্তিকে উদবোধিত করেছিল। আগে 'কল্পনা' কথাটি অত্যন্ত সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে দার্শনিক ভাবসাদৃশ্য-তত্ত্বের দ্বারা নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করে 'কল্পনা'ই বোঝাতে লাগল কবির সৃজনী শক্তিকে। এই অর্থে কল্পনা বিচ্ছিন্নকে একত্র করে, সামান্যকে অসামান্য করে, চিরপরিচিতকে চিরবিস্ময়ে উজ্জ্বল করে।

অতএব বঙ্কিম-কল্পিত কাব্যরচনাকে এই কয়টি পরম্পরায় সাজানো যায়। প্রথম পর্যায়ে সবচেয়ে সবল রচনা স্বভাবানুকারিতা অর্থাৎ বর্ণন-কাব্য, দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বভাবানুকারিতার সঙ্গে সৌন্দর্যচেতনার মিশ্রণজাত সৃষ্টি, তৃতীয় পর্যায়ে স্বভাবানুকরণ অথচ স্বভাবাতিক্রমণ এবং চিত্তশুদ্ধি ঘটায় এমন সৃষ্টি। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য এই তিন পর্যায়ের কোনোটাতেই পড়ে না। এই বিচারে সত্য সত্যই ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যসাফল্য বিশেষ নেই। কিন্তু বঙ্কিম প্রশ্ন করেছেন, ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের তাহলে মূল্য কি? তিনি নিজেই উত্তর দিয়ে বলেছেন 'যা প্রত্যক্ষ, যা প্রাপ্ত' ঈশ্বর গুপ্ত তারই কবি।

এতে মনে হয় ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যকে প্রথম পর্যায়ের নিরিখেই বিচার করা হল না কেন? তার কারণ সম্ভবত এই যে ঈশ্বরগুপ্ত 'বর্ণন কাব্য'ও লেখেন নি, তিনি লিখেছেন ব্যঙ্গের কাব্য। 'স্থূলকথা ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist.' স্যাটায়ার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। স্যাটায়ারের ধর্ম এবং কাব্যের ধর্ম যে আলাদা, বঙ্কিমের কাব্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলেই তা বোঝা যায়। স্যাটায়ার তো শুধু প্রত্যক্ষ বস্তুর যথাযথ বর্ণনা নয়,

প্রত্যক্ষ বস্তুর তির্যক বা ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা। অ্যারিস্‌টট্‌ল স্যাটায়ারকে নিম্নতর শ্রেণীর সৃষ্টি বলে মনে করতেন।[৫] হোরেসও স্যাটায়ারকে কাব্যমধ্যে গণ্য করেন নি।[৬]

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' এবং 'লোকরহস্য' প্রভৃতি স্যাটায়ার জাতীয় রচনা লিখলেও স্যাটায়ার সম্বন্ধে তিনি বর্তমান প্রসঙ্গে নিন্দা-সূচক মন্তব্যই করেছেন। স্যাটায়ারকে তিনি ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ফল, হিংসা ও অসূয়াপূর্ণ নরঘাতিনী রসিকতা ইত্যাদি কঠোর আখ্যায় আখ্যাত করেছেন। আধুনিক কালে স্যাটায়ারকে একটি উচ্চাঙ্গের বৈদগ্ধ্যপূর্ণ পরিহাসময় সাহিত্য হিসাবে সমালোচকেরা গণ্য করে থাকেন। স্যাটায়ার রচনার মূলে থাকে সূক্ষ্ম মননশীলতা। স্যাটায়ার রসাবেশ সৃষ্টি করে না সত্য, কিন্তু গভীর চিন্তার উদ্রেক করে। বঙ্কিম স্যাটায়ারের এই বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই জানতেন, কারণ তিনি নিজেই যে স্যাটায়ার রচনা করেছেন, তার প্রকৃতি এই রকম। তবে স্যাটায়ারকে তিনি যে নিন্দা করেছেন, তার কারণ স্যাটায়ারের সংস্কার-উদ্দেশ্যের অতি সহজেই ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এটি একটি অত্যন্ত ধারালো অস্ত্র, এই অস্ত্রচালনায় অসাধারণ আত্মসংযম চাই। পোপ প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে লিখেছিলেন—

> Yes I am proud ; I must be proud to see
> Men not afraid of God, afraid of me :
> Safe from the Bar, the Pulpit, and the throne,
> Yet touched and shamed by Ridicule alone.
> O sacred weapon ! left for Truth's defence,
> Sole Dread of Folly, Vice, and Insolence ![৭]

বঙ্কিমের 'লোকরহস্য' এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে'ও লেখকের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ আছে। এর কোনো কোনো চরিত্র যে বাস্তব চরিত্রেরই ব্যঙ্গাত্মক রূপায়ণ, এ সন্দেহও সমালোচকদের মধ্যে প্রচলিত। দীনবন্ধু মিত্রের নিমচাঁদ এবং আরও কোনো চরিত্র সম্বন্ধেও এই রকম কিংবদন্তী আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বিশেষভাবে 'হুতোম প্যাঁচার' উল্লেখ করেছেন। অন্যত্র তিনি হুতোমের ভাষার নিন্দা করেছেন।[৮] 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন[৯]—

'হুতোম প্যাঁচার মধ্যে যথেষ্ট লোকজ্ঞতা ও পরিহাসরসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থলেই তখনকার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত আছে।

পাথুরিয়াঘাটার কোনও ধনী প্রবীণ বয়সে নিজের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষ্যে স্বর্ণালংকারে ভূষিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের বিদ্রূপবাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল, নন্মায় পাথুরিয়াঘাটা ঘুড়িঘাটায় রূপান্তরিত হইল। Satire হিসাবে হুতোম প্যাঁচা যে খুব effective হইয়াছিল তাহা বোধ হয় না।'

হুতোম প্যাঁচা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে যে মত প্রকাশ করেছেন, সে মত অবশ্য সকলে স্বীকার করেন না।[১০] বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই ইতিপূর্বে *Bengali Literature* প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

> But it is not as a translator that he is known to fame and familiar to almost every Bengali, but as the author of *Hutam Pyancha* a collection of sketches of city life, something after the manner of Dickens' *Sketches by* Boz in which the follies and peculiarities of all classes, and not seldom of men actually living are described in racy vigorous language, not seldom disfigred by obscenity

অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে স্যাটায়ারিস্ট বলা হলেও[১১] তাকে ঠিক ইংরেজি সাহিত্যের সংজ্ঞায় যথার্থ স্যাটায়ারিস্ট বলা যায় না প্রধানত দুটি কারণে। স্যাটায়ারের মূলে থাকে ব্যক্তি অথবা সমাজের সংস্কার-সাধনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বর গুপ্তের সংস্কার সাধনের কোনো উদ্দেশ্য ছিল কিনা সন্দেহ। কোনো অন্যায় বা অসঙ্গতির প্রতি বিদ্বেষ বশত সংস্কারের পরিকল্পনা আসে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ভালো করেই বোঝাতে চেয়েছেন ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ সম্পূর্ণ বিদ্বেষহীন এবং উদ্দেশ্যহীন। দ্বিতীয়ত স্যাটায়ারের মর্মমূলে যে তীক্ষ্ন সচেতন বুদ্ধিকোণ থাকে, ঈশ্বর গুপ্তের রচনার পিছনে তাও ছিল না।

আমাদের পূর্বতন সাহিত্যে বিদ্রূপাত্মক রচনার দৃষ্টান্ত নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যে শ্লেষ বা বাগবৈদগ্ধ্য আছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'স্মিত পরিহাস' আছে কিন্তু সমাজ বা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের অভিনব বিষয়-বস্তুর সঙ্গে খাঁটি বাঙালি রসিকতার মিশ্রণের ফলে এই বিদ্রূপ-ভঙ্গির উদভব হয়েছে বলে মনে হয়। ঈশ্বর গুপ্ত যে সময়ের মানুষ, সে সময়ের পরিবর্তন-চঞ্চল রঙ্গভরা কলকাতা নিয়ে ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা—

ধন্য ধন্য কলিকাতা ধরেছে কলির ছাতা
ধন্য তব নব ব্যবহার।

হইতেছে কত রঙ্গ   নাহি মাত্র তালভঙ্গ
বঙ্গদেশ-পদে নমস্কার।

—শারদীয় পর্ব (১৮৫২)

আমাদের পূর্বতন সাহিত্যে কলকাতার ভৌগোলিক অস্তিত্বের উল্লেখ আমরা কোথাও কোথাও পেয়েছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই বাণিজ্যনগরী হিসাবে কলকাতার গুরুত্ব বেড়ে উঠতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শিক্ষাস্থল বাণিজ্যস্থল রাজনীতিস্থল হিসাবে কলকাতা মধ্যযুগের বর্ধমান মুরশিদাবাদ কৃষ্ণনগর প্রভৃতি শহরের থেকে একটা নূতন এবং ভিন্নতর প্রকৃতি নিয়ে জনকোলাহলপূর্ণ পাশ্চাত্যসভ্যতা-প্রভাবিত ইংরেজ-অধ্যুষিত বিচিত্র নাগরিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে থাকে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) নামে বই লিখে কলকাতাকে তুলনা করেছিলেন কমলালয় বা সমুদ্রের সঙ্গে। গ্রাম্য বাঙালি নগরের আচার-আচরণ রীতিনীতি সমাজ ধর্ম শিক্ষা প্রভৃতির নতুন পদ্ধতির সঙ্গে যে পরিচিত হচ্ছে, এই বইখানা তারই প্রমাণ। কিন্তু এতে বিবরণ আছে, রসসৃষ্টির কৌতুক নেই। ঈশ্বর গুপ্তের মনটি রসিকের মন বলেই ব্যবহারিকতায় পূর্ণ গদ্যময় কলকাতা শহরের দিকে যেন নতুন দৃষ্টিতে তাকাল। পুরনো সমাজ ভেঙেছে তাই 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ', তথাপি 'এত রঙ্গভরা'। এই উক্তিটি ঈশ্বর গুপ্তের। পদ্যপংক্তিটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু এর পরিমিত যতিবিন্যাসে এবং অনুপ্রাসে পংক্তিটি এমন একটি ছবি ফুটিয়ে তুলেছে, যা তাঁর আগের কোনো লেখকের দ্বারাই সম্ভব হয়নি। বাংলা দেশের শুধু ভৌগোলিক অস্তিত্ব নয়, তার সঙ্গে বাঙালি স্বভাবের চিরন্তন রঙ্গপ্রিয়তার যে রূপটি ঈশ্বর গুপ্ত ধরে দিতে পেরেছেন, তার তুলনা বিরল।

বাঙালির এই স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার পরিচয় আছে তার সরস প্রবাদে প্রবচনে পাদপূরণের কৌতুকে তরজায় খেউড়ে। ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের জীবনীতে লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের রচনাসংগ্রহে হাস্যরসপূর্ণ পদ্য সংকলন করে সেকালের রসিকতার বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।[১২] কবির লড়াইয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর-গান খুঁজে বের করতে তাঁর উৎসাহের সীমা নেই, নিজেও উত্তরগান রচনা করেছেন। এ-সব কিছুর ভিতর দিয়ে বিদ্বেষহীনভাবে আক্রমণ করার কৌতুক-প্রিয়তা অতি স্পষ্ট। শুধু সেকালের ব্যঙ্গ ছিল কিছু স্থূল। দীনবন্ধুর কবিত্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চমৎকার বলেছেন—

'দীনবন্ধুর হাস্যরসে অধিকার যে ঈশ্বর গুপ্তের অনুকারী বলিয়াছি, সে

কথার তাৎপর্য এই যে দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে এক জাতীয় ব্যঙ্গ-প্রণেতা ছিলেন। আগেকার দেশায় ব্যঙ্গপ্রণালী এক জাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালোবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভাল বাসিত , এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ।'

বঙ্কিম যে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গকে বলেছেন কবির লড়াইয়ে শিক্ষিত—বিদ্বেষহীন রসিকতা, এই মন্তব্য এই পরিপ্রেক্ষিকায় যথার্থ। এই হাস্যরসপূর্ণ বাগ্‌ভঙ্গিমা তাঁর কবিতার একটা টেকনিক মাত্র। এই ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ যে সত্য সত্যই কোনো বিকৃতি রোধ করবার চেষ্টায় করেছেন, তা নয়। 'তারা হুট করে বুট পায়ে দিয়ে চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে'— এই সরস বর্ণনায় তিনি যে বুট পায়ে দেওয়া এবং চুরুট ফোঁকাকে বন্ধ করে সংস্কার আনতে চান, তা মনে করলে ভুল করা হবে। তখনকার দিনের পক্ষে এই অভিনব অভ্যাসটিতে কৌতুক বোধ করে তিনি এই লাইনটি লিখেছিলেন। 'হুট' এবং 'বুটে' মিল দিয়ে যে উইট তিনি সৃষ্টি করলেন সেটা কবির লড়াইয়ে যথেষ্ট প্রচলিত। এক জায়গায় তিনি বলেই ফেলেছেন—

পরিহাসছলে ইথে কাব্য আছে যত।
সে কেবল ব্যঙ্গমাত্র নহে মনোগত॥
অতএব কেহ তার ধরিবে না দোষ।
কবিরে করিয়া কৃপা হও আশুতোষ॥

—বড়দিন

বঙ্কিম বলেছেন 'ইয়ারকি করার অভ্যাস'। এই অভ্যাসের ফলেই কবিতায় যে বিষয় নিয়ে রসিকতা করেছেন, গদ্যে তাকে অন্যভাবে দেখিয়েছেন। ঈশ্বরকে তিনি যখন 'হাবা আত্মারাম' বলেন, তখন তাঁর ঈশ্বরে অবিশ্বাস প্রকাশ পায় না। তাঁর অসংখ্য ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় কবিতায় তার সত্যকার মনোভাব সুস্পষ্ট। অক্ষয়কুমার দত্তকে নিয়ে একাধিক কবিতায় তিনি কত ব্যঙ্গ করেছেন, কিন্তু গদ্য ও পদ্যে লিখিত রচনায় তাঁর প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের গভীর স্নেহ প্রশ্নাতীত। আধুনিক নারীসমাজকে নিয়ে লেখা কবিতা থেকে এরকম ধারণা বহুপ্রচলিত হয়েছে যে তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন কিন্তু সংবাদপ্রভাকরের গদ্যরচনায় মনোভাব অন্য— বেথুন বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করলে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদকীয় লিখে আনন্দ প্রকাশ করেন[১৩]। চন্দ্রিকায় স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী মন্তব্য প্রকাশিত হলে তিনি তার তীব্র সমালোচনা করেন। বাংলা ভাষার প্রচার করার জন্য তিনি বিশেষ

ব্যাকুল ছিলেন, কিন্তু আধুনিক বিদ্যাব প্রচারের জন্য তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না'[৪]। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয স্থাপনের সম্ভাবনায তাঁর উৎসাহপূর্ণ মন্তব্য দেখে কবিতায় আধুনিকতার প্রতি নানা ব্যঙ্গকে বিশুদ্ধ বসিব তা ছাড়া কিছুই মনে হয না। এক কথায বলতে গেলে তৎকালীন আধুনিক কলকাতা ঈশ্বব গুপ্তের রঙ্গপ্রিয মনটিকে নানা কৌতুক রচনায অনুপ্রেবিত করেছে। এগুলিকে কৌতুক হিসাবে দেখাই সঙ্গত। এতকাল ঈশ্বর গুপ্তেব কযেকটি কবিতা মাত্র প্রচলিত ছিল। তার থেকে ঈশ্বর গুপ্তেব ব্যক্তিমনটিকে আমরা একভাবে বুঝেছিলাম। এখন নতুনভাবে বুঝে নেবাব সময এসেছে। অবশ্য এসব কবিতায কোথাও যে তাঁর গুরু মনোভাব লঘু ভঙ্গিতে প্রকাশ পায নি তা নয। যেমন পাদ্রীদের সম্পর্কে বা সিপাই যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁব ব্যঙ্গ। গদ্যরচনাতেও একই মনোভাব প্রকাশিত। কিন্তু রস পাওযাব এবং রস দেবাব শিল্পীসুলভ মনোভাবই সবত্র প্রধান।

এ জন্য ঈশ্বর গুপ্তের সামাজিক কবিতাগুলিব উচ্চাব বসতত্ত্বের বিচারে মূল্য যাই হক, কাব্যশিল্প হিসাবে এদেব একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। এই কবিতাগুলিকে প্রচারধর্মী মনে কবা ঠিক নয— এদেব মূল্যবিচাবে আমবা অবশ্য এই দিকটাকেই একমাত্র বক্তব্য করে তুলি। বঙ্গ কৌতুক হচ্ছে ঈশ্বর গুপ্তের বিষয়-পরিবেশনের প্রণালী বা ফর্ম। মূলত কবিওযালাদের থেকে পাওযা হলেও এফর্ম তার নিজস্ব এবং এই ফর্মটিকে আব কোনো কবি কবিতাব ক্ষেত্রে এমন সার্থকভাবে ব্যবহার করেন নি। কবিওযালারাও কৌতুক বা রসিকতাকে ঈশ্বর গুপ্তের মতো এতখানি সংহত আর্টে রূপ দিতে পাবে নি। ঈশ্বব গুপ্তেব একটি অদ্ভুত উপমা, পযারের চোদ্দ মাত্রার সীমায বদ্ধ তির্যক বাগ্‌ভঙ্গিমা, যমক বা শ্লেষেব সপ্রতিভ (smart) অর্থচাতুর্য বসিকতাকে যত ক্ষুদ্রায়তনে তীক্ষ্ণ করে তুলতে পেরেছে, এমন আর কাবো হয নি। ভাবতচন্দ্র এব সার্থকতম শিল্পী সন্দেহ নেই, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তেব বিষয়বৈচিত্র্যেব জন্য মৌলিকতাও অনস্বীকার্য।

তিনি তপসে মাছকে বলেন,

গালভরা গোঁপদাড়ি তপস্বীর প্রায

এই অদ্ভুত উপমাটি মাত্র চোদ্দ মাত্রাব সীমায বদ্ধ। পরবর্তী পংক্তিতেও কবি এই সাদৃশ্যটিকে আর বিস্তৃত করেন নি—করেন নি বলেই এই কৌতুকপূর্ণ প্রকাশভঙ্গিমা সংহত আর্টে পরিণত হযেছে। যমকে অনুপ্রাসেও এমনি করে সংহতি নিযে এসেছেন—

ইচ্ছা করে কাঁচা খাই সমুদয় লয়ে।
হাড়শুদ্ধ গিলে ফেলি হাড়গিলে হয়ে॥

—পাঁটা

হাড়গিলে শব্দটি দুভাবে ব্যবহার করে কৌতুক রসের সৃষ্টি হয়েছে। এই পর্যন্তই যথেষ্ট, এর আর বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় নি। তেমনি তির্যক বাগ্‌ভঙ্গিমা—

বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে।

—আচারভ্রংশ

কিংবা,

দিশি কৃষ্ণ মানিনেক ঋষিকৃষ্ণ জয়।
মেরিদাতা মেরিসুত বেরি গুড বয়॥

—ইংরাজী নববর্ষ

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তুলেছেন ঈশ্বর গুপ্তের এই লাইন—

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল, বিচিলি ঘাস॥
যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুশি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না॥

—নীলকর

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'কেবল এর হাসিটা নয়, এর ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিটা লক্ষ্য করে দেখবার বিষয়'।[১৫] অথচ এ-কবিতা প্রত্যক্ষত হাসির কবিতা নয়, দুঃখ-প্রকাশের কবিতা। কিন্তু এর বলবার বিচিত্র ভঙ্গিটা দুঃখের মধ্যে হাসির উদ্রেক করে। এই গাঢ়বন্ধ মার্জিত ভাষার স্টাইলে ভারতচন্দ্র অতুলনীয়। তাঁর

বৎসর পনর ষোল বয়স আমার।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগারো ভাতার॥

কিংবা

স্বয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥

প্রভৃতি স্মরণীয় পংক্তিগুলির সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের বলবার ভঙ্গির মিল আছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র সচেতন শিল্পী— শব্দ-ব্যবহারে তিনি সতর্ক। তাই তাঁর ভাষা আর্টিস্টের ভাষা। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর তুলনায় 'অশিক্ষিতপটু'। কিন্তু দুজনের রসিকতার প্রকৃতিটি খাঁটি বাঙালি ধরনের। তথাপি ঈশ্বর গুপ্তের প্রকাশভঙ্গিমার মধ্যে স্বভাব-কবিয়ালদের অনায়াস নৈপুণ্য আছে। তাব প্রযুক্ত শব্দগুলি সদা-প্রচলিত, উপমাগুলি গদ্যময়, সাধাবণ অথচ অপ্রত্যাশিত, যেমন

শয্যায় ভার্যার প্রায়
ছারপোকা ওঠে গায়

কিংবা গ্রীষ্মকালে বাববাব জল খেযে
ডাগব হইল পেট সাগর সমান।

ভারতচন্দ্রের ভাষার পরিচ্ছন্নতা বেশি গাঢবদ্ধতাও বেশি, মার্জিত বৈদগ্ধ্যও অসাধারণ। সমগ্রভাবে দেখতে গেলে ঈশ্বব গুপ্তেব প্রকাশরীতিতে সংহত রসিকতা ও চাতুর্য থাকলেও কবিতাগুলি অতিকথনদুষ্ট এবং দীর্ঘ। ভাবতচন্দ্রের পরিমাণ-বোধ উচ্চতর শিল্পীর মতো নিখুঁত। কিন্তু একথাও সত্য ঈশ্বর গুপ্ত রসিকতার ভঙ্গিটি কবিওযালাদের থেকে পেলেও এবং তাব প্রকাশভঙ্গিমা ভাবতচন্দ্রকে স্মরণ কবিযে দিলেও এই সব কবিতায তাঁর এমন একটি 'এ্যাটিচুড' বা ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে যা তাঁর নিজস্ব। মঙ্গলকাব্যের কবি ভারতচন্দ্র 'অবজেকটিভ' রীতিতে বর্ণনা করে গিয়েছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত বস্তুতই কবিতায় নিজের মনের রঙ্গময় প্রতিক্রিযাই বর্ণনা কবেছেন। বলবার ভঙ্গিতে 'আমি'র একটা সুব সহজেই ধবা পড়ে। এই 'আমি' পরিপার্শ্বের সচেতন উপভোক্তা কৌতূহলী দর্শক এবং মজলিশি রসিক। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা লিরিক বা গীতি-কবিতা নয। কিন্তু গীতিকবিতার স্বগত উক্তির পূর্বাভাস এখানে দুর্লক্ষ্য নয়।

কলকাতা শহর ঈশ্বর গুপ্তের সামাজিক বিষযের কাব্যশ্রেণীতে অনেকটা বড়ো স্থান জুড়ে থাকলেও বাঙালিব সেকালের মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য জীবন বলতে গেলে, শেষবারের মতো ঈশ্বব গুপ্তের কাব্যে মাধুর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে-সমস্ত কারণে তাঁকে খাঁটি বাঙালি কবি বলেছেন তার অন্যতম কারণ কাব্যের এই বিষযবস্তু। ঈশ্বর গুপ্তের পর পুরাণ থেকে বিষয় নিয়ে মহাকাব্য লেখা হয়েছে। অথবা আত্মগত ভাবময় লিরিক কবিতা লেখা হয়েছে এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইতিহাস-অবলম্বনে অথবা কলকাতার সমাজ নিয়ে বই লেখা হয়েছে কিন্তু সেই প্রাচীন পল্লীবাংলার গার্হস্থ্য চিত্র আর পাই না। ঈশ্বর গুপ্ত

নাগরিক উৎসব 'বড়দিন' নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তেমনি 'পৌষপার্বণ' এবং বাঙালির নানা খাদ্যদ্রব্য নিয়েও লিখেছেন স্মরণীয় সরস কবিতা। পৌষপার্বণ উপলক্ষে বাঙালি বাড়িতে গৃহিণীদের মধ্যে কর্মতৎপরতা ও ব্যস্ততা ফুটে ওঠে—মেয়েদের ডাকাডাকি, শাশুড়ীর মুখঝামটা, জামাইয়ের আপ্যায়ন, রান্নাঘরের ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দ, পড়শীর নিমন্ত্রণ—সব মিলে বাঙালি সংসারের নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন ঈশ্বর গুপ্ত। এই আনন্দ ও ব্যস্ততার মধ্যে শাশুড়ীর বধূকে গঞ্জনার চিরকালীন ছবিটিও আঁকতে ভোলেন নি।—

হ্যালা বউ কি করলি দেখে মন চটে।
এই রান্না শিখেছিস্ মায়ের নিকটে॥
সাত জন্ম ভাত বিনা যদি মরি দুখে।
তথাচ এমন রান্না নাহি দিই মুখে॥
বধূর মধুর খনি মুখশতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু ছল ছল॥

শুধু এই বিষয়ের কবিতাতেই নয় পুরনো বাঙালি জীবন এণ্ডাওয়ালা তপস্যা মাছ, পাঁঠা, আনারস, ঋতুবিষয়ক কবিতাগুলিতে নানাভাবে ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রতীক-শব্দ ব্যবহার করেছেন ঈশ্বর গুপ্তের বাঙালী বৈশিষ্ট্য বোঝাতে। 'মোচার ঘণ্ট' বস্তুটি সত্যিই বাঙালি সংসারের নিজস্ব অতি-পরিচিত রান্না। বাঙালি সংসারের এই বর্ণনাতেও কবির নিজের বাগ্‌ভঙ্গিটি ঠিকই আছে—

মাগীদের নাহি আর তিন রাত্রি ঘুম।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রন্ধনের ধুম॥

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের সামাজিক এবং পারমার্থিক কবিতা নিয়েই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নি। এই কবিতাগুলিকে তেমন উৎকৃষ্ট তিনি মনে করেন না। অবশ্য পারমার্থিক কবিতাকেও তিনি 'নীরস' বলেছেন কিন্তু মানুষটিকে চেনবার জন্যই এই কবিতার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় থাকা দরকার। ঋতুবিষয়ক কবিতা সে বিষয়ে সাহায্য করে না।

বঙ্কিমচন্দ্র-কল্পিত কাব্যোৎকর্ষের নিম্নতলে এই কবিতার স্থান। তিনি একে বলেছেন 'বর্ণন কাব্য'। এই শব্দটি তিনি প্রয়োগ করেছিলেন গঙ্গাচরণ সরকারের 'ঋতুবর্ণন' কাব্য সম্পর্কে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের ঋতু-কবিতাগুলির

নিজস্ব বিশেষত্ব আছে এবং এগুলি আলোচনাযোগ্যও বটে। নবজীবনের আলোচনায় বঙ্কিম সায় দেন নি।[১৩]

মনে রাখা দরকার আমাদের সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের আগে প্রকৃতি-কবিতা লেখার ঐতিহ্য নেই। কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে প্রকৃতিকে তিনিই প্রথম নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ইংরেজি রোমাণ্টিক কাব্যে প্রকৃতির যে-স্থান এবং রূপ, ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে তার ছায়াপাত হয় নি। সেই কাব্যে প্রকৃতি মানুষের মনে গভীর রহস্যবোধ, জীবনজিজ্ঞাসা ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-চেতনার উদ্রেক করে। প্রকৃতির আদিম জীবনে সভ্যতাপীড়িত মানুষের মুক্তি —ফরাসি বিপ্লবের সময়ের এই চিন্তাধারা থেকে প্রকৃতি রোমানটিক কাব্যে অফুরন্ত কল্পনার লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। জীবনের ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণের উপায় হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। কাব্যের ক্ষেত্রে প্রকৃতির এই মহৎ ভূমিকা ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য থেকে বোঝবার উপায় নেই। তাঁর কাব্যে প্রকৃতির ভূমিকার রীতি-পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। ঋতু-বিষয়ের কবিতা তিনি লিখেছেন প্রচুর। গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত পর্যন্ত প্রতি ঋতু নিয়ে ছোটো-বড়ো অনেক কবিতা তিনি লিখেছেন। কিন্তু প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসাবে দেখিয়ে তার রূপবৈচিত্র্যকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন নি। এক-একটা ঋতুর উপ স্থিতি প্রাণিজগতে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা তারই নিখুঁত বিবরণ। অর্থাৎ তাঁর কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে সে মূলত মানুষের জীবনেরই, সমাজ-সংসারেরই কবিতা—এই বৈশিষ্ট্য ঋতুকবিতারও। প্রকৃতি-কবিতায় সৌন্দর্য ও রহস্যবোধ, তার ভাবময় রূপ বিহারীলাল হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের কাব্যে এবং সর্বশেষে রবীন্দ্র-কাব্যে মানুষকেও প্রচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য বিভিন্ন ঋতুতে মানুষের সংসারের বর্ণনা।

সংস্কৃতসাহিত্যে প্রকৃতিকাব্যের দুটি রূপ, শকুন্তলার প্রকৃতি এবং ঋতুসংহারের প্রকৃতি। শকুন্তলার প্রকৃতিকে অনুকরণ করা সহজ নয় কিন্তু ঋতুসংহারের প্রকৃতিকে অনুকরণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ তা মানুষের জীবনে এবং পৃথিবীতে ঋতুর ক্রিয়া বর্ণনা। এ বর্ণনা নেহাৎই বহিরঙ্গ, এর সঙ্গে কবিকল্পনার তেমন নিগূঢ় যোগ নেই। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যরীতি এর অনুরূপ। তবে তাঁর জগৎ এবং কালিদাসের জগৎ আলাদা। কালিদাসের ঋতুবৈচিত্র্য ঘটে হিমালয়ের বনে বনে, সুদূর শস্যক্ষেত্রে, বনস্থলীতে, অনুদ্গতপল্লব ক্রম-রাজিতে, নৃত্যরত শিখীর কলাপচক্রে, কাশ-কুসুমাবৃত পৃথিবীতে, নববধূর মতো

রূপরম্যা শরৎকালের শঙ্খধবল মেঘপুচ্ছে, কামশরপীড়িত বসন্তব্যাকুল রমণীদেহে। ঈশ্বর গুপ্তের ঋতুপরিবর্তন ঘটে বাংলাদেশের নদীনালায়, হাটুরে-চাষীর জীবনে, রান্নাঘরের ভিজে কাঠে, দুর্গাপূজার উৎসব-আয়োজনে, নস্যলোসা দধিচোষা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রত্যাশায়, স্বামীস্ত্রী-পুত্র-কন্যার সংসারে, দরিদ্রের ছেঁড়া কাঁথায়। তবু ঈশ্বর গুপ্তের ঋতুবর্ণনায় ঋতুসংহারের ছায়া আছে তাতে সংশয় করা চলে না। অন্তত ঋতুসংহার যে কবি ঈশ্বর গুপ্তের ঋতু-সম্বন্ধীয় কবিতা রচনার মূলে প্রেরণা-রূপে ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

এই কবিতায় তিনি শক্তির পরিচয়ও দিয়েছেন। বহিঃপৃথিবীর বর্ণনা অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রতাপে রুদ্ধশ্বাস মানুষের বর্ণনায়,

এমন আকশি নাই খোঁচা মেরে দেখি ভাই
আকাশেতে জল আছে কিনা।

কিংবা—

কোথায় বরুণ হায় কোথায় বরুণ।
বরুণ করুণ হয়ে সাগর ভরুন॥

শীতকাল—

জলের উঠেছে দাঁত কার সাধ্য দেয় হাত
আঁক কবে কেটে লয় বাপ্।
কালের স্বভাবদোষ ডাক ছাড়ে ফোঁস ফোঁস
জল নয় এ যে কালসাপ॥

এসব বর্ণনায় সাধারণ মানুষের গদ্যময় অনুভূতি গদ্যগন্ধী ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে, তার উপভোগ্যতা কম নয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দের সুপ্রচুর ব্যবহার এই কবিতার ভাষার বিশেষত্ব। প্রকৃতিতে মানবরূপের আরোপ করে একটি ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও কবি দিয়েছেন। ঋতুসংহারের বর্ষার রাজকীয় আগমনকে কবি এখানে বিস্তারিত করে দিয়েছেন। তার চেহারা কি রকম—

সবুজ মেঘের দল ঢল ঢল ছল ছল
হতবল প্রবল অনিলে।
স্থিরচক্ষে দেখা যায় সাটিনের কাবা গায়
আস্তিন হয়েছে তার ঢিলে॥
সোনার দামিনী হার গলায় দুলিছে তার
আহা মরি কত শোভা তায়।

শেফালিকা প্রস্ফুটিত অতিশয় সুশোভিত
জরির লপেটা লতা পায়॥

—বর্ষা

এই কবিতার ভাষায় অলংকরণও যেন অন্যান্য শ্রেণীর কবিতার চেয়ে বেশি। শব্দালংকার ছাড়াও উপমার প্রয়োগেও কবির কৃতিত্বের পরিচয় আছে। তবে এসব অলংকার ততখানি কাব্যরসপূর্ণ নয়। কারণ এর পরিবেশ কাজের লোকের ব্যবহারিক প্রয়োজনের পরিবেশ।

ঈশ্বর গুপ্তের পারমার্থিক বিষয়ের কবিতা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এখানে এই শ্রেণীর কবিতার কয়েকটি বিশেষত্বের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা যেতে পারে।

আমাদের পূর্বতন সাহিত্য প্রায় সবই ধর্মাশ্রয়ী। সুতরাং ধর্ম নিয়ে কবিতা লেখা কিছু নতুন নয়। এতে ঈশ্বর গুপ্তের মৌলিক কৃতিত্ব তেমন নেই মনে হতে পারে যেমন কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন সামাজিক ও ব্যঙ্গ কবিতায়। বাউল এবং শাক্তসংগীত ছাড়া আগের ধর্মমূলক সাহিত্য কাহিনী অবলম্বনে গঠিত, দেবমাহাত্ম্য-পূর্ণ। বাউলের গানে সাধকের আত্মগত উপলব্ধি রূপক-অবলম্বনে প্রকাশিত; শাক্তসংগীতও আত্মগত। কিন্তু শাক্তসংগীত ভক্ত-ভগবানের দ্বৈতভাবের হৃদয়-লীলার সংগীত। বাউল গান বিশুদ্ধ তত্ত্বের গান। শাক্তগান রসের গান। রামপ্রসাদের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের অসাধারণ শ্রদ্ধা, বিশেষত তাঁরই অঞ্চলের সাধক বলে তাঁর প্রতি গভীর আত্মীয়তাবোধ স্বাভাবিক। রামপ্রসাদের প্রভাব ধর্ম-ভাবনায় এবং কাব্যরীতিতে তাঁর উপরে পড়লেও ঈশ্বর গুপ্তের পারমার্থিক রচনাগুলির বিভিন্নতাও লক্ষণীয়। ঈশ্বর গুপ্তের যে রচনাগুলি রক্ষিত হয়েছে, তাতে কোথাও ঠিক স্মার্ত হিন্দুর ধর্মচিন্তাকে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে দেখতে পাই না। বাঙালি হিন্দুর কোনো পূজা-অনুষ্ঠান বা কোনো দেবতার উৎসব আয়োজনের বর্ণনা কিংবা প্রশস্তি রচনা নেই। 'মহাকালীর স্তব' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়।[১৭] কিন্তু এ-কবিতাটিকে প্রচলিত অর্থে আনুষ্ঠানিক ধর্মের কবিতা বলা যায় না। এই কবিতার কালীভাবনা রামপ্রসাদের কালীভাবনার সঙ্গে স্পষ্ট সাদৃশ্যযুক্ত। 'মনের প্রতি উপদেশ' কবিতায় তিনি শিবকে বলেছেন তাঁর আরাধ্য। কিন্তু এটা একটা প্রাসঙ্গিক উক্তিমাত্র। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি।

ঈশ্বর গুপ্তের পারমার্থিক ও নৈতিক কবিতাগুলি কবিতা হিসাবে উৎকৃষ্ট নয়;

কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে বিষয় হিসাবে এগুলি নতুন। ঈশ্বর গুপ্ত পূর্বধারা অনুসরণ করে কবিওয়ালাদের প্রভাবে আগমনী গান রচনা করেছিলেন।[১৮] আগমনী-বিজয়া বিষয় নিয়ে লেখা তাঁর 'সারদামঙ্গল' নামে বিবিধ ছন্দে রচিত কাব্য বসুমতী-সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে (পৃ ২৬৭—২৮৮) সংকলিত আছে। এর কবিতাগুলি সংবাদপ্রভাকরে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা দেশের বহু প্রচলিত জনপ্রিয় কাহিনীকে গ্রহণ করেছেন।[১৯] কিন্তু তাঁর নিজস্ব অভিনব কবিতা বঙ্কিমচন্দ্র-সংগৃহীত পারমার্থিক কবিতা। অদ্বৈতবাদকে অবলম্বন করে দর্শনে প্রচলিত দৃষ্টান্ত ও উপমার সাহায্যে রচিত ঈশ্বর গুপ্তের আত্মমগ্ন কবিতাগুলির পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দার্শনিক আলোচনা আছে সত্য, কিন্তু সেটা একটা সমগ্র অখণ্ড জীবনীকাব্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়-বিস্তার। আলাদা কাব্যচর্চা হিসাবে মধ্যযুগে এ-বিষয় গৃহীত হয় নি।

রামমোহন রায়ের সময় থেকেই এদেশে প্রতিমাপূজাবিরোধী আচারঅনুষ্ঠান-বিরোধী আন্দোলন তৈরি হয়। দেশের ইংরেজিশিক্ষিত সমাজের মধ্যে তার প্রভাব পড়ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা এবং রামমোহনের ব্রহ্মসভা মিলিয়ে নতুন তত্ত্ববোধিনী সভা গডলেন, তাতেও এই মনোভাব দৃঢ় হয়ে উঠল। ঈশ্বর গুপ্ত এই সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সে-কথা বলেছেন এবং এ বিষয়ে আরো তথ্যও সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু দার্শনিক মত হিসাবে এই নতুন চিন্তায় কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছিল। শঙ্করপন্থী রামমোহন ছিলেন অদ্বৈত বেদান্তের নতুন ব্যাখ্যাতা এবং প্রচলনকর্তা, অথচ দ্বৈতবাদীর ভঙ্গিতে উপাসনাও করতেন। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ব হিসাবেই দ্বৈতবাদকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিলেন যদিও প্রতিমাপূজা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন। এই ধর্মান্দোলনে অলৌকিক অনুভূতির সত্যনির্দেশ কতখানি ছিল এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও মানবকল্যাণমূলক নীতিবাদের প্রেরণা যে ছিল তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। ঈশ্বর গুপ্ত নতুন যুগের ধর্মচিন্তায় আকৃষ্ট হয়ে পারমার্থিক ও নৈতিক কবিতাগুলি লেখেন। অদ্বৈতবাদী চিন্তায় অনুপ্রেরিত 'সব হ্যায় ফাঁক'-এর সঙ্গে আছে,

বদনে বচন-বৃষ্টি কটাক্ষে জগৎ সৃষ্টি
দেখিয়া এরূপ সৃষ্টি হতেছে বিস্ময়।
বিকল মনের কল এই মাত্র কোরে বল
উঠেছিল ক্ষুধানল জলে অতিশয়॥

স্নিগ্ধবারি সহকারে   সুমধুর ফলাহারে
জুড়াইল একেবারে জঠরনিলয় ॥
কে করিল এই তঙ্ক   কে করিল এই পঞ্চ
কে দিযাছে বুদ্ধি মন, কে দিযাছে ছয় ?

—স্বায়ম্ভুব মনুর বিশ্বদর্শন

এই সংসারের শূন্যতা এবং পূর্ণতার এই দ্বন্দ্ব বস্তুতই সে কালের ধর্মচিন্তার ফল। বহু কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত নিবৃত্তি-সাধনা, বৈরাগ্য অবলম্বন, মোহমুক্তি মায়াপাশছেদনের কথা বলেছেন। এসবই সন্ন্যাসবাদের ফল। বিদ্যাসুন্দর কবিগণের আদিরসের ছড়াছড়ির সময়ে দেশে নাগরিক জীবনের বৈচিত্র্য-বিকাশের সন্ধিক্ষণে এই বৈরাগ্যের উৎস ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিগত জীবনে কোথায় ছিল বলা কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্র অনুমান করেছেন তাঁর মনটাই ছিল স্বভাবনির্লিপ্ত। বস্তুত সাংসারিক জীবনে অনেক মূল্যবান সম্পদ তিনি হারিয়েছিলেন—জননী, স্ত্রী জীবিত থাকতেও বিচ্ছিন্ন, অল্পবয়সে পিতার মৃত্যু। এর সঙ্গে তাঁর যে সন্তান ছিল না তাও স্মরণীয়। হয়তো এসব কারণেই তাঁর মন ভিতরে ভিতরে বৈরাগ্য-প্রবণ হয়েছিল। কিন্তু সংসারের প্রতি তাঁর কর্তব্য ছিল—ভাই রামচন্দ্রকে মানুষ করা। এই জন্যই জগতের অনিত্যতার সঙ্গে সংসারের রূঢ় বাস্তবতা তাঁর মনে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। সমাজ এবং জগতের চিন্তায়, হয়তো সংবাদপত্রের সম্পাদক বলেই, তাঁকে অনুক্ষণ ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে। নৈতিক চিন্তাতেই তিনি লিখেছেন,

সভ্য অভিমানী যারা   মরি কিবা সভ্য তারা
সভ্যতার কি কব ব্যাভার।
কার্য করে দেখিয়াছি   পরীক্ষায় জানিয়াছি
সভ্যতাই পাপের ভাণ্ডার ॥

—তত্ত্ব

ঈশ্বর গুপ্তের বৈদান্তিক চিন্তার মধ্যেও বিশেষত্ব ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেটা লক্ষ্য করেছেন। তাঁর ঈশ্বর-ব্যাকুলতা আচার-অনুষ্ঠান পালনের অভ্যাসে পর্যবসিত ছিল না। অন্তত তাঁর কবিতার থেকে অনুমান হয় যে, পূজাপদ্ধতির প্রতি তাঁর খুব অনুরাগ ছিল না। দেশাচার-লোকাচারের প্রতিকূলে তাঁর সুস্পষ্ট মন্তব্য আছে 'তত্ত্ব' কবিতায়।[২০] 'মহাকালীর স্তব' কবিতায় বলছেন—

তীর্থ-পর্যটন শ্রম কেবল মনের ভ্রম
ব্যতিক্রম আপন জীবনে ॥
প্রত্যয় পরম ধন সকলের মূলে মন
সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য মনে ॥

এই উক্তি রামপ্রসাদের প্রতিধ্বনি—

আর কাজ কি আমার কাশী
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারানসী।
ওরে কালীপদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি ॥[২১]

—এই গানটি উদ্‌ধৃত করে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন—

'মহাকবি মৃত রামপ্রসাদ সেন মহাশয় কিরূপ রসিক, কিরূপ প্রেমিক, কিরূপ ভাবুক, কিরূপ ভক্ত ও কিরূপ জ্ঞানী ছিলেন এই সঙ্গীত দ্বারাই প্রেমভক্তিশালি মহাশয়েরা সহজে তাহার মর্মজ্ঞ হইতে পারিবেন। যাঁহারা নিরাকারবাদি, তাঁহারাও এই গান শুনিয়া প্রেমার্দ্রচিত্ত হইবেন, যেহেতু ইহা জ্ঞানযুক্ত প্রেম-ভক্তিরসে পরিপূরিত। নিরাকারবাদিরা 'ব্রহ্ম' শব্দ উল্লেখপূর্বক যাঁহার ভজন ও উপাসনা করেন, ইনি 'কালী' নাম উচ্চারণ পূর্বক তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিয়াছেন। ইহাতে নামান্তরজন্য ভাব রস ভক্তি প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পারে না। উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যই এক। যথার্থভাবে ব্রহ্মোপাসনা উভয় পক্ষেরই তুল্য হইতেছে। তাঁহারা যেমন তীর্থ পর্যটনাদি ক্রিয়া কর্ম গ্রাহ্য করেন না, ইনিও তদনুরূপ করিযাছেন।'

এই দীর্ঘ উদ্‌ধৃতিটি ঈশ্বর গুপ্তের পারমার্থিক কবিতার একটি মূল্যবান বিশেষত্ব বোঝবার পক্ষে খুবই সহায়ক। ঈশ্বর গুপ্ত তত্ত্ববোধিনী সভার দলভুক্ত ব্রাহ্ম মনোভাবাপন্ন হয়েও রামপ্রসাদের ধর্মভাবনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, এখানে তার সূত্র পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মে ভক্তিবাদের সাধনা প্রচলিত হওয়ায় রামপ্রসাদী সাধনার সঙ্গে তার কোনো বিরোধ হয় নি। ব্রাহ্ম-ধর্মে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক দাস্য অথবা শান্তরসের। ঈশ্বরকে পিতারূপে সম্বোধন করা এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য। রামপ্রসাদের কালী ব্রহ্মময়ী তারা। রামপ্রসাদের মাতৃসম্বোধনে এবং ব্রাহ্মদের পিতৃসম্বোধনে বিশেষ পার্থক্য নেই। কেবল এইটুকু যে রামপ্রসাদের জননী-পুত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষতা এবং স্বাভাবিকতা অনেক বেশি। বাস্তব মায়ের সম্পর্কের মতো মান অভিমান আবার মায়েতেই একান্ত নির্ভরশীলতা রামপ্রসাদের মাতৃসম্বোধনকে মর্মস্পর্শী করেছে।

ঈশ্বর গুপ্তের পিতা-পুত্রের কল্পিত সম্পর্কের মধ্যেও রামপ্রসাদী সাধনার এই ভঙ্গিটি বর্তমান। প্রশ্ন এই যে মায়ের সঙ্গে শিশুসন্তানের বাৎসল্যলীলার এই সম্পর্ক যত সহজ ও স্বাভাবিক, পিতার সঙ্গে শিশু-পুত্রের এই ধরনের মান-অভিমানের রীতি ততখানিই স্বাভাবিক কিনা। রামপ্রসাদের গানগুলি যে অনেক সুন্দর এবং সাবলীল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশ্বর গুপ্ত দশ বৎসর বয়সে মাতৃহীন হয়েছিলেন, তারও আট বছর পরে পিতাকে হারান। মাতৃহীন হওয়ার পর তিনি পিতার সান্নিধ্য থেকে দূরে মাতুলগৃহেই লালিত হন। তাঁর কাছে মায়ের অভিজ্ঞতা ও পিতার অভিজ্ঞতায় খুব পার্থক্য ছিল বলে মনে হয় না। সুতরাং ঈশ্বরকে পিতৃরূপে সম্বোধন ব্রাহ্ম রীতিরই প্রভাব। তাঁর স্বাভাবিক ঈশ্বর-ব্যাকুলতার সঙ্গে ব্রাহ্মরীতি মিশ্রিত হয়ে এই বিশিষ্ট কবিতার জন্ম হয়েছে।

ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদের ধর্মভাবনা দিয়েই যে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা নয়,তাঁর কল্পনাভঙ্গিও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বরব্যাকুলতার ভাষা রামপ্রসাদের মতো অত গ্রাম্য সরলতায় পূর্ণ নয়। দর্শনশাস্ত্রের শব্দ ও ভাষাভঙ্গির ব্যবহার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় এসে ভক্তের অধীরতার সঙ্গে জ্ঞানীর জিজ্ঞাসা মিশিয়ে দিয়েছে। যেমন,

> মাটির নির্মিত ঘট নহে মাটি বই
> সলিলের বিম্ব আমি সলিলেই রই ॥
> আকাশ রয়েছে এই ঘটের আগারে।
> এই ঘট হলে নাশ মৃত্যু বলে তারে ॥
>
> —বিভুর পূজা

> তুমি আমি দুই পাখী এক গাছে বাস।
> তোমার গোপন ভাব না হয় প্রকাশ ॥
>
> —নিবেদন

'নির্গুণ ঈশ্বর' রচনাটিতে ব্রহ্মের নিরাকারত্ব নিয়ে অনুযোগ। যাঁর সঙ্গে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক তিনি যদি 'অপাণিপাদ' রূপে অভিহিত হন তবে সন্তানের বিমূঢ়তার সীমা থাকে না। নির্গুণ ঈশ্বর এই কথাটা দর্শনে নাই। এটা ঈশ্বর গুপ্তেরই রচনা। ব্রহ্মের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক হয় না, ঈশ্বরের সঙ্গে হয়; অথচ তিনি নাকি নির্গুণ ব্রহ্মরূপেও দেখা দেন। মোটের উপর ঈশ্বর গুপ্তের একশ্রেণীর কবিতা রামপ্রসাদী ধর্মচেতনার সাক্ষ্যবহ হলেও তত্ত্বভাবনাপূর্ণ, এজন্য অত রসবিগলিত ও মাধুর্যময় নয়।

ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মভাবনাগুলি সংকলিত হয়েছে গদ্যে লেখা 'প্রবোধপ্রভাকর' গ্রন্থে। বস্তুত তাঁর পারমার্থিক কবিতা প্রবোধপ্রভাকরের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে পারলেই ভালো হয়। পিতা-পুত্রের প্রশ্ন ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে জগতের তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। কবিতার মতোই তাতে বৈদান্তিক দৃষ্টির লক্ষণ আছে। দেখা যায় ঈশ্বর গুপ্ত শেষের দিকে গুরু দার্শনিক চিন্তার দিকে ঝুঁকেছিলেন। আমরা তাঁকে সামাজিক ব্যঙ্গপরায়ণ লঘুরীতির কবি বলেই জানি, কিন্তু তাঁর ধর্ম ও দর্শনচিন্তার আলাদা পর্যালোচনার মূল্য আছে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার উদয়ে বাংলা দেশে যে নবজাগরণ হল কয়েকজন মনীষী তার মূল তত্ত্বগুলি রচনা করে দিয়েছিলেন। সুসঙ্গত দার্শনিক তত্ত্ব দিয়েছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের স্নেহের পাত্র অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' বইতে (১৮৫২)। অক্ষয়কুমার পাশ্চাত্য জ্ঞানের চর্চায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর বই পরিবর্তিত মূল্যমানে ব্যবহারিক জীবনদর্শন রচনায় এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এ যুগের প্রথম তত্ত্বভাষ্যরূপে গণ্য। তার পরে বঙ্কিম-চন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক প্রবন্ধ প্রভৃতি যুগের চিন্তাধারাকে স্পষ্ট এবং অধিকতর যুক্তিবদ্ধ রূপ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছে। ঈশ্বর গুপ্তের মনীষা এঁদের মতো তীক্ষ্ণ ছিল না। কিন্তু তিনি যুগের আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠা এবং জগৎতত্ত্বকে বুঝবার নবজাগ্রত ব্যাকুলতাটিকে অনুভব করেছিলেন, তাঁর সময়ের পাঠকদের কাছে বেদান্তকেই নতুন করে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচীন পুথিগত আলোচনার ভঙ্গিতে নয় ; সম্পূর্ণ নিজস্ব রীতিতে জন্ম-মৃত্যু-অদৃষ্ট-কর্ম-ত্যাগ-ভোগের সনাতন প্রশ্নটিকে গদ্যে-পদ্যে একালের বিভ্রান্ত সমসাময়িকের কাছে নতুন মীমাংসায় পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থশেষে তিনি পুনঃপুনঃ অনুরোধ করেছেন ধৈর্য ধরে বইখানা পাঠ করতে ; তাঁর বিশ্বাস ছিল এর দার্শনিক আলোচনা সেকালের তরুণচিত্তের জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করবে। পারমার্থিক কবিতা-গুলি সেই আশাতেই রচিত।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার বিষয়-আলোচনা-প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্র যে-কয়টি ভাগ দেখিয়েছেন ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা কিন্তু তাতেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি সংস্কৃত নাটক 'শকুন্তলা'-র কাহিনী থেকে বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। বাংলা দেশের হরগৌরীকথাকেও তিনি নিজের ভাষায় রচনা করেছিলেন। বসুমতী-সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'সারদামঙ্গল'। তাছাড়া 'মানসমোহন' 'কাব্যকানন' প্রভৃতি

ভাগেও তাঁর অনেকগুলি বিভিন্ন বিষযেব ছোট ছোট কবিতা সংকলিত হয়েছে।

কাব্যশিল্প

ঈশ্বর গুপ্তের ভাষাকে বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি বাংলা বলে প্রশংসা কবেছেন। ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত উদাবপন্থী ছিলেন। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে 'বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার প্রকৃতি নিযে মতামত জ্ঞাপন করেছেন। সে-সব স্থলে সর্বত্রই বঙ্কিমচন্দ্র ভাষাকে সর্বজনবোধ্য শিষ্ট এবং সরল করবার আদর্শকেই বলেছেন উপযুক্ত আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের ভাষা প্রথম যুগের তুলনায শেষের যুগে অনেক সবল হয়ে গিযেছিল। কিন্তু তাঁর ভাষাতে কযেকটি স্তব আছে— লৌকিক সবল, সমাস ও সংস্কৃতশব্দ-প্রধান, কল্পনামূলক এবং স্পষ্ট একার্থক যুক্তিসর্বস্ব। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা গদ্য-রীতির আদর্শ তৈরি কবতে হযেছে, আধুনিক যুগোচিত চিন্তা ও কল্পনার উপযোগী করে বাংলাভাষাকে নির্মাণ কবতে হযেছে। যে বাংলা ভাষা তখন প্রচলিত ছিল তাকে আধুনিক নাগরিক সাহিত্যের উপযুক্ত করে তোলা হয়েছে দুই ভাবে। প্রথমত সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ধ্বনিবহুল স্নিগ্ধ গম্ভীর এবং ভাব-প্রকাশক্ষম শব্দ নতুন কবে বাংলা সাহিত্যে প্রবতন। বিদ্যাসাগর-তারাশংকরের অনুবাদমূলক সাহিত্যধর্মী বচনা এর পথ প্রস্তুত করেছিল। ভাষায মার্জিত শুচি শোভন স্পন্দনশীল ধ্বনিময শব্দ প্রবর্তন দ্বারা বাংলা ভাষার যেন জন্মান্তর ঘটানো হল। এর সঙ্গে কবিওয়ালার বা লৌকিক ভাষার মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রাকৃত বাংলার ইডিয়ম এই সাধু বাংলায় পবিমাণে যথেষ্ট কমে গেল। প্রাকৃত বাংলার হসন্তধ্বনিবাহুল্য মাত্রাগুণযুক্ত সাধুবাংলায় উপেক্ষিত হতে লাগল। ফলে নতুন বাংলা ভাষার চেহারাই যেন অনেকটা পরিবর্তিত হতে লাগল। রঙ্গলাল বিশেষত মধুসূদন বাংলা কাব্যে এই সাধু রীতির প্রচলনে সুদূর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মধুসূদনের ভাষার কাঠামো রচনা করেছিল বিদ্যাসাগবের গদ্য। তেমনি বাংলা প্রবন্ধ ও উপন্যাসের নতুন সাধু বাংলায় অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ভূদেব-বঙ্কিমের প্রথম দিকের রচনা ছিল আদর্শ।

বাংলা ভাষার নতুন সাধু বাংলায় রূপান্তরিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ ইংরেজি বাক্যগঠন এবং শব্দানুবাদের ফল। নতুন ইংরেজিশিক্ষিতগণই বাংলা সাহিত্য

লিখতে উদ্যোগী হয়েছেন। নতুন ধরনের বিদ্যা এবং ভাবনারীতির শিক্ষা পেয়ে তাঁরা বাংলা লিখতে আরম্ভ করেছেন। অক্ষয় দত্ত 'চারুপাঠ' এবং 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' বই দুটিতে যে তত্ত্ব বা জ্ঞানের বিষয় প্রচার করলেন, তা বিশেষভাবেই পাশ্চাত্যশিক্ষালব্ধ। ফলে বাংলায় বলতে গিয়ে অনেক সময়েই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইংরেজিগন্ধী ভাষারীতি প্রয়োগ করতে হয়েছে। অক্ষয় দত্ত রাজেন্দ্রলাল ভূদেব বঙ্কিম প্রভৃতি সকলেই ছিলেন ইংরেজিনবীশ— আধুনিক শিক্ষা এবং চিন্তায় অনুপ্রেরিত মনীষী।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই দৃষ্টান্তযোগে ইংরেজি এবং সংস্কৃত রীতির আধিপত্য দেখিয়ে দিয়েছেন।— 'একদিকে সংস্কৃতেব স্রোতে মরাগাঙ্গে উজান বহিতেছে— কত "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাডবিবাক মলিম্লুচ" গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না—আর একদিকে ইংরেজীর ভরাগাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিতেছে'— বঙ্কিমের এই মন্তব্য গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ।

ঈশ্বর গুপ্ত এই দুই প্রভাব থেকেই মুক্ত ছিলেন— এই কথা যখন আমরা বলি তখন প্রবোধপ্রভাকরের তত্ত্বপূর্ণ রচনাগুলি বাদ দিয়েই বলি। তবু এ-কথাও ঠিক, পরীক্ষা করলে দেখা যাবে প্রবোধপ্রভাকরের বাক্যগঠন এবং শব্দ ব্যবহারও সংস্কৃতানুগত নয়। এটা ঈশ্বর গুপ্তের অক্ষমতা বলে গণ্য করলেও সত্য। ঈশ্বর গুপ্তের মনোভঙ্গির যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাতে বুঝতে পারি তাঁর পক্ষে এই ভাষাই যথেষ্ট এবং স্বাভাবিক ছিল। সেই সব ব্যঙ্গ ও রসিকতা, কল্পনাবর্জিত গদ্যময় জীবনবর্ণনা কিংবা পারমার্থিক কবিতার বৈরাগ্য-মূলক চিন্তা—এ ধরনের বিষয়ের পক্ষে বাংলা ভাষার প্রচলিত রূপই ছিল তাঁর অনুকূল। ব্যঙ্গবিদ্রূপের জন্য সভ্য ভব্য ভাষার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত সঙ্কেতের চেয়ে তৎকাল প্রচলিত শ্লেষ-যমক এবং ধ্বন্যাত্মক খাঁটি বাংলা ভাষাই ছিল তার উপযুক্ত।

ঈশ্বর গুপ্তের এই খাঁটি বাংলার কথা নবজীবনের সমালোচক (সম্ভবত দেবেন্দ্রবিজয় বসু) বলেছেন[২২],

'বলিতে একটু দুঃখ হয়, একটু সঙ্কোচ হয়, কিন্তু কথাটা ঠিক— যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালার শেষ কবি। মধুসূদন বাঙ্গালাব মিলটন ; হেমচন্দ্র পিণ্ডার, নবীনচন্দ্র বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ শেলি ;— বেশ কথা— কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালার কি ? ঈশ্বর গুপ্ত— বাঙ্গালার ঈশ্বর গুপ্ত। ঐ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের নিন্দা ; ঐ কথায়

ঈশ্বর গুপ্তের প্রশংসা। তাঁহার কবিত্ব বাঙ্গালির নিজস্ব। সেটুকু দরিদ্রের ক্ষুদ্র মুদ্রা হইলেও তাহার নিজস্ব। আর নিজস্ব বলিয়াই তো বড় আদরের সামগ্রী।...

তবে মাছের ঝোলের স্থানে কাটলেটকে অধিকার করিতে দেখিলে সত্য সত্যই বড় দুঃখ হয়। দিন দিন কিন্তু তাহাই হইতে চলিল। বাঙ্গালির খাঁটি বাঙ্গালা পদ্য এখন আনাচে কানাচে আশ্রয় লইয়াছে। ইংরাজিগন্ধী, ইংরাজীছন্দী, তাহার উল ইংরাজি তাহার ফুল ইংরাজি— একরূপ পরস্ব পদ্য কেবল আসর জাঁকাইয়া পসার করিতেছে। দুঃখ হয় না? তোমাদের হয়ত হয় না; আমাদের কিন্তু হয়।

ঈশ্বর গুপ্ত বড় কবি নহেন। ক্ষুদ্র বাঙ্গালিজাতির মধ্যেও উচ্চতর কবিও নহেন, কিন্তু তিনি হয়ত শেষ কবি।'

ঈশ্বর গুপ্তের 'খাঁটি বাংলা' যে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব মনোগত ব্যাখ্যাও নয়, তার আরও প্রমাণ আছে। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বাংলা গদ্যের নির্মাণযুগেরই লেখক। তিনি বলেছেন,[২৩]

'প্রকৃত বাঙ্গলা ভাষার রীতিবিশুদ্ধ (idiomatic) রচনাবিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের যে প্রকার পারিপাট্য ছিল, তাহাতে দাশু রায়ের ততোধিক ক্ষমতা দেখা যায়।'

ঈশ্বর গুপ্তের স্টাইল হচ্ছে পদ্যে ব্যবহারিক জীবন বর্ণনার উপযোগী চলতি গ্রাম্য দেশি বিদেশি (রামপ্রসাদের মতো) শব্দ মিশিয়ে বাংলা বাগ্‌বিধিতে নির্ভর একটি জোরালো জীবন্ত ভাষার স্টাইল। এই রীতি তিনি সম্পাদকীয় গদ্যরচনাতেও অনুসরণ করে এসেছেন। তাঁর স্মরণীয় গদ্যরচনা কবিজীবনীরও এই রীতি। এই রীতিতে সংহতির অভাব আছে, গদ্যের যতিও যথাযথ নয়। রামপ্রসাদ তাঁর গানে যে ভাষারীতিকে ব্যবহার করেছিলেন, এই রীতি তারই অনুসরণ। ভারতচন্দ্রের ভাষাও খাঁটি দেশীয় প্রবাদপ্রবচনে পূর্ণ জোরালো ভাষা। কিন্তু তিনি ছিলেন সংস্কৃত-পড়া পণ্ডিত ভাষাশিল্পী। তাই ভাষায় শিল্পগুণ ও সাহিত্যিক মার্জনা দিয়ে এবং নাগরিকসুলভ তির্যক বাগ্‌বৈদগ্ধ্য নিয়ে এসে ভাষাকে শ্রীসৌষ্ঠব দান করেছিলেন। তাঁর পরিমাণ-বোধ ছিল অসাধারণ। সে-ভাষা পরিমিত বাগ্‌বিন্যাসে স্বল্পাক্ষরতায় সুচিন্তিত শব্দব্যবহারে শাণিত ও উজ্জ্বল। রামপ্রসাদের গানের ভাষা সেই তুলনায় জনমানসের অশিক্ষিত মনের আবেগোৎসারিত ভাষা।

ঈশ্বর গুপ্তের ভাষার মধ্যে রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের দুটি লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে দেখি। একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার। এ বস্তু যে বাঙালির নিজস্ব ভাষা-

প্রকৃতির বিশিষ্ট লক্ষণ তাতে সন্দেহ নেই। ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ-ঈশ্বরগুপ্ত তিন-জনের রচনাতেই এর প্রচুর ব্যবহার পাওয়া যায়। দ্বিতীয় লক্ষণ খাঁটি বাংলা বাক্‌রীতির ব্যবহার। বাক্‌রীতি সাধু আধুনিক বাংলাতেও আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যায়, এর ব্যবহার অনেক কমে গিয়ে বিদ্যালয়পাঠ্য ব্যাকরণ বইতে দৃষ্টান্ত হিসাবে আশ্রয় পেয়েছে। উনিশ শতকের গ্রাম্যতা বর্জনের সভ্য মার্জিত প্রবৃত্তি ছিল এর প্রধান কারণ। ঈশ্বর গুপ্ত সব রকম কবিতাতেই ইডিয়মের ব্যবহার করেছেন। যেমনা পারমার্থিক বিষয়ে—

ক. সে ত আর ঘোল খেযে গোল নাহি করে

—নিবেদন

খ. জলে নাহি তেল মিশে

—কিছু কিছু নয়

গ. গৌরব করিয়া কত গোঁফে দাও পাক

—সব হ্যায় ফাঁক

ঘ. এককানে কথাগুলি প্রবেশ করিয়া।
বাহির হইয়া গেল আর কান দিয়া॥

—পিতা ও পুত্র

ঙ লক্ষ্মীছাড়া হও যদি খেয়ে আর দিযে।

—হিতমালা

ঋতুবিষয়ে—

ক. খেয়েছ কানের মাথা নীরদ নিদয়

—গ্রীষ্ম

খ. ঘাডে আর নাহি লয মদনের ঝুঁকি

—গ্রীষ্ম

গ. হাওয়া খেতে সদা হয় মন

—বসন্তবর্ণন

সামাজিক ও ব্যঙ্গবিষযক কবিতায় যে থাকবে তাতো খুবই স্বাভাবিক—

ক. ছোঁডা বড ঠ্যাটা

—পৌষ পার্বণ

খ দুই চক্ষু রেঙ্গে

গ. তোমার কি ঘরপানে কিছু নাই টান

—ঐ

ঘ. জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী

—পাটা

ঙ. আগে পাছে পাকাপাকি।
আঁকা আঁকি তাকাতাকি॥

—স্নানযাত্রা

নমুনাস্বরূপ সামান্যই কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র দিলাম। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যকল্পনা নিরবয়ব অনুভূতিসর্বস্ব ছিল না বলে মুখের ভাষাকে নির্বিচারে নিতে তাঁর দ্বিধা হয়নি। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা তাঁকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করে নি। ঈশ্বর গুপ্ত মূলত ঘরোয়া বাঙালির চলতি ভাসাকেই কবিতায় এবং গদ্যে আদর্শ রূপে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিগন্ধী শব্দের যে উদাহরণ দিয়েছেন, সেগুলির ধ্বনিই যেন আমাদের কানে অপরিচিত ঠেকে। আসলে বাংলা ভাষার হসন্ত প্রকৃতি এবং ক্রিয়াপদের স্বল্পতার জন্য বাংলা ভাষা সংস্কৃত বা ইংরেজির থেকে আলাদা। রামপ্রসাদ প্রচুর বাংলা ইডিয়ম ব্যবহার করেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত তত না করলেও প্রচুর পরিমাণেই করেছেন। সেকালে একদিকে সাহেবী বাংলা আর একদিকে সংস্কৃত বাংলার মাঝখানে ঈশ্বর গুপ্তের বাংলার উপযোগিতা হয়তো অনেকের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের শ্লেষযমকের আতিশয্য বাদ দিয়ে এবং যতিস্থানগুলি নিয়মিত করে নিয়ে, কিঞ্চিৎ শব্দ-নির্বাচনে সতর্ক হলে উপন্যাসের চমৎকার গদ্যভাষা গড়ে উঠতে পারত। বস্তুত আলালের ঘরে দুলাল এই সরল বাংলাতেই লেখা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় রঙ্গলাল হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত কবিরা কেউ ঈশ্বর গুপ্তের ভাষাকে গ্রহণ করেন নি। পদ্যে বিহারীলাল এবং গদ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায়[২৪] ঈশ্বর গুপ্তের ভাষার ছাপ আছে।

রামপ্রসাদের কাছে ঈশ্বর গুপ্তের ঋণ শুধু ধর্মচিন্তায় এবং ভাষায় নয়—কাব্যের রীতিতেও।[২৫] রামপ্রসাদের মতোই ঈশ্বর গুপ্ত অতি সাধারণ জীবন থেকেই উপমা সংগ্রহ করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের উপমা-অলংকার পরিমাণে কম। যেটুকু এসেছে, তা অতি অনায়াসসিদ্ধ এবং মৌখিক ভাবেই। অনেক সময় সাধারণভাবে কথা বলতে বলতে রসিক ব্যক্তিদের সংলাপে অতি সহজে যেমন চমকপ্রদ উপমা এসে যায় ঈশ্বর গুপ্তের উপমাও তেমনি। এ ধরনের উপমা

কল্পনামূলক বা সাজানো হয় না। প্রতিদিনের চোখে-দেখা অভিজ্ঞতা থেকেই তুলনাত্মক শব্দগুলি যথাস্থানে মুখের কথায় স্থান করে নেয়। এর দৃষ্টান্ত সামাজিক কবিতায় সহজলভ্য। তপসে মাছকে তপস্বীর সঙ্গে তুলনা, আনারসকে টিয়ে পাখির সঙ্গে তুলনা ইত্যাদি সুপরিচিত। পারমার্থিক কবিতায় দেহকে ঘরের সঙ্গে সংসারকে রঙ্গমঞ্চ যাঁতা অথবা সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা-ও এই ভাবেই এসেছে। কখনও কখনও কাব্য যে হয় নি তা নয়—

শ্যামল তৃণের পরে নীহার বিহার করে
সাটিনে চুমকি যেন সাজে।
ঈষৎ অরুণ-কর বিরাজে তাহার পর
গাঁথা যেন সোনালীর কাজে॥

—বসন্তবর্ণন (১৮৫২)

কিংবা

তড়িত প্রদীপশিখা করিয়া ধারণ।
কোণে কোণে গ্রীষ্মের করে অন্বেষণ॥

—বর্ষার রাজ্যাভিষেক

উপমা-প্রয়োগ করে ঈশ্বর গুপ্ত হাস্যরসের সৃষ্টি করে থাকেন যেমন শ্লেষ-যমক দিয়েও করেন। শ্লেষ-যমকে হাস্যরস সৃষ্টির আদর্শ তিনি পেয়েছিলেন কবিওয়ালাদের কাছে। অনভিজাত সাধারণ উপমাসংগ্রহের আদর্শ ছিলেন রাম-প্রসাদ যদিও রামপ্রসাদ ভক্তিমূলক অনুভূতির গাঢ়তা সৃষ্টিতেই এর ব্যবহার করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত করেছেন ক্ষণস্থায়ী চমক ও উপভোগ্যতা সৃষ্টির কাজে।

রামপ্রসাদের থেকে তিনি আরো একটি উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। অধ্যাত্মবিষয়ক আত্মগত ভাবণের ভঙ্গি—নিজের মনকে সম্বোধন করে উপদেশ। রামপ্রসাদের

মন, তুমি কৃষি কাজ জান না

ঈশ্বর গুপ্তের

জ্ঞানহীন পশু সম হয়ে তুমি মন।
মতিভ্রমে বনে আসি করিছ ভ্রমণ॥

—নিবৃত্তি আশ্রয়

অনেক কবিতাতে 'মন' কথাটা হয়তো নেই কিন্তু উদ্দিষ্ট মনই।

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যশিল্পের আর একটি বিশেষ আলোচ্য ছন্দ। সাধারণভাবে

ঈশ্বর গুপ্তকে পুরনো যুগের ছন্দের আদর্শে পয়ার ও ত্রিপদী-রচয়িতা বলেই জানি। এর মধ্যে থেকেও তিনি যে কতখানি অভিনবত্ব দেখিয়ে গিয়েছেন, সে-বিষয়ে ছান্দসিক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।[২৬] কৌতূহলী পাঠক সেগুলি দেখে নেবেন। বর্তমান আলোচনায় সংক্ষেপে মূল সূত্রগুলির ইঙ্গিত মাত্র দেওয়া যাচ্ছে।

বাংলায় তিনটি প্রধান ছন্দ প্রচলিত, মিশ্রকলামাত্রিক বা অক্ষরবৃত্ত, সরল-কলামাত্রিক বা মাত্রাবৃত্ত এবং দলমাত্রিক বা স্বরবৃত্ত। এগুলির প্রকৃতিবিচার বা উদ্‌ভবের ইতিহাস আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয়। মিশ্রকলামাত্রিক ছন্দ মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সর্বাধিক প্রচলিত। মঙ্গলকাব্য, চরিতকাব্য, অনুবাদ ও গাথাকাব্য সবই এই ছন্দে রচিত। এই ছন্দের দুটি বন্ধই বিশেষভাবে চলে। আট মাত্রা এবং ছয় মাত্রার দুটি পদ নিয়ে পয়ারবন্ধ গঠিত। পয়ারের এই গঠনরীতিই সর্বজনমান্য রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ 'আট-ছয় আট-ছয় পয়ারের ছাঁদ কয়'—এই শ্লোকে পয়ারবন্ধের সুস্পষ্ট প্রকৃতি নির্দিষ্ট করে বলেছেন। কিন্তু দেখা যায় ভারতচন্দ্রের আগে এই রীতি সর্বত্র সমান পালিত হয় নি। সাত-সাত বা ছয়-আটও সেকালে চলতি ছিল। বলা যায় যে ভারতচন্দ্র অক্ষর গণনার রীতির ওপর ছন্দকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আট-ছয় মেনে পয়ার রচনার পদ্ধতি প্রবর্তিত করেন। তখন থেকেই এই দ্বিপদী বন্ধটি এই মাত্রা-পরিমাণেই মোটামুটি লিখিত হয়ে আসছে। ত্রিপদী সম্বন্ধে বলা যায় ছয়-ছয়-আটই হচ্ছে তার বিশিষ্ট গঠন।

মধ্যযুগে বাংলা কাব্য ছিল গেয়। গানের সুরে বাংলা ছন্দের অনেক ত্রুটি ঢাকা পড়ে যেত। কোথায় মাত্রা কম বা বেশি হলে সুরে সেই ত্রুটি সেরে নেওয়া যায়। সুরের জন্য বাংলা ছন্দের চেহারা অনেকটা ঢাকা পড়ে যেত, এমন কি বাংলা-উচ্চারণপ্রকৃতি এবং বচনভঙ্গিটিও যথাযথ হতে পারত না। ভারতচন্দ্রের কাব্যের ভাষায় বচনভঙ্গি ও ছন্দকে সহজ এবং স্বাভাবিক হতে দেখে মনে হয় তখন থেকেই বাংলা কাব্যে সুরের আধিপত্য কমতে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের ছন্দ যত মুক্ত এমন আর কারও নয়। তাঁর ছন্দ কথ্যভঙ্গিতে সমৃদ্ধ, একেবারে সাধারণ গদ্যভাষার মতো প্রস্বরপূর্ণ। তিনি মিশ্রকলা-মাত্রিক ছন্দে আট-ছয়ের মধ্যেও নানা ছোটো আয়তনের পর্বের সৃষ্টি করলেন। বিশেষত এই ছন্দের দুয়ের ক্ষুদ্রতম এককগুলিকে তিনি স্পষ্ট করে তুললেন।

লোভ নাহি থেমে থাকে খাই তাই চোটে।
পিটে পুলি পেটে যেন ছিটেগুলি ফোটে ॥

এই দুয়ের এককগুলি ছিটেগুলির মতোই অজস্র ধারায় উৎসারিত। পূর্বে এই ছোটো ভাগগুলি থাকত অদৃশ্য। সর্বত্রই তিনি যে দুই মাত্রার শব্দ ধরেই পংক্তি রচনা করেছেন তা নয়, হয় তো বৃহত্তর ভাগও আছে। কিন্তু এই ছোটো ভাগের জন্য ছন্দ হয়েছে প্রস্বরিত। এই স্বরহীন কথ্যউচ্চারণরীতির পয়ারই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সম্ভাবনা মেলে ধরেছিল।

মিশ্রকলামাত্রিক ছন্দে আট-ছয়ের পদভাগ প্রধানত ব্যবহৃত হলেও পাঁচের পদভাগ এবং সাতের পদভাগ দিয়েও ঈশ্বর গুপ্ত অভিনব ছন্দোবদ্ধ রচনা করেছেন—

তোমার কার্য নহে নিবার্য।
পাইবে ধার্য শিখের রাজ্য।
না হয় ভঙ্গ রণতরঙ্গ।
শোণিত রঙ্গ শোভিত অঙ্গ।[২৭]

—ফিরোজপুরে যুদ্ধজয়

এর প্রতি পদে মিল থাকায় ছন্দে অভিনবত্ব এসেছে। কবিতাসংগ্রহে এর নাম চপলাবলী ছন্দ।

হয়ে প্রমত্ত ভ্রমমদে ভ্রমিয়া পদে পদে
চারিদিকে দেখিতেছ ধ্বান্ত।
দেহ পতন নাহি হবে রতন সম রবে
মনে বুঝি জেনেছি নিতান্ত ॥

—বোধেন্দুবিকাশ, ১ম অঙ্ক

এর পদগঠন ২ – ৭ + ৭ + ১০। এটা বস্তুত ত্রিপদী বন্ধ। ঈশ্বর গুপ্ত দ্বিপদী ত্রিপদী ও চৌপদীতে নানা রকম মিল এবং পদ সাজিয়ে অনেক নতুন ছন্দোবন্ধের নাম দিয়েছিলেন। বোধেন্দুবিকাশ নাটকে এই কয়টি পাচ্ছি, প্রকৃতি মোহিনী উন্মাদিনী রণরঙ্গিনী বীরবিলাসিনী (সারদামঙ্গল কাব্যে 'উমাপ্রসঙ্গে গিরিরাজের প্রতি মেনকার খেদোক্তি' এই ছন্দে) তরঙ্গলহরী পঞ্চাল মালতীলতা চপলা-মালা চপলাগতি আমোদিনী সেফালিকা শাসক ষষ্ঠপদী বিনোদিনী গৌরবিনী[২৮] বিষাদিনী রঙ্গিণী চৌপদী আদরিণী স্বরতরঙ্গিণী প্রমাণিকা সেচ্ছা লঘুগতি সমানিকা। বোধেন্দুবিকাশ ছাড়া প্রভাকরে প্রকাশিত কবিতায়

আরো কতকগুলি ছন্দের নাম পাওয়া যায়, যেমন বিশ্ববিমোহিনী রসলতিকা মুরলী চিত্ররেখা চৌপদী মাধবীলতা চম্পকলতিকা নবগ্রহ চম্পক মধুপয়ার, সুধাতরঙ্গিণী অমৃতলহরী কুঞ্জলতিকা লবঙ্গলতা রঙ্গবিলাস। এই বিভিন্ন ছন্দোবন্ধের গঠন নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার অবকাশ আছে।

বাংলা ছন্দের ইতিহাসে ভারতচন্দ্র থেকে রঙ্গলাল পর্যন্ত সময়টির গুরুত্ব আছে। ভারতচন্দ্র বাংলা ছন্দের প্রচুর নতুনত্ব নিয়ে আসেন। তিনি যে কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দকেই বাংলায় আনবার চেষ্টা করেছিলেন তা নয়। খাঁটি বাংলা মিশ্রকলামাত্রার ছন্দেও নানা পদগঠন ও মিলের কৌশল দেখিয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের মতো এইসব ছন্দোবন্ধের নামকরণ করেন নি। ইচ্ছা করলে অথবা প্রথা থাকলেই করতে পারতেন।[২৯]

ঈশ্বর গুপ্ত ছন্দোবন্ধের রচনাপ্রয়াসে আর-একজন কবির কাছে অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকবেন, তিনিও ভারতচন্দ্রের মতো উত্তম সংস্কৃত-পড়া কবি। মদনমোহন তর্কালংকার (১৮১৭—১৮৫৮) রসতরঙ্গিণী নামে ১৮৩৪-এ একটি কাব্যগ্রন্থ লেখেন। তাঁর দ্বিতীয় কাব্য বাসবদত্তা প্রকাশিত হয় ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই দুই কাব্যেই দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদীর নানা গঠন ও মিলবিন্যাসের দৃষ্টান্ত আছে।

ছন্দ রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বসূরী ছিলেন বস্তুত তিনজন, ভারতচন্দ্র কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, মদনমোহন তর্কালংকার। রামপ্রসাদের কাছে ঈশ্বর গুপ্তের ছন্দ রচনার ঋণ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[৩০] লালমোহন বিদ্যানিধি 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থে (১৮৬২) বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বিস্তৃত পরিচ্ছেদ যোজনা করেন। তাতে বাংলা ছন্দের (মিশ্র কলামাত্রিকই তখন বিশেষ প্রচলিত, সেই সঙ্গে কিছু সংস্কৃত রীতির ছন্দ) গঠনের কয়েকটি মূল নীতি সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের পরিভাষায় বর্ণনা করেন। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ববর্তীদের মধ্যে ভারতচন্দ্র কবিরঞ্জন ও মদনমোহনই বিশেষভাবে ছন্দপ্রসঙ্গে লক্ষণীয়।[৩১] ঈশ্বর গুপ্তকৃত বিভিন্ন ছন্দোবন্ধের আলোচনা অবশ্য তিনি করেন নি। এই সব কবিদের ধারায় এসে রঙ্গলালও ছন্দের বিভিন্ন আকৃতি নির্ণয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

বাংলা ছন্দের অন্য দুটি রীতি, দলমাত্রিক এবং সরল কলামাত্রিক। এই দুটি ছন্দে ঈশ্বর গুপ্তের কৃতিত্ব বিচার খুবই কৌতূহলোদ্দীপক হবে। ঈশ্বর গুপ্ত-প্রবর্তিত মিশ্র কলাবৃত্তের বিভিন্ন বন্ধ যেমন পরবর্তী সাহিত্যে অনুকৃত হতে দেখা

যায় না, দলমাত্রিক এবং সরল কলামাত্রিকও তেমনি রবীন্দ্রনাথের পূর্বে প্রচলিত দেখা যায় না। লোচনদাসের ধামালীর পর ও লৌকিক ছড়া ইত্যাদি ছাড়া রামপ্রসাদের গানে দলমাত্রিকের খুব বেশি ব্যবহার দেখা যায়, সেজন্য একে রামপ্রসাদী ছন্দ বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে।[৩২] কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত ছাড়া উনিশ শতকের সাহিত্যিকেরা এ ছন্দ বিশেষ কেউ ব্যবহার করেন নি।[৩৩] রবীন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'সিন্ধুদূত' কাব্যের সমালোচনায় লিখেছিলেন[৩৪]—

'উপরে দেখাইলাম বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ কী? আর যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয়, তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা (১৯০০) কাব্যের আগে এই ছন্দটিকে গুরু কবিতায় প্রয়োগ করা হয় নি। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে এ ছন্দ নেই, কিন্তু গানে সুপ্রচুর। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য পরীক্ষা করলেও দেখা যায় তিনিও গানেই এর ব্যবহার করেছেন। তাঁর গানগুলির ভাষা ও ভঙ্গি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তারা চার রকমের।

ক. ধাঁধা বা ছড়াজাতীয়,

দিনদুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাত-পোহানো ভার

খ. হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গ,

ও কথা আর বলো না, আর বোলো না
বলছ বধূ কিসের ঝোঁকে?

এবং

লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল।
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া চড়বে ঘোড়া
ঠাঠ ঠমকে চালাক চতুর
সভ্য হবে থোড়া থোড়া।

গ. কবির সুরে

হলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তা ঘটে সর্বনাশ
কালসাপ কি কোন কালে দয়াতে ভেকে পালে
টপাটপ অমনি করে গ্রাস।
বাঙালী তোমার কেনা এ কথা জানে কে না
হয়েছি চিরকেলে দাস
করি শুভ অভিলাষ।

ঘ. আধ্যাত্মিক

ওরে ভিখারি! এই কিরে তোর প্রসঙ্গ
তোর ধর্মকথায় মর্মব্যথায়
কর্মদোষের আসঙ্গ ॥
এই কিরে তোব প্রসঙ্গ।
দেখ যুক্তিমতে এ জগতে
স্বভাবে সব উলঙ্গ।

ঈশ্বর গুপ্তের লেখা রামপ্রসাদী ছন্দের প্রাচীনতম রচনা যা পাওয়া যায় সম্ভবত তা এই গানটিতে[৩৫]—

আর কবে ভাই মানুষ হবে
মানুষ্ হবে, মানুষ্ হবে, আর কবে ভাই মানুষ্ হবে
দেখে তোর্ আকার্ প্রকার্ আচার বিচার
মানুষ্ কবে মানুষ্ কবে।

সংবাদপ্রভাকরে (১২৬০, ৩ কার্তিক) নয় পৃষ্ঠাব্যাপী 'মনুষ্য' নামে একটি গদ্য প্রবন্ধের অন্তর্গত এই গানটি। লক্ষ্য করবার বিষয় এর রুদ্ধ দলগুলিতে হস্ চিহ্ন দিয়ে উচ্চারণসংশ্লেষ বিশেষভাবেই বোঝানো হয়েছে।

পরবর্তী কালে ঈশ্বর গুপ্তের দলমাত্রিক ছন্দ বাংলাভাষায় একটি সুদূর প্রভাব বিস্তারিত করেছিল বলে সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রসম্পাদিত কবিতাসংগ্রহে 'নীলকর' বিষয়ে পাঁচটি গীত এবং 'দুর্ভিক্ষ' বিষয়ে দুটি গীত আছে। সবগুলিই রামপ্রসাদী দলমাত্রিক ছন্দে লেখা। কবিতাসংগ্রহ প্রকাশিত হওয়ার দুই বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুদূত'-সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই রামপ্রসাদী ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মেছে দেখা যায়। কবিতাসংগ্রহে সংকলিত ঈশ্বর গুপ্তের নীলকর এবং দুর্ভিক্ষ কবিতার চল্‌তি ভাবা রবীন্দ্রনাথের ভাষাচেতনাকে দীর্ঘকাল অধিকার করেছিল। ছন্দের প্রকৃতি (১৩৪১) প্রবন্ধে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের 'তুমি মা কল্পতরু' পদ্যাংশটি তুলে চলতি ভাবার জোর দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে মেঘনাদবধের আরম্ভের কয়েকটা লাইন চল্‌তি বাংলায় রূপান্তরিত করে দেখিয়েছেন। প্রাকৃত বাংলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য ঈশ্বর গুপ্তের রচনা দিয়ে সমর্থন করেছেন দেখা যায় যদিও ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য ও রুচি সম্বন্ধে তিনি উঁচু ধারণা পোষণ করতেন না।[৩৬]

বোধেন্দুবিকাশে ঈশ্বর গুপ্ত 'ও কথা আর বলো না আর বলো না' এই গীতটির নাম দিয়েছেন প্রকৃতিচ্ছন্দ অর্থাৎ প্রাকৃত বা লৌকিক ছন্দ।

সংস্কৃত উচ্চারণরীতির অনুসরণ করে বাংলায় এক ধরনের মাত্রবৃত্ত বৈষ্ণব পদাবলীতে ও ভারতচন্দ্রে দেখতে পাওয়া যায়। রামপ্রসাদও এই ছন্দে কবিতা লিখেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের এই ছন্দে লেখা একটি স্তোত্রকবিতা বোধেন্দুবিকাশে আছে—

তুষ্টি নিকেতন রিষ্টি বিনাশক
স্বষ্টি-পালন-লয়কারি
নিন্দিত রজত শ্বেত কলেবর
ভস্মভূষণ জটাধারি ॥

—তৃতীয় অঙ্ক

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের শব্দপ্রীতির উদাহরণ দেবার জন্য দুটি কবিতা উদধৃত করেছেন, 'কে রে বামা বারিদবরণী' (পৃ ৪১-৪২) এবং 'কে রে বামা ষোড়শী রূপসী' (পৃ ৪২)।[৩৭] কবিতা দুটি শব্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যাই হক, বাংলা সরল-কলামাত্রিকের ছয় কলামাত্রার দৃষ্টান্ত হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছয় কলা মাত্রার সরলকলাবৃত্ত ছন্দ রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলায় ছিল না। রামপ্রসাদে ছিল কিন্তু তাতে স্থানে স্থানে সংস্কৃত রীতির উচ্চারণ অবলম্বিত। জয়দেবী সংস্কৃত উচ্চারণরীতিতে ছয় কলামাত্রার ছন্দ ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বে ছিল না। ঈশ্বর গুপ্ত যে সচেতনভাবে এর ব্যবহার করেছেন তাও বলা যায় না। ওই দুটি কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত সংস্কৃত উচ্চারণ-প্রভাব থেকে মুক্ত নন।

কে- রে- বা- মা বারিদবরণী
তরুণী ভা- লে ধরেছে তরণি
কাহার ঘরণী আসিয়ে ধরণী
করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূ-প কি অপরূ-প
অনুপ রূ- প নাহি স্বরূ- প
মদননিধন করণকারণ
-চরণ শরণ লয়।

এই কবিতার ছন্দের ত্রুটি এই যে পরবর্তী স্তবকগুলিতে কিছু মিশ্রকলামাত্রার মিশ্রণ হয়েছে। সেগুলি উদধৃতি চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করা গেল—

বামা হাসিছে ভাষিছে লাজ না বাসিছে
'হুহুঙ্কার' রবে সকল শাসিছে
নিকটে আসিছে 'বিপক্ষ' নাশিছে
গ্রাসিছে বারণ হয়।
বামা টলিছে ঢলিছে 'লাবণ্য' গলিছে
সঘনে বলিছে গগনে চলিছে
কোপেতে জ্বলিছে দনুজ দলিছে
ছলিছে ভুবনময়।
কে রে ললিতরসনা, বিকটদশনা
করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা
হয়ে শবাসনা বামা বিবসনা
আসবে মগনা রয়।

দ্বিতীয় কবিতাটিতে এ রকম ত্রুটি আর নেই। ছান্দসিকের মতে 'এই অপূর্ব নৈপুণ্যের জন্য এই দ্বিতীয় গীতটি বাংলা ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য'।[৩৮] রবীন্দ্রকাব্যে ছযমাত্রাব সরলকলাবৃত্ত ছন্দ প্রচুর, বস্তুত একে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় ছন্দ বলা যায। অথচ এক ঈশ্বর গুপ্তের এই রচনাটি ছাড়া বাংলা ছন্দরীতিতে এর কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রেব 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' প্রবন্ধটিতে উদ্ধৃত এই গীত দুটি ছন্দ-জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ নিশ্চয়ই আকর্ষণ করেছিল, অনুমান করতে বাধা নেই।[৩৯]

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, মিশ্রকলামাত্রিকে ছয কলামাত্রার পদভাগ পয়ারে প্রচলিত থাকলেও নিয়মিত পর্বরীতি হিসাবে সেটা সুষ্ঠু হয না। হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবিরা 'ভারতসঙ্গীত' প্রভৃতি কবিতা ছয় মাত্রার পর্ববিন্যাসে সাজিয়েছেন অথচ রুদ্ধদলগুলি মিশ্রকলামাত্রাব রীতিতেই ব্যবহার করেছেন। এতে ছন্দ পীড়িত হয়।[৪০] ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় তার নিদর্শন আছে—

ননী সর ক্ষীর 'মিষ্টান্ন' সকল
মধুর রসাল নানাবিধ ফল

'সুগন্ধি' 'তাম্বুল' সুশীতল জল
আনিয়ে দিতেছে উমা মায়।

—অথ কৈলাস পর্বত হইতে হিমালয়ে হরপার্বতীর শুভাগমন (বসুমতী সং পৃ ২৭৫)

বোধেন্দুবিকাশ নাটকখানা ছন্দের দিক দিয়ে বিশেষভাবে পাঠ ও অনুসন্ধান করবার মতো বই। বহু বিচিত্র ছন্দোবন্ধের ও ছন্দোরীতির দৃষ্টান্ত এতে আছে। এই নাটকের অনেকগুলি রচনাই সংবাদপ্রভাকরে বিচ্ছিন্নভাবে বেরিয়েছিল। পরে কবি এদের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ-সূত্রে বোধেন্দুবিকাশ নাটকে গেঁথে দিয়েছেন। ফলে এই নাটকটি ঈশ্বর গুপ্তের ছন্দসাধনার সংহত রূপে পরিণত হয়েছে বলা চলে। ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর যে কত কৌতূহল ছিল, একটু পরীক্ষা করলেই তার আভাস পাওয়া যায়; কৃত্তিবাসী জয়দেবী রামপ্রসাদী তিনরকম ছন্দ নিয়েই নানা পরীক্ষা করেছেন এতে। সম্ভবত মূল সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরণের চেষ্টা করেন নি ভারতচন্দ্র যেমন করেছেন। তথাপি এতে পজ্ঝটিকা এবং তোটক ছন্দে রচিত সংস্কৃত শ্লোকও তিনি ব্যবহার করেছেন। আর রচনা করেছেন একটি হিন্দী দোঁহা। তুলসীদাস সম্বন্ধে কবির বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর রামায়ণ আলোচনাও সংবাদপ্রভাকরে তিনি আরম্ভ করেছিলেন। ২৪ নভেমবর ১৮৫২-র সংবাদপ্রভাকরে তুলসীদাসের আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দি ছন্দ নিয়েও কিছু আলোচনা করেন—

'হিন্দি ভাষায় বহুবিধ ছন্দঃ চলিত আছে, কিন্তু তুলসীদাস রামায়ণে কেবল চারিপ্রকার ছন্দঃ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা দোহা, চৌপাই সোরঠা এবং ছন্দঃ দোহার অর্থ যাহাতে দুই পদ আছে, সংস্কৃত ভাষার অনুষ্টুপ এবং বাঙ্গালা ভাষার পয়ার যেরূপ প্রসিদ্ধ ছন্দঃ হিন্দী ভাষাতে দোহা সেই প্রকার, কিন্তু রামায়ণে দোহা অপেক্ষা চৌপাই অধিক দেখিতে পাই, সোরঠা দ্বিবিধ এবং ছন্দঃ নামক ছন্দঃ দুই তিন প্রকার হইবে তন্মধ্যে নিম্নে লিখিত ছন্দঃ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

জয় প্রগট্ট কৃপালা দীন দয়ালা
কৌশল্যা হিতকারী
হর্ষিত্ত ভবতারি, মুনি মনোহারী
অদ্ভুতরূপ বিচারী॥

লোচন অভিরামা তনুঘনশ্যামা
নিজ আয়ুধ ভজচারী
ভূষণ বনমালা নয়ন বিশালা
শোভা সিন্ধু খরারি ॥'

ঈশ্বর গুপ্তের স্বরচিত দোঁহার ('দোঁহা') দৃষ্টান্ত—

তীরথ্ বরৎ ছোড় দেও, দেও-পাতর পূজ মৎ।
ধরম্ করম্ ভরম্ ছোড়ো ছোড়ো শাস্ত্র মৎ ॥
যেত্তা ব্রাহ্মণ্ দুনিয়ামে, সব বড়া বজ্জাৎ।
গল্‌মে ডোরি, পেটমে ছোরি, মউমে ঝুটা বাত ॥[৪১]

—বোধেন্দুবিকাশ, ২ অঙ্ক

ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ দুজনেই বিদ্যাসুন্দর কাব্যে দুটি করে দোঁহা রচনা করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত সেখান থেকেই নিশ্চয়ই অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকবেন।

প্রাচীন কবিতা থেকে আধুনিক কবিতার বহিরঙ্গ পার্থক্যের একটি বড়ো লক্ষণ আধুনিক কবিতার পদবন্ধ বা স্তবক। প্রাচীন কবিতায় পদবন্ধ ছিল না। পদবন্ধ আধুনিক কবিতায় ভাবগুচ্ছের নিটোল অভিব্যক্তি বলেই ভাবময়তার প্রসার ও অনুভব-তীক্ষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে পদবন্ধেরও বৈচিত্র্য ও নৈপুণ্য দেখা দিয়েছে। 'ত্রিপদী বা চৌপদীর পদবন্ধনকেও stanza নাম দেওয়া যাইবে—যদি তাহাতে stanzaর লক্ষণ থাকে। সে লক্ষণ দুইটি—প্রথম, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র পদসমষ্টি হওয়া চাই; দ্বিতীয়, তাহাদের গঠনে ছন্দ ও মিলের একটি বিশেষ গ্রন্থিবন্ধন চাই—কেবল ছন্দ বজায় থাকিলেই চলিবে না, পংক্তিবিন্যাসের কৌশলে সমগ্রভাবে একটি ছন্দসঙ্গীত সৃষ্টি হওয়া চাই। কবিতার মধ্যেই এই যে পৃথক ছন্দভাগ ইহাতে কবিতার অখণ্ডতা নষ্ট হয় না—একটি মূল ভাবকে জোর করিয়া তাহাতে যে একটি বিশেষ প্যাটার্নের ছন্দগ্রন্থি দিয়া মালা গাঁথা হয়, সেই ছন্দগ্রন্থিই stanza। প্রাচীন বাংলা পদ্যে এইরূপ গ্রন্থি ছিল না, সে যেন এক এক ছন্দের সমান গাঁথা এক এক গাছি মালা—তাহাতে ছন্দের একটা নিরবচ্ছিন্ন স্রোতই আছে। অতএব এই stanza আমাদের কবিতায় সম্পূর্ণ নূতন।'[৪২]

পদবন্ধ বাংলায় ইংরেজি সাহিত্য থেকে এসেছে। এ বিষয়ে সংবাদপ্রভাকরই সহায়তা করেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই তরুণ কবিযশঃপ্রার্থীদের আমন্ত্রণ করতেন ইংরেজি থেকে বাংলায় কবিতা অনুবাদ করতে। সেই অনুবাদের সূত্রেই বাংলায়

পদবন্ধ প্রচলিত হল।[৬৩] ঈশ্বর গুপ্ত নিজেও এরকম অনুবাদ করেছেন। মোহিতলাল ঈশ্বর গুপ্তকে প্রথম বাংলা পদবন্ধ রচনার গৌরব দিয়েছেন—

দেহ হয় ক্ষীণ ক্রমে দেহ হয় ক্ষীণ।
কালের অধীন তুমি কালের অধীন॥
ভবে আব রবে কত কাল যত হয় গত,
নিকট হতেছে তত মরণের দিন।
কালের অধীন তুমি কালের অধীন॥

—তত্ত্ববোধ

ঈশ্বর গুপ্তের পদবন্ধ সম্পর্কে বিশেষ কৃতিত্ব নেই। তিনি পুরনো পয়ার-ত্রিপদীকেই একটু সাজিয়ে দিয়েছেন মাত্র। উপরে উদ্‌ধৃত কক খখ কক এই মিল-বন্ধনের রীতি তিনি পুনরাবর্তন করেছেন। কবিতার পদগুলিকে নানাভাবে সাজিয়ে নানা নাম দিয়েছেন সত্য, কিন্তু আধুনিক অর্থে তাতে পদবন্ধের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে এ কথা বলা কঠিন। দলমাত্রিক ছন্দে লেখা কবিতায় কখনো কখনো পদবন্ধের লক্ষণ দেখা গিয়েছে, তবে সেগুলি খুব সম্ভবত বাংলা গান থেকেই এসেছে

ঘরে হাড়ি ঠনঠনাস্তি
মশা মাছি ভনভনাস্তি
শীতে শরীর কনকনাস্তি
একটু কাপড় নাইক পিঠে।
দারা পুত্র হন্‌হনাস্তি
অস্তি নাস্তি ন জানাস্তি
দিবে রাত্রি খেতে চাস্তি
আমি ব্যাটা মরি খেটে॥

—পৌষডার গীত

প্রসঙ্গত মিলের কথাও কিছু বলা প্রযোজন। পদবন্ধে না হলেও ঈশ্বর গুপ্ত মিলের বিষয়ে যে সতর্ক হবেন এবং নৈপুণ্য দেখাবেন এটাই স্বাভাবিক। কারণ ভারতচন্দ্রর কাব্যেই মিলের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল বিশেষত যমক অনুপ্রাসের উপর অধিকার থাকায় মিল তাঁর পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য ছিল। কবিওয়ালাদের মৌখিক রচনায় না হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর উচ্চতর

সাহিত্যে সুষ্ঠু মিল দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়েছিল। মিল বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত কতখানি সতর্ক ছিলেন তার প্রমাণ—

'নিধুবাবু যে প্রকার রাগ, স্বর এবং ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, মিলের প্রতি সে প্রকার দৃষ্টি কবিতেন না। এ কারণ তাঁহার কোন কোন গান স্বর করিয়া গাহিলে মানুষের মনকে যে প্রকার আর্দ্র করে, মুখে পাঠ করিলে সে প্রকার চিত্তসুখকর হয় না। যথা "মান" দিন" মন" প্রাণ" ছিল" গেল" ইত্যাদি ফলে কেবল ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত পুরাতন প্রায় সমস্ত কবিদিগের প্রণীত কবিতায় এই প্রকার মিলেব দোষ আছে।'[৪৪]

শুধু মাত্র শব্দান্ত ব্যঞ্জন ও স্বরের মিলকে তিনি আদর্শ মিল মনে করতেন না। কবিওয়ালাদের থেকে এখানেই তাঁর খুব বড়ো পার্থক্য। কবিওয়ালারা প্রায়শঃই একমাত্রক মিল দিয়েছে। কিন্তু দ্বিমাত্রক মিল ঈশ্বর গুপ্ত অতি সহজেই দিয়েছেন। উপরে সবগুলি উদধৃতিতেই তার দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু ত্রিমাত্রক মিলে মিলনৈপুণ্যের পরিচয়। বোধেন্দুবিকাশ নাটকে তার দৃষ্টান্ত যত্রতত্র। মর্ম-কর্ম-ধর্ম, কামিনী-ভামিনী জাতীয় মিল ঈশ্বর গুপ্ত সহজেই ব্যবহার করতেন। জোড়া-মিলও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়— পিঠে পুলি=ছিটে গুলি। ক্রিয়াপদের মিলও প্রচুর—ধরেছে=মরেছে।

মিল রচনার নৈপুণ্যের উপরেই ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যশিল্পের কৃতিত্ব অনেকখানি নির্ভর করছে। পদে পদে পর্বে পর্বে নানাভাবে মিল দিয়ে তিনি তাঁর বহু পংক্তিকে স্মরণীয় করে রেখেছেন।

কাব্যশৈলীতে ঈশ্বর গুপ্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ দান আছে। উনিশ শতকে বাংলা কাব্যে রূপকের প্রভূত চর্চা হয়েছিল। রূপক ছিল সহজ কাব্যসাফল্য লাভের উপায়। শিবনাথ শাস্ত্রী বলদেব পালিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য বহু কবি কখনো না কখনো রূপক-কবিতা লিখেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠের অনেকগুলি রচনাই রূপক। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যশিষ্য দ্বারকানাথ অধিকারী 'সুধীরঞ্জনে' একাধিক রূপক-কবিতা লিখেছেন, তার কোনো কোনো কবিতা বোধেন্দু-বিকাশের আদর্শেই লেখা। বঙ্কিমচন্দ্র রূপকের চর্চায় বিরক্ত হয়ে লিখেছিলেন[৪৫]

'এই কবি কিছু রূপকপ্রিয়। অনেকগুলি কবিতাই এই অলংকারবিশিষ্ট। এইরূপ কাব্য এ পর্যন্ত কখন অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণিত হয় নাই, হইতে পারে না।'

ঈশ্বর গুপ্ত রূপক-কবিতা লেখার প্রবর্তন করেন। সেকালে রূপক শব্দটি সাধারণ কবিতা অর্থেও অনেক সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে। সংস্কৃতে নাটককে রূপক বলা হত। কিন্তু বাংলায় সংবাদপ্রভাকরে এর অর্থব্যাপ্তি লক্ষ্য করি। ঈশ্বর গুপ্তের ঋতুবিষয়ক কবিতাগুলি রূপকের ভঙ্গিতেই রচিত। বর্ষাকে রাজা, গ্রীষ্মকে প্রতিপক্ষরূপে কল্পনা করে যুদ্ধ বর্ণনায়—ঈশ্বর গুপ্ত কাব্যে মনোহারিত্ব নিয়ে আসবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বোধেন্দুবিকাশ নাটকখানি রূপক নাটক—কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের ভাবানুবাদ।

ঈশ্বর গুপ্ত-প্রবর্তিত রূপক যখন প্রাণহীন যান্ত্রিক কাব্যপদ্ধতিতে পরিণত হল, তখন এর সম্ভাবনা নিঃশেষিত হল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যপদ্ধতির জন্মান্তর ঘটালেন। তিনি যে তাঁর কবিজীবনের যৌবনকালে অনেকগুলি রূপক-কবিতা লিখেছিলেন, অনুমান করা যায়, সে ছিল এই কাব্যান্দোলনেরই পরিণতি। রবীন্দ্রনাথে রূপক তাঁর ভাবের স্বাভাবিক প্রতিমায় রূপান্তরিত হল। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি।[৪৬]

দেশবাৎসল্য ও রাজনীতি

আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে-সব নতুন ভাবসম্পদ নিয়ে গড়ে উঠেছে, স্বদেশ-চেতনা তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। আধুনিক কালের প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেই এর আভাস অঙ্কুরিত হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশচেতনার প্রকৃতি-বিশ্লেষণ শুধু সাহিত্যের দিক থেকেই নয় ইতিহাসের দিক থেকেও কৌতূহলজনক। তবু তাঁর স্বদেশচেতনা একালের বিচারে কিছু কিছু তর্কেরও সৃষ্টি করেছে। একথা সকলেই জানেন তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। যে দেশপ্রেম পাশ্চাত্য জীবনবোধের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত, তা তিনি বিদেশী ভাবধারার সংস্পর্শে এসে পেয়েছিলেন, এমন কথা বলতে অনেকেই দ্বিধা বোধ করেন। তাই তাঁর কাব্যে এই ভাবটি কি করে সঞ্চারিত হল, সেটা সত্য সত্যই সন্ধানযোগ্য বিষয়। মানুষ তার বাস্তুভিটাকে ভালবাসে, স্বভাবতই অনুরাগী হয় আপনজন এবং আপন সমাজের। যে পরিবেশে সে লালিত হয়, তার প্রতি মমতার বন্ধন অজ্ঞাতসারেই গড়ে ওঠে। এটা মনুষ্যধর্মেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় নিজের সমাজ বা দেশ সম্বন্ধে নিবিড় মমতার টান গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে আধুনিক দেশচেতনার লক্ষণ কতটুকু আছে?

বস্তুত আপন সমাজ এবং আপন সাম্প্রদায়িক ধর্মের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে

আসবার ইতিহাসই আমাদের আধুনিক দেশচেতনার ইতিহাস। নিজের গণ্ডীর বাইরে যে বৃহৎ একটি দেশ রয়েছে সেই দেশের সঙ্গে যে আমার সমগ্র অস্তিত্বটি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, এই উপলব্ধি আধুনিক উপলব্ধি। মানুষের চিত্তের মুক্তির পথে এই চেতনা একটি বৃহৎ পদক্ষেপ। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পদার্পণের এই হচ্ছে বিশিষ্ট লক্ষণ। ঈশ্বর গুপ্ত এমন একটি যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন নবযুগের সূত্রপাতে এই চেতনার উন্মেষ ঘটতে আরম্ভ হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বে আর কোনো কবি ছিলেন না, যিনি এমনি করে নবযুগের এই লক্ষণকে ভাষা দিয়েছেন। অবশ্য নিধুবাবুর একটি সুপরিচিত গানে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে, তা সত্যই নিত্যস্মরণীয়।—

নানান দেশে নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা।
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর,
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥

নিধুবাবু দীর্ঘজীবী ছিলেন, ১৮৩৯-এ তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ঠিক কোন সময় এই গান রচনা করেছিলেন বলা যায় না। তিনি বাংলা ভাষা ছাড়াও ইংরেজি ও অন্যান্য কয়েকটি ভাষা জানতেন। সুতরাং তাঁর এই মাতৃভাষা-সচেতনতা সম্ভবত বিভিন্ন ভাষার সংসর্গজাত প্রতিক্রিয়ার ফল। একে দেশচেতনার একটি লক্ষণ বলব? হয়তো আধুনিক অর্থে দেশচেতনা বলে অভিহিত হবার যোগ্যতা এর নেই কিন্তু এটাও ঠিক যে স্বভাষার বাইরে ভিন্নতর ভাষার সংস্পর্শে আসার ফলেই কবি মাতৃভাষার স্বাতন্ত্র্যকে এমন করে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বদেশ-চেতনার এইটিই আরম্ভ। দেশচেতনা বা দেশপ্রেম স্পষ্ট আকার গ্রহণ করে বাইরের সংযোগেই। এই যোগ না হওয়া পর্যন্ত এই চেতনা কূপমণ্ডুকতা ছাড়া কিছুই নয়। সংবাদপ্রভাকর পত্রিকা প্রকাশ (১৮৩১) করবার আগেই মাতৃ-ভাষাপ্রীতিবশত ঈশ্বর গুপ্ত 'বঙ্গরঞ্জিনী' নামে একটি সভা স্থাপন করেছিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভাষার চর্চা করা। এই সভার সম্পাদকরূপে তিনি ঘোষণা করেছিলেন "পরজাতীয় ভাষায় নৈপুণ্যত্বপ্রযুক্ত স্বকীয় ভাষাদ্বেষী এই সকল জনেরা অস্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না।" যতদূর জানি এটিই ঈশ্বর গুপ্তের প্রাচীনতম উক্তি যা আমরা পেয়েছি। পরজাতীয় ভাষায় নৈপুণ্যের ফলে বাংলা ভাষার প্রতি যারা অবজ্ঞা করবে তাদের তিনি সভায় গ্রহণ করবেন

না—এই মনোভাবকে অবশ্য সত্যকার স্বদেশপ্রেম বলা যায় না, কারণ এই মনোভাব স্বদেশকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেই দেখেছে।

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের এই কূপমণ্ডুকতা তাঁর জীবনে স্বল্পকালস্থায়ী একটি পর্যায় মাত্র। তিনি এই সময় রক্ষণশীল দলের সঙ্গে যুক্ত। এই সময়ের সংবাদপ্রভাকর পত্রিকাতে তিনি ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁর পরিবর্তন হয়। জাতির কল্যাণকে তিনি উদারতর দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেন। নানা বিচিত্র ভাবনা, নতুন যুগ এবং নতুন জীবনের তাৎপর্য তিনি ক্রমেই অনুধাবন করতে সক্ষম হন। এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, ঈশ্বর গুপ্ত দেশপ্রেমকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দিতে পারেন নি, যেমন দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু এটাও স্মরণযোগ্য যে, সাহিত্যে স্বদেশচিন্তার বিচিত্র উপলক্ষ তিনিই সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত পল্লীগ্রামের বালক। দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হওয়ায় লেখাপড়া সেরকম শিখতে পারেন নি। বাল্যকালে তিনি দেশকে পৌষপার্বণ, ব্রত, পাঁচালী, আখড়াই কবিগান, সুচিরপ্রচলিত অন্যান্য আচারে অনুষ্ঠানে উৎসবে যেমন দেখেছিলেন স্বভাবতই তার প্রতি তাঁর একটা সহজাত আকর্ষণ জন্মেছিল। এই মমতা নিয়েই তিনি এসেছিলেন কলকাতায়।

২

কলকাতায় তখন নতুন যুগের আন্দোলন চলেছে। দেশে তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব। ইংরেজি শিক্ষা দেশের নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে নতুন ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটাচ্ছে। ইংরেজ রাজত্ব ভারতীয় চিত্তে দুরকমের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ভারতীয়দের মনে সাধারণভাবে ইংরেজ রাজত্বের প্রতি বিরাগ ছিল। যারা ইংরেজদের কাছে রাজ্য হারিয়েছে স্বভাবতই তারা ইংরেজ রাজত্ব সম্বন্ধে সন্তুষ্ট ছিল না। এই অসন্তোষই তাদের সম্মিলিত ভাবে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহে অনুপ্রেরিত করল। ইতিপূর্বে ভারতবাসী কখনোই এমনভাবে কোনো একটি বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে মিলিত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন,[৪৭]

'এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, ধর্মের প্রভেদে, নানা জাতি। বাঙ্গালি, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে?

ধর্মগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই।...জাতিপ্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ পাইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়া, সকল জাতীয় রাজাই হিন্দু রাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছেন।'

কিন্তু এটাও ঠিক যে দেশীয় রাজন্যদের মধ্যে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, সে বিদ্রোহ কোনো বৃহৎ ও মহৎ দেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ থেকে জাগে নি; জেগেছিল রাজ্যহানির জন্যই বিশেষ করে।

কিন্তু দেশের শিক্ষিত সমাজের চিন্তাধাবা অন্যদিকে প্রবাহিত হচ্ছিল। তাদের কাছে ইংরেজ রাজত্ব মুসলমান রাজত্বের উৎপীডনের থেকেই যে দেশকে মুক্ত করল তা নয়, ইংরেজ আমাদের মধ্যে উচ্চতর নৈতিক এবং মানবিক আদর্শ নিয়ে এল। ইংরেজি শিক্ষাতেই আমাদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি জেগে উঠল, যুক্তিবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভাবতে শেখাল। আমাদের সম্মুখে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। ধর্ম সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারে আমাদের উৎসাহের অন্ত থাকল না। হিন্দু কলেজ থেকে যে সব তরুণ যুবক শিক্ষা পেয়ে বেরিয়ে আসছিল, ইংরেজ রাজত্বের এই স্রুফল তারা ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা বরং ভয় পেল এই মনে করে যে, সিপাহী বিদ্রোহের ফলে হয়তো জাতীয় জাগরণ প্রতিহত হবে। অন্তত কিছুকালের জন্য হলেও ইংরেজ রাজত্ব অব্যাহত থাকাই বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে রামমোহনের মনোভাবও ছিল একই। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন,[৪৮]

> though he was fully cognizant of the complex organisation of the Government and of all wrongs and grievances inseparable from its operation, yet he cheerfully and gratefully admitted the manifold blessings it conferred on his country ; and was strongly of opinion that the English were better fitted to govern it than the natives themselves.

কৌতূহলের বিষয়, ইংরেজ রাজত্বকামী এই নবশিক্ষিতদের মধ্যেই দেশপ্রেমের বীজ উপ্ত হয়েছিল। তেমনি রামমোহন রায়ের ধর্মসংস্কারে এবং নানা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে গৌরববোধ দেখা দিয়েছিল। নব্যবঙ্গের স্বাধীন চিন্তাতেও দেশীয় ইতিহাসের প্রতি নিবিড় অনুরাগ ও সমাজসংস্কারমূলক আদর্শ ফুটে উঠেছিল। এও তাঁদের দেশচেতনার এক নতুন অভিব্যক্তি। নব্যবঙ্গেরা ছিলেন মনস্বী যুবক। য়ুরোপীয় সাহিত্য, ইতিহাস

প্রভৃতি তাঁরা উত্তমরূপে পড়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রকৃতি এবং জটিলতা দেখে জীবনের বিস্তৃতি সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা জন্মেছিল। স্বদেশের ইতিহাস পড়ে এবং সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে তুলনায় এ দেশের অতীত ও বর্তমানকে তাঁরা বিচার করে দেখেছেন। নব্যবঙ্গের গুরু ডিরোজিওই তাঁদের এ বিষয়ে দীক্ষিত করেছিলেন। ডিরোজিওর একটি সুন্দর সনেট[৪৯] মাতৃভূমির উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।—

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার ; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে !
কোথায় সে বন্দ্যপদ ! মহিমা কোথায় !
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার রহিবে না লেশ !
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি :
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননী।

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ

নব্যবঙ্গের যুবকরা পুরোনো সংস্কার ভাঙবার অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁদের প্রেরণায় ছিল প্রচ্ছন্ন এই দেশপ্রেম। বাংলাদেশে তাঁরা যে আন্দোলন করেছিলেন, তার থেকেই পরবর্তী যুগের আরম্ভ ধরা যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত থেকে আসবার সময় নিয়ে এসেছিলেন জর্জ টমসনকে (১৮৪২)। টমসনের আদর্শে নব্যবঙ্গ নতুন করে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। তাঁদের স্বাধীন চিন্তাপ্রবণতাকে টমসন স্বদেশসেবায় প্রবর্তিত করেছিলেন। তখন থেকেই ভারতীয় রাজনীতির সূত্রপাত হল। এর বিশেষত্ব এই যে, ইংরেজ রাজত্বের প্রতি আস্থা অটুট রেখেই এই দেশপ্রেমের জন্ম হয়েছে। আমাদের নবজাগ্রত স্বদেশচেতনা সমৃদ্ধ হয়েছে বিচিত্রগামী ভাবসম্পদে, সর্বব্যাপী হিতৈষায়। ইংরেজ-সান্নিধ্যে দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান

ও অন্যান্য ভাবসম্পদের সমুন্নতি ঘটবার সম্ভাবনা। সেইজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশেষত্বই ছিল জাতিগত স্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ রাজত্বের সম্বন্ধে আবশ্যকতাবোধ।

স্বদেশচেতনার আর-একটি রূপ দেখা দিচ্ছিল তত্ত্ববোধিনী-দেবেন্দ্রনাথের আদর্শে। প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতির চর্চায় ভারতবর্ষের এক গৌরবময় রূপ ক্রমেই উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল। রামমোহনে এর সূচনা দেবেন্দ্র-নাথের ধর্মসংস্কারে তার প্রতিষ্ঠা। ধর্মের প্রাচীন এবং বিশুদ্ধ রূপ উদ্ধার করতে গিয়ে প্রাচীন ভারতচর্চার আগ্রহ জেগে ওঠে। অক্ষয়কুমার দত্তের আলোচনা এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়কুমারের অনেক লেখা সংবাদপ্রভাকরে বেরিয়েছে। তাতেও আমাদের দেশ সম্বন্ধে গভীর প্রীতি এবং মমতা তৈরী হয়ে উঠেছিল। নব্যবঙ্গেরা সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এবং দেবেন্দ্রনাথ-তত্ত্ববোধিনী প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তুলছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সম্পাদক জীবনের প্রথম থেকেই এই দেশচেতনার জাগরণ দেখেছিলেন। নব্যবঙ্গদের সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় এবং তত্ত্ববোধিনী সভায় নিয়মিত উপস্থিত থেকে তিনি এই দেশচেতনার স্পর্শ লাভ করছিলেন।

দেশচেতনা এবং দেশকল্যাণচিন্তার সর্বব্যাপী আয়োজনে ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকাও কম ছিল না। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা নামে যে সভাটি স্থাপিত হয়, সে-সভা ছিল দেশের রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার প্রথম সভা। পূর্বে এই সভার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত দেশকল্যাণমূলক আলোচনা-গুলিতে যোগ দিতেন এ-সংবাদও পাওয়া যায়। এই সভার অনুরূপ আরও কতকগুলি সভা পরে গড়ে ওঠে, তাতে ঈশ্বর গুপ্ত যোগ হয় তো দেন নি কিন্তু জনসমাজের স্বার্থরক্ষার এই প্রয়াস দেখে দেশহিতবোধ যে প্রখর হয়েছিল, এটা অনুমান করতে বাধা নেই। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর ল্যাণ্ডহোলডার্স সোসাইটি স্থাপিত করেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা Society for the Amelioration of India প্রতিষ্ঠিত করেন। এর একটি সভায় কাশীপ্রসাদ ঘোষ বলেছিলেন,[৫০]

> Ever since the commencement of the British supremacy in the country the policy of our present rulers has been to deprive us of the enjoyment of political liberty.

এ-ধরনের উক্তি সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় দক্ষিণারঞ্জনের উক্তির মতোই

দুঃসাহসিক। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে আরম্ভ করেছি, এসব উক্তি তারই প্রমাণ।

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে যে-দুটি ঐতিহাসিক সভা স্থাপিত হয়, তারা সমাজের দুই বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইনডিয়া সোসাইটি ছিল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজের মুখপাত্র, ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন ছিল জমিদারদের মুখপত্র। সমগ্র দেশ বা জাতির আশাআকাঙ্ক্ষাকে সম্মিলিত করে দেশাত্মবোধ তৈরি করা ছিল পরবর্তী যুগের সাধনা। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইনডিয়ান এসোসিয়েশন দুই সভাকে মিশিয়ে প্রতিনিধিসভা হয়ে দাঁড়াল। এটাই ছিল ভবিষ্যৎ ভারতীয় রাজনীতির পূর্বস্থচনা।[৫১]

দেশের ঐতিহ্যগর্ববোধ, রাজনৈতিক অধিকারবাদ, সমাজকল্যাণমূলক ভাবনা —সর্বোপরি এক রাষ্ট্রশাসনে সহানুভূতি—এই চারিটি উপাদান দিয়ে আধুনিক দেশপ্রেমের সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলেছেন, পূর্বে আমাদের দেশে এ বস্তু ছিল না, কারণ এই উপাদানগুলিরই অভাব ছিল। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সম্পাদক-জীবনে দেশবাৎসল্যের বিচ্ছিন্ন রূপই দেখেছেন, সংহত সামগ্রিক ও অখণ্ডরূপ দেখেন নি। কবিতাতে তিনি সেই রূপটিকেই ধরে দিয়েছিলেন।

৩

ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেমকে কেউ বলেছেন 'ঘোলাটে' কেউ বলেছেন 'সংকীর্ণ' কেউ বলেছেন 'বিচারহীন অন্ধ।' এই অভিযোগ আশ্চর্য বটে। তিনি ইংরেজ রাজ্যকে চেয়েছিলেন এবং সিপাহী যুদ্ধকে কয়েকটি কবিতাতেই ব্যঙ্গ করেছিলেন এ-কথা সত্য। কিন্তু তাঁর এই মনোভাব শিক্ষিত বাঙালির মনোভাব—এ-কথা অস্বীকার করবার নয়। দেশবাৎসল্য এবং ইংরেজপ্রশস্তি যে সেকালে একই সঙ্গে শিক্ষিত মনে অবস্থান করেছে, একে কেউ স্ববিরোধী বলে ভাবে নি। কেন ভাবে নি তার কারণের কিছু ইঙ্গিত পূর্বেই দিয়েছি। বিস্তৃত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় এই যে ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজ রাজত্বকে চাইলেও তাঁর দেশপ্রেমের অকৃত্রিম আন্তরিকতারও তুলনা নেই।

অনুমান করা যায় ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বর গুপ্তের দেশানুভূতির সূচনা হয়েছিল তাঁর মাতৃভাষাপ্রীতির মধ্য দিয়ে। সেই ইংরেজিয়ানার যুগে বাংলা ভাষার চর্চার জন্য তাঁর উপদেশ-নির্দেশ অসাধারণ বলিষ্ঠতার সঙ্গেই উচ্চারিত হয়েছিল। এই বাসনা তাঁর রক্ষণশীল বাসনা নয়। বাংলাভাষার সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার-

কামনা ছিল তাঁর চিন্তাবৈশিষ্ট্য। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র-ববীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষার জন্য ব্যাকুলতার সঙ্গেই ঈশ্বর গুপ্তেব ব্যাকুলতা তুলনীয়। তবে তাঁরা একে যত শক্তিশালী যুক্তির উপব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত তা পারেন নি। কিন্তু মাতৃভাষা সম্বন্ধে স্নেহসিক্ত কণ্ঠস্বব সত্যই মর্মস্পর্শী—

যৌবনের আগমনে জ্ঞানেব প্রতিভাসনে
বস্তুবোধ হইল তোমাব।
পুস্তক কবিযা পাঠ দেখিয়া ভবেব নাট
হিতাহিত করিছ বিচাব॥
যে ভাষায হযে প্রীত পবমেশ গুণগীত
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃসম মাতৃভাষা পূবালে তোমাব আশা,
তুমি তাব সেবা কব স্বখে॥

—মাতৃভাষা

মানবশিশুর অন্তরের অনুভূতির প্রথম প্রকাশ ঘটে যে-ভাষায সেই ভাষা আমাদের জননীরই মতো। এই ভাষাতেই আমরা মনেব ভাবেব আদান-প্রদান করি, এই ভাষাতেই প্রতিবেশীর সঙ্গে একতাবোধ জন্মে, আস্তে-আস্তে তাই আবও বৃহত্তর পটভূমিতে ছডিযে পডে। যে-ভাষায আমবা স্বখদুঃখবেদনাকে প্রকাশ করি, সেই ভাষাতেই অবশেষে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা কবি, আবার তৃতীয পর্যায়ে সেই ভাষাতেই বৃদ্ধকালে ধর্মালোচনা কবি। মাতৃভাষা বাল্যলীলাব ভাষা, যৌবনের স্বপ্ন ও আশার ভাষা, বার্ধক্যের শান্তি ও কর্মাবসানের ভাসা। মাতৃভাষা দেশাত্মবোধের কত বডো অবলম্বন পববর্তীকালে বহু দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও কবিতাই তার প্রমাণ। ‘মোদের গরব মোদেব আশা’ ‘কোন ভাষা মরমে পশি আকুল করি তোলে প্রাণ’ কিংবা ‘কাহাব ভাষা হয ভুলিতে সব চায’ প্রভৃতি বহু দেশাত্মবোধক গান বাংলা ভাষাকে নিযেই রচিত। স্বদূরকালবর্তী নিধুবাবুর গানটি বাদ দিলে ঈশ্বব গুপ্তের ‘মাতৃভাষা’ কবিতা থেকেই আমাদের এই শ্রেণীব দেশাত্মবোধক কাব্য ও গানের ধারা তৈবি হযেছে। এখানে আমরা ঈশ্বর গুপ্তের দেশীয় কবিজীবনী সংগ্রহের কথাও স্মরণ করি। এই সংগ্রহের প্রেরণাও ছিল স্বদেশীয় ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে ইংরেজিশিক্ষামুগ্ধ যুবকদের কাছে তুলে ধরা।

'কতকগুলীন যুবক যাঁহারা বিলিতি বিদ্যা অভ্যাস ও বিলিতি কবিতার চালনাপূর্বক কেবল বিলিতি রসিকতাই শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা কবিতার রসজ্ঞ কিরূপে হইতে পারেন ?···সংপ্রতি আমরা প্রীতিচিত্তে বিশেষ অনুরোধ করি, উক্ত মহোদয়েরা স্বদেশীয় এই সমস্ত কবিতার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীতি প্রকাশ করিবেন।'[৫২]

কবিজীবনী সংগ্রহের মূলে ছিল যে ইতিহাস-সংরক্ষণের বাসনা তাও এই দেশপ্রেমজাত। প্রাচীন ইতিহাস ও গৌরবকে ফিরিয়ে আনবার বাসনাকে জাগ্রত করেছিল তত্ত্ববোধিনীসভা ও নব্যশিক্ষিতদের ইতিহাসচর্চা। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে এই অনুরাগ কিভাবে প্রজ্বলন্ত দেশপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছিল, তার নিদর্শন—

'এই দেশ যখন স্বাধীন ছিল অর্থাৎ আমরা স্বজাতীয় রাজার অধীনে অবস্থান করিতাম তখন হিন্দুজাতির গৌরব জগন্ময় কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল আমাদের রাজ্যই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রাজ্য ছিল এবং আমরাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যরূপে বিখ্যাত ছিলাম। প্রথমত এই দেশ হইতেই বিবিধ বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। জ্যোতিষবিদ্যা, ক্ষেত্রপরিমাপক বিদ্যা, রেখাগণিত বিদ্যা এবং বিজ্ঞানবিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞানবর্ধিনী বিদ্যা প্রথমেই অস্মদ্দেশীয় কতিপয় মহাত্মা ব্যক্তিকে অবলম্বনপূর্বক পৃথিবীতে পদার্পণ করত হিন্দুসমাজে আদরপ্রাপ্তা হয়েন, ঐ সময়ে অবনীর অন্যান্য দেশ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল।···'[৫৩]

দেশের প্রাচীন গৌরব সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের সচেতনতা নানা বিদ্বৎসংসর্গে পরিণতি পেয়েছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের মতো জ্ঞানপিপাসুর বন্ধুত্ব নিশ্চয়ই তাঁর সহজাত দেশপ্রেমকে মননসমৃদ্ধ করেছিল। এই প্রসঙ্গেই ঈশ্বর গুপ্ত একটি কবিতা লিখেছিলেন সে-কবিতাটিও স্মরণীয়।

জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে ?
তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানহত
মিছে কেন মর ভার বয়ে ?
প্রবীণা নবীনা হয়ে সন্তানসমূহ লয়ে
কোলে করি করিবে পালন।
সুধাসম স্তনপানে জননীর মুখপানে
একদৃষ্টে করিবে ঈক্ষণ ॥

এরূপ স্বপনমত কত হয় মনোগত
মনোমত ভাবের সঞ্চার।
ফলে তাহা কবে হবে প্রসূতির হাহারবে
সুত সবে করে হাহাকার॥

—ভারতের ভাগ্যবিপ্লব

উল্লেখযোগ্য এই যে ঈশ্বর গুপ্তই বাংলা কবিতায় ভারতবর্ষকে জননী সম্বোধন করলেন।

ঈশ্বর গুপ্তের দেশচেতনা যে কতখানি ব্যাপক হয়েছে এটি তারই একটি প্রমাণ। দেশকে ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক এই দুই দিক দিয়ে অনুভব করলে তবেই দেশপ্রেম সম্পূর্ণ হয়। সে-প্রেমে যুক্তি ও অনুভূতির দৃঢ়তা আসে। তিনি পত্রিকা-সম্পাদকরূপে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন, বিভিন্ন অঞ্চলের সংবাদ ছেপেছেন— এতে দেশের ভৌগোলিক রূপটিও তাঁর অন্তরে ফুটে উঠতে থাকে। বাংলাদেশ, কলকাতা শহর ছেড়ে তিনি বৃহৎ ভারতবর্ষের অনুভূতিকে মনে নিয়ে এলেন। বিশেষ করে তিনি যে কলকাতা ছেড়ে প্রায়শঃই দেশ পর্যটনে যেতেন এতে নিশ্চয়ই তাঁর দৃষ্টির সংকীর্ণতা ঘুচে গিয়েছিল। তীর্থ-পর্যটনই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, ইংরেজ রাজত্বের বিস্তার ও শাসন দেখা তাঁব অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। দেশপর্যটন দেশের মূর্তিকে অন্তরে ফুটিয়ে তোলার প্রধান উপায়।

'ভারতের ভাগ্যবিপ্লব' কবিতাটি যে-সময় লেখা হয়, সম্ভবত সেই সময়েই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'স্বদেশ' লেখা হয়। বঙ্কিম এই কবিতাটি থেকেই সুপরিচিত কয়েক পংক্তি তুলে বলেছেন 'ভরসা কার সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন'। এই কবিতাটি যে অবিলম্বেই সুপরিচিত হয়েছিল তার প্রমাণ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ছন্দাবলী' নামক কাব্যসংকলনে এই কবিতাটি সংকলিত হযেছিল।[৫৪]

এই কবিতা বস্তুতই একটি চমৎকার কবিতা। একে বিশ্লেষণ করে দেখলে ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেমের কল্পনার মহত্ত্ব ও গভীরতা একই সঙ্গে পাঠককে অভিভূত করবে। 'বিদেশের ঠাকুর এবং স্বদেশের কুকুর'— এই কাব্যপংক্তি অন্ধতার নিদর্শন মাত্র, অতএব ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেম রক্ষণশীলতার নামান্তর— এই অভিযোগ যাঁরা করেন, তাঁরা সম্ভবত সমগ্র কবিতাটি একসঙ্গে পড়ে সমালোচনা করেন না। এই কবিতাতে ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেম সংকীর্ণতামুক্ত হয়েছে এবং তাতে ধর্ম ও বিশ্বমানবতাবোধের আভাসও আছে।

জননী শিশুর কাছে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ। জননীর প্রতি আকর্ষণ যেমনি সঙ্গত, তেমনি স্বাভাবিক। তাই প্রথমেই আমাদের পূজ্য আমাদের জননী। তারপর,

প্রসূতি তোমার যেই তাহার প্রসূতি এই
বসুমাতা মাতা সবাকার।

এই বসুমতী সবাইকে পালন করছেন স্নেহপীযূষ দানে। নদ নদী শস্য দিয়ে বসুমতী সাজিয়েছেন তার ভাণ্ডার। মোহিনী মহীর আকর্ষণেই বহ্নি এবং বারি বদ্ধ হয়েছে, রত্নাকর হয়েছে রত্নময়ী। এই সাগরাম্বরা পৃথিবী আমাদের দ্বিতীয় পূজ্য—

প্রকৃতির পূজা কব পুলকে প্রণাম কর
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে॥

এখানে কবির শিক্ষা কিন্তু প্রেমময়ী পৃথিবীকে ভালোবাসা। প্রকৃতিকে পূজা কর। আকাশ আলো বায়ু জল অগ্নি—এরাই জীবদেহকে সর্বদাই রক্ষা করছে, ঘিরে আছে। প্রকৃতিকে ভালোবাসার কথা বলে কবি মনে যে ঔদার্যের ও প্রসন্নতার সৃষ্টি করলেন, তাতে ক্ষুদ্রতার লেশমাত্র আর থাকল না। মনে তিনি নিয়ে এলেন গণ্ডিমুক্ত বৃহতের অনুভূতি। তারপরে বললেন,

বিশেষত নিজদেশে প্রীতি রাখ সবিশেষে
মুগ্ধ জীব যার মোহমদে॥
ইন্দ্রের অমরাবতী ভোগেতে না হয় মতি
স্বর্গভোগ উপসগ মার।
শিবের কৈলাসধাম শিবপূর্ণ বটে নাম
শিবধাম স্বদেশ তোমার॥

ইন্দ্রের অমরাবতীও স্বদেশের কাছে তুচ্ছ। কারণ ইন্দ্রলোক ভোগপুরী মাত্র, শিবধামই যথার্থ পুণ্যভূমি। স্বদেশকে শিবধামের সঙ্গে তুলনীয় করে কবি একে সর্বোত্তম শ্রদ্ধাই নিবেদন করলেন। অতএব স্বদেশপ্রেম মনকে কল্যাণমুখী করে—সর্বলোকের মঙ্গলপ্রার্থনা করে। যে-স্বদেশপ্রেম অন্যের দেশকে হীন জ্ঞান করায় ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেম সেই গোত্রের নয়। এই দেশপ্রেম অন্যদেশকেও শ্রদ্ধা করতে শেখায়। এই রকম স্বদেশপ্রেমের চেয়ে বড়ো আর কিছুই নাই, পার্থিব সম্পদও এর কাছে তুচ্ছ। দেশের কুকুর বলতে স্বভাবতই দেশের অকিঞ্চিৎকর বস্তু, বিদেশের মূল্যবান বস্তুর চেয়েও প্রিয় হয়ে ওঠে কারণ এ দেশপ্রেম দীক্ষা দেয় ত্যাগের।

ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেমে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের উদার দেশবাৎসল্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার সুর বিনম্র আত্মদানের, তাঁর দেশপ্রেমে অবিনয় নেই, রাজসিক অহংকার নেই আছে ভক্তহৃদয়ের পূজা। ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেম প্রায় আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গেই সমঞ্জসীভূত। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম পরস্পরের পরিপূরক। এখানেও প্রকৃতি-পূজা এবং স্বদেশপূজা পরস্পরের পরিপূরক।

বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে যে দেশপ্রীতির উদ্‌বোধন ঘটাবেন, ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশপ্রীতি তারই উপযুক্ত ভূমিকা রচনা করেছিল।

ধর্মবিশ্বাস

ঈশ্বর গুপ্ত ঠিক কি ধরনের ধর্মের আদর্শে বিশ্বাস করতেন,[৫৫] এই নিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ কিছু বিতর্ক প্রচলিত ছিল। এ বিতর্ক কিছু নতুন নয়, ঈশ্বর গুপ্তের জীবিতকাল থেকেই প্রভাকর-পাঠকদের মধ্যে এই নিয়ে কিছু সংশয় ছিল। কায়স্থকুলিশ নামক গ্রন্থের লেখক রাজনারায়ণ মিত্র একবার ঈশ্বর গুপ্তকে বলেন "আপনি পৌত্তলিক নহেন, আমিও নহি, উভয়েই ব্রাহ্ম, অতএব আমার প্রণীত পুস্তকের প্রতি প্রতিকূলতা কেন করিতেছেন।" ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন, 'এই প্রস্তাবে আমি হাস্যবদনে বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতি কটাক্ষ করত কৌতুকচ্ছলে কহিলাম যে "পৌত্তলিক ও ব্রাহ্ম উভয়কে তুল্যরূপে হীন বলিয়া বোধ করি" আমার এই কথার মর্ম নবীন বর্ম মহাশয় প্রবীণ হইয়াও বুঝিতে পারিলেন না। ঐ প্রসঙ্গে অপরাপর নানা কথা উত্থাপন করিতে লাগিলেন। সুতরাং আমি ধর্ম বিষয়ে আপনার অন্তঃকরণের যথার্থ ভাব তাঁহার নিকটে প্রকাশকরণে অসম্মত হইয়া...'[৫৬]

ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্ম বলেই পরিচিত ছিলেন, উপরের উদ্‌ধৃতি থেকে তাই মনে হয়। অথচ তিনি যখন প্রথম সংবাদপ্রভাকর-সম্পাদকরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন তিনি ধর্মসভাপন্থী অর্থাৎ রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হওয়ার সময় থেকেই তাঁর চিন্তায় ও কর্মে এই পরিবর্তন এসেছিল। তিনি তত্ত্ববোধিনী সভাতে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন বলে শোনা যায়। তিনি ব্রাহ্মধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা নিয়েছিলেন কিনা বলতে পারি না, কিন্তু ব্রাহ্ম-পদ্ধতিতে উপাসনা ও বক্তৃতা করেছেন। এমন কি কিশোরীচাঁদ মিত্রের একেশ্বর-বাদী সভা হিন্দু থিয়ফিলানথ্রপিক সোসাইটিতেও তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। পরে

তিনি তাঁর কার্যালয়ে উপাসনা-সভা প্রবর্তন করেন। পয়লা বৈশাখের সংবাদ-প্রভাকরে তিনি ঈশ্বরভক্তিমূলক দীর্ঘ রচনা লিখতেন, তার ভঙ্গি ছিল ব্রাহ্মোচিত।

এই সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মবিষয়ে কি রকম মতামত পোষণ করতেন, পরমার্থ-বিষয়ক কবিতা থেকে তার আভাস পাওয়া যেতে পারে। এই কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে এতে তাঁর একেশ্বরবাদী চিন্তাধারাই প্রকাশিত। এখানে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর কথা নেই, আচার-অনুষ্ঠান পালনের কোনো কথাই নেই, বরং আচার পালনের সম্পূর্ণ বিরোধী কথাই এতে আছে। এই কবিতা-গুলিতে কবি সংসারের নিরর্থকতা, (সব হ্যায় ফাঁক, কিছু কিছু নয়, শরীর অনিত্য, মায়া ইত্যাদি) বৈরাগ্যের স্বরে বারবার শুনিয়েছেন। এই সংসারকে কখনো বলেছেন রঙ্গমঞ্চ, কখনো বলেছেন সমুদ্র, কখনো অরণ্য। মনকে নিবৃত্তিমুখী করবার জন্য বারবার জীবনের অনিত্যতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। রামমোহনের গানে জীবনের নশ্বরতার যে ভাব প্রকাশ পায় ঈশ্বর গুপ্তের এই কবিতাগুলিতে সেই ধারণাই পুনরাবৃত্ত হয়েছে। অবশ্য জগৎ ও সংসারের নশ্বরতার কথা যে রামমোহনই প্রথম বললেন, তা নয়। আমাদের দেশের লোকসঙ্গীতগুলিতে এই ভাবটি যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। বাউলের গান এবং রামপ্রসাদী গানে এই অনিত্যতার কথা খুবই সাধারণ। রামমোহন আমাদের দেশের মজ্জাগত উদাসীনতাবোধকে অদ্বৈত বেদান্তের ছাঁচে ফেলে নতুন মায়াবাদের সুর শুনিয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তেব পারমার্থিক গানগুলিতে এই নতুন আদর্শের প্রতিধ্বনি আছে। তাঁর গানে পণ্ডিতী দার্শনিকতার ভঙ্গি আছে। যেমন বৈরাগ্য-শতকের অনুকরণে লেখা—

যুবতীর স্তনদ্বয়ে মাংসপিণ্ড সার।
কনক-কলস সহ তুলনা তাহার॥
কফ আর কাসে ভরা নারীর বদন।
চাঁদের তুলনা তায় দেন কবিগণ॥

—হিতমালা

এক কথায় বলতে গেলে ঈশ্বর গুপ্তের বৈরাগ্যসূচক গানগুলিতে শিক্ষিত চেতনার ছাপ আছে। আমাদের প্রচলিত লৌকিক গানগুলি আরো সরল সহজ এবং অনাড়ম্বর। সেজন্য মনে হয় ঈশ্বর গুপ্তের পারমার্থিক কবিতাগুলি ঊনবিংশ

শতাব্দীর নতুন ধর্মচেতনার ফল। তিনি এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে এসে।

বাংলার ধর্মান্দোলনের প্রকৃতি এর পরে কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ যখন রামমোহন-প্রচারিত ধর্মান্দোলনের ভার গ্রহণ করলেন তখনকার ধর্মচেতনার প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,[৫৭]

'রামমোহন রায়ের মনের ভাব কিসে সকল প্রকার পৌত্তলিকতা গিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়। এইজন্য একদিক হইতে যেমন ভারতবর্ষের লোকদিগের বেদান্ত-প্রতিপাদ্য একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন, তেমনি আবার পৃথিবীর সমুদায় লোককে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত করিবার জন্য আর দিক হইতে তিনি কি করিলেন? না বাইবেলকে নিয়ামক বলিয়া তাহাতে যে পৌত্তলিক ভাগ আছে, তাহা পরিত্যাগ-পূর্বক বাইবেল দ্বারাই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা সিদ্ধান্ত করিয়েন। সেই প্রকার কোরাণ দ্বারাই এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিপন্ন করিলেন।'

রামমোহন রায়ের ধর্মবিশ্বাসের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সবই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধর্মের আচার অনুষ্ঠান-ভাগ এক-একটি ধর্মকে সাম্প্রদায়িক চিহ্নাঙ্কিত করে। সেইজন্য দেশাচার-লোকাচারের মতো ধর্মগত সংকীর্ণতাগুলি দূর করতে পারলে ঈশ্বরকে আরো নিকটে পাওয়া যায় মানুষকেও উদারতর দৃষ্টিতে দেখা যায়। ঈশ্বর গুপ্ত বলছেন,

কত কত নদী নদ দেখি কত স্থলে
সকলি মিশেছে গিয়া জলধির জলে ॥
সেইরূপ বাঁকা সোজা নানা পথ আছে।
সকলেই কাছে যাবে আগে আর পাছে ॥
নানারূপ মত বটে, তুমি এক স্থির।
বহুবর্ণ ধেনু যথা শাদা হয় ক্ষীর ॥

—নিবেদন

এই উদার ধর্মচেতনা ঈশ্বর গুপ্তকে পূর্বতন সংকীর্ণ বিশ্বাসের ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে নিয়ে এসেছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনার 'যত মত তত পথে'র বাণীর পূর্বাভাস আছে এই লাইন কয়টিতে। উনিশ শতকের শেষের দিকে যদিও এই চিন্তা সুপরিচিত হয়েছিল, তথাপি ঈশ্বর গুপ্তের যুগে যখন হিন্দু-খ্রীষ্টধর্মের কলহ যথেষ্ট ঘোরালো সেই সময়ে এমন কথা নিশ্চয়ই চমকপ্রদ। বস্তুত ধর্মের

যেগুলি আচারমূলক দিক সেগুলি সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন। বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের বাধাকে অপসারিত করে যথার্থ সত্যকে জানার আগ্রহে তিনি লিখেছিলেন,

লোকাচারে দেশাচারে জাতিপ্রথা ব্যবহারে
নাহি হয় সত্যের প্রকাশ।
সত্যের হইলে দাস এ সকল হয় নাশ
সমাজেতে করে উপহাস॥
সমাজেতে যদি রই সত্য সভা ছাড়া হই
তোমা ছাড়া হতে তবে হয়।
সত্য আর লোকাচার আলো আর অন্ধকার
একাধারে কেমনেতে রয়॥

—তত্ত্ব

সত্য লোকাচারবিরোধী। লোকাচাবে বদ্ধ হলে কখনও সত্যের সাক্ষাৎ সম্ভব নয়। সত্যকার ঈশ্বর-ব্যাকুলতা যার মনে জাগে, সে কি কখনও পূজা হোম জপ প্রভৃতি আচারঅনুষ্ঠানে বদ্ধ হয়? তার চেয়ে এই বিশ্বজগৎ যে ঈশ্বরের লীলা, সেই দিকে চেয়ে যে মুগ্ধ হয়েছে সে কখনই অন্ধ আচার-পালনে বদ্ধ থাকতে পারে না।

পূজা হোম জপ মন্ত্র নাহি জানি বেদ মন্ত্র
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুথি প্রকতি পড়ায়।
কখনো পড়িনি শ্রুতি পেয়েছি যুগল শ্রুতি
শ্রুতির অধীন স্মৃতি স্মৃতি কেবা চায়।

—তত্ত্ব

ঈশ্বরের লীলা পুজার্চনার দ্বারা উপলব্ধি করা যাবে না, প্রকৃতির মধ্যেই সেই লীলানুভূতি ঘটে। এই ঈশ্বরচেতনা বস্তুতই দেবেন্দ্রনাথের। দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় ভ্রমণকালে অরণ্যপ্রকৃতিতেই ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন—

'আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিলমাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম।'[৫৮]

অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় মুগ্ধ নিসর্গপ্রীতির দৃষ্টান্ত তেমন পাওয়া যায় না। উপরের কবিতাংশে 'প্রকৃতি' অর্থে সাধারণ ভাবেই জীবনকেই বুঝিয়েছেন। তা হলেও ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মভাবনায় আমরা দুটি বিপরীত লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।

অনেক কবিতাতেই তিনি জগতের অনিত্যতা এবং শূন্যগর্ভতার কথা বলে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন ; অথচ এখানে তিনি জীবনকে বলছেন ঈশ্বরেরই মহিমাপ্রকাশক— এরই ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের উপলব্ধি সম্ভব।

আমাদের ভারতীয় ধর্মসাধনায় একটাকে বলে জ্ঞানমার্গ, একটাকে বলে ভক্তিমার্গ। জ্ঞানের সাধনায় জগতের বহুবৈচিত্র্য মোহিনী মায়া মাত্র। তার মিথ্যা ছলনা এবং অনিত্যতার ধ্যান করেই সনাতন শাশ্বত সত্যকে জানা সম্ভব। ঈশ্বর গুপ্তের অনেক কবিতাতেই জগতের মায়াময় রূপ, দর্শনশাস্ত্রে প্রচলিত দৃষ্টান্ত ও যুক্তিতে প্রকটিত। বাইরের জগৎ যেন ঈশ্বর-ব্যাকুল মনটিকে বদ্ধ করতে না পারে সেজন্য কবি বারবার জগতের ক্ষণস্থায়িত্বের কথা স্মরণ করছেন। এতে বৈরাগ্যের সুর প্রবল।

আর ভক্তিমার্গে ঈশ্বরকে স্রষ্টারূপে অনুভব এবং জগতের বৈচিত্র্যে তাঁরই লীলার অনুভূতি ভক্তের মনকে রসে পূর্ণ করে। এই জগৎকে মিথ্যা এবং রসবর্জিত মনে হয় না। তখন জগতের প্রতি প্রীতিতে মন অভিষিক্ত হয়—

প্রীতি যদি রাখ তুমি জগতের প্রতি।
করিবে তোমায় প্রীতি জগতের পতি॥
ঠক্ ঠকে ঠোকে যাবে আয়ু ফুরাইলে।
কি হইবে মিছামিছি, মালা ঘুরাইলে॥
হৃদয় পবিত্র নহে, কিসে রবে সুখে।
না বুঝিয়া পরিণাম, হরিনাম মুখে॥

—পরমার্থ

ঈশ্বর গুপ্তের পারমার্থিক কবিতায় এই দুই দিকই আছে, যদিও অদ্বৈতবাদী চিন্তাই প্রধান হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু ভক্তিবাদী ধর্মবিশ্বাস ঈশ্বর গুপ্তের দৃঢ় ছিল তাতেও সন্দেহ নেই। তাঁর জাতিপ্রেম দেশবাৎসল্য এই ভক্তিবাদী চিন্তাধারারই পরিণাম।

ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মবোধে এই দুই লক্ষণ থাকলেও তাঁর রচনায় হয়তো পরিপূর্ণ সমন্বয় হয় নি। কিন্তু এ-সমন্বয় রামমোহন-পরবর্তী বাংলার ধর্মচেতনায় ঘটেছে। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা ছিল মূলত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে উপাসনা আবার নিরাকার ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি তাঁর ধর্মসাধনার বৈশিষ্ট্য। তিনি আত্মজীবনীতে নিজেই বলেছেন,

'ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ, এইটি ব্রাহ্মধর্মের প্রাণ। যখন

শঙ্করাচার্যের শারীরক মীমাংসা বেদান্তদর্শনে ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত দেখিলাম, তখন আর তাহাতে আমাদের আস্থা রহিল না।'

যদিও উপাস্যকে তিনি কোনো প্রতিমার রূপ দিয়ে কল্পনা করেন নি, তথাপি ভক্তিনিবেদনের আশ্রয়রূপেই তিনি ভক্তের চিত্তকে অধিকাব করেছেন। দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদের সমন্বয়ে যে-ধর্মচেতনার উদভব বস্তুত উনিশ শতকের হিন্দু-ধর্মান্দোলনগুলি তারই বিশিষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের কাছে এ বস্তু সম্পূর্ণ অভিনব ছিল না। তিনি সাধক রামপ্রসাদের ভক্ত। রামপ্রসাদের ধর্ম-সাধনার কথা বলতে গিয়ে তিনি ব্রাহ্মমতের সঙ্গে তাঁর ধর্মমতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। রামপ্রসাদের ধর্মভাবনাতেও ভক্তিবাদ এবং অদ্বৈতবাদের মিশ্রণ। ঈশ্বর গুপ্তের একটি রচনাতে রামপ্রসাদী ধর্মভাবনার চমৎকার উদাহরণ আছে—

শিব রাধা তারা রাম   বীজ ঐক্য ভিন্ন নাম
শ্যামা শ্যাম আকারের ভেদ॥
তুমি শ্যাম তুমি শ্যামা   আকার আকারে বামা
একাকারে একাকারে লয়॥

—মহাকালীর স্তব

রামপ্রসাদী ধর্মভাবনার সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মভাবনার মিল বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ ভাবেই দেখিয়েছেন; পরমার্থবিষয়ক কবিতা আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরাও পূর্বে এর বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছি।

ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মভাবনার যে বিশেষত্ব আমরা এখানে লক্ষ্য করলাম, তাঁর সবশেষ রচনা বোধেন্দুবিকাশ নাটকখানাই তার পূর্ণ প্রতীক। বোধেন্দুবিকাশ নাটকটি অনেক দিক দিয়েই বিশেস স্মরণীয়। এতে ঈশ্বর গুপ্তেব ভাষা ও ছন্দের আশ্চর্য কলানৈপুণ্যের পরিচয় আছে। বোধেন্দুবিকাশ বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

বোধেন্দুবিকাশ নাটকটি কৃষ্ণমিশ্র-রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের (একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত) অনুবাদ। এটি একটি আধ্যাত্মিক রূপক নাটক। এতে মন প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মোহ বিবেক কাম রতি ক্রোধ হিংসা অহংকার দম্ভ লোভ তৃষ্ণা মিথ্যাদৃষ্টি ক্ষমা সন্তোষ বস্তুবিচার ভক্তি প্রভৃতি বহু চরিত্রের সমাবেশ আছে। প্রথম অঙ্কের নাম সংসারাবতারঃ। কাম-রতির সংলাপের দ্বারা নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পরমাত্মার ও মায়ার এক পুত্র মন। মনের দুই পত্নী প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির কুলে জন্ম মহামোহের। নিবৃত্তির

কুলে জন্ম বিবেকের। এই দুই কুলে সর্বদাই শত্রুতা। শত্রু ধ্বংস করে উপনিষৎ দেবীর সাহায্যে প্রবোধের উৎপত্তি এই নাটকের বিষয়। বিবেক এবং তার পত্নী মতির সংলাপে নাটকের আসন্ন ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অঙ্কের নাম মহামোহপ্রধানঃ। এই অঙ্কে মহামোহের দম্ভ অহংকার এবং চার্বাক প্রভৃতি সহচরদের বিবরণ এবং তাদের সাহায্যে যুদ্ধোদ্যম। মহামোহের অনুচরের নাম ক্রোধ লোভ বিভ্রমাবতী মিথ্যাদৃষ্টি তৃষ্ণা প্রভৃতি। সাত্বিকী শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি বিষ্ণুভক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে মহামোহের বিপক্ষতা আচরণ করছে। এই অঙ্কে দুই দলের পরিচয় পাওয়া গেল। তৃতীয় অঙ্কের নাম পাষণ্ডবিডম্বনঃ। এই অঙ্কে শান্তি ও করুণা শ্রদ্ধার সন্ধানে বেরিয়েছে। পথে জৈন বৌদ্ধ শৈব শাক্ত প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের উপাসকদের সাক্ষাৎ পেয়েছে, কিন্তু কোথাও শ্রদ্ধাকে পায়নি। তবে তাদের কথায় বুঝতে পারল যে সাত্বিকী শ্রদ্ধা বিষ্ণুভক্তি দেবীর সঙ্গে মহাত্মাদের হৃদয়ে বাস করছেন। চতুর্থ অঙ্কের নাম বিবেকোদ্‌যোগঃ। এতে বিবেকের অনুচরদের পরিচয় পাওয়া যায়। মীমাংসানুগতা মতি, বস্তুবিচার, বস্তুবিবেক, ক্ষমা সন্তোষকে নিয়ে বিবেক বারাণসীতে যুদ্ধযাত্রায় প্রবৃত্ত। পঞ্চম অঙ্কের নাম বৈরাগ্যোৎপত্তিঃ। শ্রদ্ধা শান্তি এবং বিষ্ণুভক্তির সংলাপে যুদ্ধে মহামোহের পরাজয়। মন সরস্বতী ও বৈরাগ্যের কথোপকথন। ষষ্ঠ অঙ্কের নাম জীবন্মুক্তি। রিপুদমনের পর বিবেকের তত্ত্ববিচার এবং উপনিষৎ দেবীর সাক্ষাৎকার এবং প্রবোধচন্দ্রের উদয়।

ঈশ্বর গুপ্ত বোধেন্দুবিকাশ নাটকে কাহিনী ঠিকই রেখেছেন, শুধু সংলাপে যথাযথ পরিমাণ রক্ষা করতে পারেন নি, গদ্যে পদ্যে বিস্তৃত করেছেন। ফলে বহু রচনা অতি দীর্ঘ. অযথা পুনরুক্তি-দোষ কণ্টকিত, আবার বহু রচনা ভাষায় ছন্দে অত্যন্ত উপভোগ্য। কিছু কিছু পার্শ্ব-চরিত্রও ঈশ্বর গুপ্তের নিজস্ব কল্পনা। কিন্তু এই নাটকে এমন একটি বিশিষ্ট ধর্মচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে যা ঈশ্বর গুপ্তেরই বৈশিষ্ট্যবাচক।

জনৈক সমালোচক প্রবোধচন্দ্রোদয়কে বলেছেন attempts to synthesise Advaita Vedanta with Visnubhakti.[৫৯] এতে বিভিন্ন ধর্মসাধনার মধ্যে ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও জয় দেখানো হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ধর্মচর্চাকে এতে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বেদান্তদর্শনের সাহায্যে বিষ্ণুভক্তির করুণায় প্রবোধোৎপত্তি বৈদান্তিক পন্থায় ভক্তিবাদেরই মাহাত্ম্য। এই জন্যই এই প্রবোধচন্দ্রোদয় উনিশ শতকীয় যুগমানসের অনুকূল হয়েছিল।[৬০] ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মগত মনোভাবও এই

দার্শনিক ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। এই নাটকখানাকে অনুবাদ করতে সেই জন্যই তিনি প্রণোদিত হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে সংবাদপ্রভাকরের বহু কবিতায় এবং প্রবোধপ্রভাকরে তিনি পরমার্থবিষয়ক যে সব রচনা লিখেছিলেন, সেই সব পূর্ব-প্রকাশিত বহু রচনাকে তিনি বোধেন্দুবিকাশ নাটকে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এতে বোঝা যায় বোধেন্দুবিকাশের আধ্যাত্মিক ভাবটি তাঁর মনে আগেই সঞ্চিত ছিল। 'আত্মজ্ঞান' অর্থে 'প্রবোধ' কথাটি তিনি অনেক কবিতাতেই ব্যবহার করে আসছিলেন। 'বোধেন্দুবিকাশ' ঈশ্বর গুপ্তের শুধু সাহিত্যিক মনের সৃষ্টি নয়—এ তাঁর দার্শনিক এবং ধর্মভাবনারও সৃষ্টি। অক্ষয় দত্তের বাহ্যবস্তু অনুবাদ হলেও একে যেমন তাঁর নিজস্ব চিন্তা বলেই গ্রহণ করি, বোধেন্দুবিকাশ তেমনি অনুবাদ হলেও ঈশ্বর গুপ্তের নিজস্ব ধর্মভাবনার অভিব্যক্তি বলেই গণ্য হওয়া উচিত।

১ বঙ্কিমরচনাবলী, বিবিধ 'ঋতুবর্ণন'

২ বঙ্কিমরচনাবলী, বিবিধপ্রবন্ধ, 'উত্তরচরিত'

৩ 'ঋতুবর্ণন' বঙ্কিমগ্রন্থাবলী বিবিধ খণ্ড (সাহিত্য পরিষৎ)

৪ সাহিত্যের বিচারক, ১৩১০ দ্র সাহিত্য।

৫ 'The more trivial sort imitated the actions of meaner persons, at first composing satires .' *Poetics* IV, 7

৬ 'Satire is after all not poetry at all—not noble enough—just words put together in verse though they might as well be in prose.' W. K. Wimsatt and C. Brooks, *Literary Criticism*, Indian edition, 1964 p 86

৭ *Epilogue to Satire*

৮ 'বাঙ্গালা ভাষা' ১২৮৫, বিবিধপ্রবন্ধ ২য় ভাগ

৯ পুরাতন প্রসঙ্গ, বিদ্যাভারতী সংস্করণ ১৩৭৩ পৃ ৫১

১০ দ্রষ্টব্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধ, বঙ্গভাষার লেখক, ১৩১১ ; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বাঙ্গলা সাহিত্য' প্রবন্ধ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত হরপ্রসাদ রচনাবলী প্রথম খণ্ড ১৯৫৬ ; প্রমথ চৌধুরী, 'বঙ্গসাহিত্যের পরিচয়' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৪। সাম্প্রতিক কালে অজিত দত্ত, 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস', ১৯৬০।

১১ রমেশচন্দ্র দত্ত ঈশ্বর গুপ্তকে স্যাটারিস্ট বলেছেন। দ্র. The Literature of Bengal, chapter XIV.

১২ দ্রষ্টব্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী।

১৩ দ্রষ্টব্য বিভিন্ন আলোচনা, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, পৃ ৩০৪-৩১৭

১৪ সা-বা-স, ঐ, পৃ ৩৫০-৩৬১

১৫ 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধ ১৩৪১। দ্র ছন্দ ১৯৬২, পৃ ১৩১

১৬ দ্র নবজীবন ২য় ভাগ, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯২।

১৭ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতা-সংগ্রহে' এই কবিতাটি নেই।

১৮ ঈশ্বর গুপ্তের চারটি আগমনী গান 'বাঙ্গালীর গান' এবং 'গীতরত্নমালা'য় সংগৃহীত আছে। বা-গা পৃ ২৭২, ২৭৩, ২৭৪।

১৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গ্রাম্য সাহিত্য'-প্রবন্ধ, লোকসাহিত্য

২০ পূর্বে উদ্ধৃত। দ্র. পৃ ১২৫

২১ ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহে দ্বিতীয় পংক্তিটি নেই। দ্র. কবিজীবনী, পৃ ৩৩৬

২২ নবজীবন ২য় ভাগ ভাদ্র ১২৯২, পৃ ১২৬-১২৭

২৩ বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, বিদ্যাভারতী, ১৩৭৩ পৃ ৬১

২৪ দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'কখনও কোথাও আমার লেখার মধ্যে বিদেশী হাবভাব idiom তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মনে যদি এমন কোন ভাব উদিত হয়, যাহা প্রকাশের উপযুক্ত খাঁটি দেশী ভাষায় প্রকাশ করা যায়— তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী idiom-এর অনুবাদ করিতে যাইব কেন?' —পুরাতন প্রসঙ্গ

২৫ দ্র. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'কবি রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র', অমৃত, ৩০এ ভাদ্র, ৬ই আশ্বিন, ১৩ই আশ্বিন ১৩৭৩।

২৬ দ্র হরপ্রসাদ মিত্র-সম্পাদিত রবীন্দ্রচর্চা ১৯৬১, 'ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক-পৌষ এবং মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩, 'ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র' প্রবন্ধ।

২৭ এই কবিতাটি ছয় মাত্রার সরল কলামাত্রিকের মতো শোনায়। বস্তুত কবিতার অন্য অংশ মিশ্রকলামাত্রিক পদ্ধতিতে রচিত; এখানে অজ্ঞাতসারে রুদ্ধদল দুই মাত্রা ধরা হয়েছে।

২৮ লালমোহন বিদ্যানিধির কাব্যনির্ণয়ে (নবমসং) বিনোদিনী এবং গৌরবিণী ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে। গৌরবিণী ঈশ্বর গুপ্ত থেকে নেওয়া।

২৯ মানসিংহ কাব্যে এবং বিদ্যাসুন্দরে এর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। এক-একটি অধ্যায়ের গোড়াতে ছাড়াও মালিনী নিগ্রহ, বিদ্যার আক্ষেপ, মানসিংহের যশোর যাত্রা, মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ, মজুন্দারের রাজা প্রভৃতি বহু কবিতা দ্রষ্টব্য।

৩০ বিশ্বভারতী পত্রিকা পূর্বোক্ত সংখ্যা।

৩১ এই প্রসঙ্গে বলদেব পালিতের (১৮৩৫—১৯০০) 'কবিতার জন্ম' নামক একটি কবিতার (কাব্যমঞ্জরী, ১৮৬৮) বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ।—

শতাব্দী হলো লঙ্ঘন কৃষ্ণচন্দ্র ভূ-ভূষণ
বঙ্গরাজ্যে আনিলা আমায়;
আমা হৈতে সদাশয় লভিলেন কবিদ্বয়
প্রসাদ ভারতচন্দ্র রায়।
তারি কিছুকাল পর মদন কবীশ্বর
নির্মাণ করিল সে অনল
কাল কিন্তু বাদ করি আবার তাদিগে হরি
করিয়াছে অন্তর বিকল।

কালিদাসের পর ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ-মদনমোহন-ঈশ্বর গুপ্তের নামাবলী নিশ্চয়ই সার্থক কাব্যশিল্পী বলে মনে এসেছিল।

৩২ কবিতাসংগ্রহ পৃ ১১৪, নীলকর বিষয়ক পঞ্চম গীত

৩৩ শিবনাথ শাস্ত্রী 'ছায়াময়ী-পরিণয়ে' ১৮৮৯ এবং হেমচন্দ্র ব্যঙ্গকবিতায় এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দু-জায়গাতেই কবিরা দোলায়মান।

৩৪ ভারতী ১২৯০ শ্রাবণ। দ্র ছন্দ, ১৯৬২ 'বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ'।

৩৫ সমগ্র গানটি বসুমতী-সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে পৃ ৮৫, সঙ্গীত ১ নামে সংকলিত আছে। বোধেন্দুবিকাশের চতুর্থ অঙ্কেও গানটি সন্নিবিষ্ট।

৩৬ দ্র. আধুনিক সাহিত্য, 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ। প্রথম প্রকাশ ১৩০১ বৈশাখ।

৩৭ দুটি গানই বোধেন্দুবিকাশ নাটকে (৩য় অঙ্ক) রাজসী শ্রদ্ধার গান।

৩৮ প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ছন্দশিল্পী রামপসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র', বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৭৩, পৃ ১৫৬

৩৯ 'বোধেন্দুবিকাশ' নাটকটিব তিনটি মাত্র অঙ্ক ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশ করেন। কবিতা দুটি তাতে আছে। এই নাটকটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরিবারে ঔৎসুক্য ছিল বলে মনে হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে এব কিছু অংশ অভিনয় করানোর চেষ্টার কথা আছে। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ প্রবোধচন্দ্রোদয় অনুবাদও করেছিলেন।

৪০ প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' ১৩৫২, পৃ ২০৭

৪১ প্রবোধচন্দ্র সেন দোঁহাটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। দ্র. জগদীশ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'কবি ও কাব্য' পত্রিকা ৩য বর্ষ ৫ম সংখ্যা শ্রীপঞ্চমী ১৩৭৪।

৪২ মোহিতলাল মজুমদার, বাংলা কবিতার ছন্দ ১৩৫২ পৃ ১২৬

৪৩ Priyaranjan Sen, *Western Influence in Bengali Literature* 3rd ed, 1966 p. 122.

৪৪ কবিজীবনী পৃ ১১৫-৬

৪৫ বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ পৌষ। প্রভু গুহঠাকুরতা এই সময়ের Bengali Symbolist Movement-এর উল্লেখ করেছেন। দ্র. *Bengali Drama* London 1930, p 219

৪৬ দ্র বর্তমান লেখকের 'রূপকের ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ' বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা।

৪৭ বঙ্কিমরচনাবলী, বিবিধপ্রবন্ধ, 'ভারতকলঙ্ক'।

৪৮ Calcutta Review, 1845 'Rammohan Roy', কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে *The Mutiny, the Government and the People*—By a Hindu নামে একটি বইতে ইংরেজ রাজত্বকে সমর্থন করেন। এ ব্যাপারে তিনি হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রের সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কেই সমর্থন করেছিলেন। দ্র. মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র, ১৩৩৩, পৃ ১১৬

৪৯ সনেটটির নাম To India—My Native Land। দ্রষ্টব্য F. B Bradley-Birt, *Poems of Henry Louis Vivian Derozio*, 1923 p 2

৫০ Friend of India October 14, 1841

৫১ বর্তমান লেখকের *Bankimchandra and the Growth of Indian Nationalism* প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। দ্র. Bulletin of the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, February 1967.

৫২ কবিজীবনী, ১৯৫৮, পৃ ৩৪৪-৪৫

৫৩ সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ ১২৫৫, ১২ এপরিল ১৮৪৮। সংশ্লিষ্ট কবিতাটি ৩০ জুন ১৮৫২ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

৫৪ নবীনচন্দ্র সেন বলেছিলেন, 'আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিবার পূর্বে স্মরণ হয়, স্বদেশপ্রেমের নামগন্ধ বাংলার কাব্য কি কবিতায় ছিল না'। দ্র আমার জীবন ২য় ভাগ ১৩১৬ পৃ ১৭৫। নবীনচন্দ্রের এই উক্তি একেবারেই ঠিক নয়।

৫৫ ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন শ্রীত্রিপুরাশংকর সেন শাস্ত্রী। দ্র. অমৃত ২০ আশ্বিন ১৩৭৩। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মমতের অসম্পূর্ণতার দিকগুলি দেখিয়েছেন।

৫৬ সংবাদপ্রভাকর ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮

৫৭ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬০, পৃ ২৩।

৫৮ আত্মজীবনী, পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

৫৯ Dr. S. K. De, *History of Sanskrit Literature*, Calcutta University 1947, p. 483.

৬০ ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকটি বহুপ্রচলিত ছিল। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' নামে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহেশ্বরের টীকা সহ ১৮৩১-এ সম্পাদনা করেন। বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন ১২৪৬ বঙ্গাব্দে এর অনুবাদ করেন। গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন ১৮৫২-তে এই নাটকটি বঙ্গানুবাদসহ বের করেন। এ ছাড়া লাইপজিগ থেকে ব্রখাউস লাটিন ভূমিকাসহ এক সংস্করণ বের করেন ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। টেলর ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে এর এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। বাংলা দেশের বাইরে অন্যান্য অঞ্চল থেকেও বের হয়।

বাংলায় আদ্যানাথ বিদ্যাভূষণ (১৩০০) এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩০৮) এর অনুবাদ করেন। প্রবোধচন্দ্রোদয় ও বোধেন্দুবিকাশের প্রভাব দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণেও (১৮৭৫ খ্রী) পড়েছিল। দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের কাব্যবাণী ১৯৬৭।

মূল প্রবন্ধের কয়েকটি টীকা

পৃ ২

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বর্তমান গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় গোপালচন্দ্রের বংশপরিচয় সম্বন্ধে যা অনুমান করেছিলাম, সেগুলি ঠিক নয়। পরে তাঁর সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া গিয়েছে—

গোপালচন্দ্রের পিতার নাম উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১২৬৯, ৮ই আষাঢ় বালাখানা স্ট্রীটে (বর্তমান গ্রে স্ট্রীটে) মাতুলালয়ে গোপালচন্দ্রের জন্ম। তাঁর মাতামহ নীলরত্ন হালদার বাংলা সাময়িকপত্রের প্রথমযুগের বিখ্যাত বঙ্গদূতের (১৮২৯) সম্পাদক এবং গীতিকার ছিলেন। গোপালচন্দ্রের পূর্বপুরুষ 'ফুলে-বেলগড়ে'র (নদীয়া) অধিবাসী।

গোপালচন্দ্র ১৮৮৪ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদক ছিলেন। তিনি হালিশহর পত্রিকারও (১৮৭২-৭৩) বিশিষ্ট লেখক ছিলেন।

শোভাবাজার-নিবাসী ঔষধব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পালের একটি জীবনীও গোপালচন্দ্র প্রকাশ করেন ১৩২৬ সালে। উভয়ে আজীবন সুহৃদ ছিলেন।

সংবাদ হারাণচন্দ্র রক্ষিত-লিখিত বঙ্গভাষার লেখক রচনা (জন্মভূমি ১৩০৩ ভাদ্র) থেকে সংগৃহীত।

পৃ ৬

'I lisped in numbers......'

পোপের Satires থেকে নেওয়া।—

> As yet a child, nor yet a fool to fame
> I lisp'd in numbers, for the numbers came.
>
> —Prologue

পৃ ৭

'জন ষ্টুয়ার্ট মিলের......'

জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম অধ্যায়ে কথাটা বলেছেন, 'I have no remembrance of the time when I began to learn Greek, I have been told that it was when I was three years old.' আট বৎসর বয়সে মিল ল্যাটিন শেখেন।

পৃ ৮

'কহিতে পার না কথা...' নির্গুণ ঈশ্বর কবিতা থেকে সংকলিত।

পৃ ৮

মতিশীলের গল্প

দ্র. Kissory Chand Mitra, '*Life of Mutty Lal Seal*, 1869.

পৃ ১০

মহেশা পাগলা

'বালককালে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র মহেশচন্দ্রের সঙ্গে সর্বদাই কবিতার লড়াই হইত। বাস্তবিক মহেশচন্দ্র একজন সুকবি ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র একদিন ঠাট্টা করিয়া তাঁহাকে বলেন "দাদা! লেজ লুকালে কেন?" মহেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—

ওরে দুই ভাইয়ের দুই থাকলে লেজ
থাকত না সংসার।
একে তোমার লেজে গেছে মজে
সোনার লঙ্কা ছারখার।

তদবধি ঈশ্বরচন্দ্র মহেশকে বড় ভক্তি করিতে লাগিলেন। মহেশ এক সময় প্রতিজ্ঞা করেন, ঈশ্বরচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতে তিনি কলম ধরিবেন না। সকলেই তাঁহাকে "মহেশা পাগলা" বলিত।

মৃত্যুর পর তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র প্রভাকরের সম্পাদক হন। এই সময় সেই মহেশচন্দ্র দুঃখ করিয়া লেখেন—

সাত মেড়োতে জড়ো হয়ে নষ্ট করলে প্রভাকর।
জন্মে কলম ধরে নি কো রাম হল এডিটর॥
আগা পাছা বাদ দিয়ে শ্যাম হল কমাণ্ডর॥

—বিশ্বকোষ, ২য় ভাগ 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত'

পৃ ১১

'মানভঞ্জন নামক কাব্য'

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী, ১ম ও ২য় ভাগ একত্রে, (বসুমতী) ১৬৭—১৭৬ পৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত। কবিতাটি ১৮৫৪, ১৪ই জুনের সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত হয়।

পৃ ১৮

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ উদারপন্থী সম্পাদক ছিলেন। নব্যবঙ্গদের মুখপত্র বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁর সম্পর্কে সাহিত্যসাধকচরিতমালায় 'গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ' এবং বিনয় ঘোষের সংবাদভাস্কর সংকলন—সাময়িক পত্রে সেকালের সমাজচিত্র, তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

পৃ ১৯

'লং সাহেব ও অশ্লীলতা নিবারণ আইন'

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে মিঃ পীকক, সার জেমস কলভিল, মিঃ গ্রাণ্ট, মিঃ এলিয়ট এবং সার আরথার বুলারকে নিয়ে গঠিত সিলেকট কমিটি অশ্লীলতা নিবারণের আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন (Report of the Select Committee on the Penal Code prepared by the Indian Law Commission dated 6 December, 1856 embodied in Legislative Department Papers on the Act XLV of 1860, p. 708)।

সিলেকট কমিটির সদস্যদের সঙ্গে লঙ্‌ সাহেবের সাহিত্যে অশ্লীলতা-নিবারণ সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের কোনো কথা হয়েছিল কিনা তার লিখিত প্রমাণ পাই নি। তবে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'Act 1 of 1856'-এ অশ্লীলতা নিবারণের উদ্দেশ্যে আইন লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অব ইনডিয়া পাশ করেন, এবং একুশে জানুয়ারি ১৮৫৬ তে গভর্নর জেনারেল তাতে সম্মতি দেন। আইনের প্রয়োজনীয় অংশ—

An ACT to prevent the Sale or Exposure of obscene Books and Pictures.

Whereas the practice of offering for sale or exposing to public view obscene books and pictures encourages immorality and it is expedient to make provision for the prevention of such practice : It is enacted as follows.

1. Whoever, within the territories in the the possession and under the Government of the East India Company, in any shop, bazar, street, thoroughfare, high road, or other place of public resort, distributes, sells, or offers, or exposes for sale or wilfully exhibits to public view, any obscene book, paper, print, drawing, painting or representation ; or signs, recites or

utters any obscen song, ballad or words to the annoyance of others ; shall, upon conviction, as hereinafter provided, before a Magistrate, be liable to a fine not exceeding 100 rupees, or to imprisonment, with or without hard labour for a period not exceeding three months, or to both.

লক্ষ্য করবার বিষয় আইনে অশ্লীল পত্র পত্রিকা চিত্রের সঙ্গে অশ্লীল গান গাথা প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রসরাজ প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে খেউড় জাতীয় গানও নিশ্চয় এর উদ্দিষ্ট।

পৃ ২২

'রামনিধি সেন' (নিধুবাবু)

বঙ্কিম ভ্রমক্রমে 'রামনিধি সেন' লিখেছেন, আসলে রামনিধি গুপ্ত।

'বাঙালী জাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগী'—ঈশ্বর গুপ্ত কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্তের (১২৬২-১৮৫৫) ভূমিকায় লেখেন,

'ইহার পূর্বে কোন মহাশয় এতদ্দেশীয় কোন কবির জীবনচরিত প্রকাশ করেন নাই,—এবং এতৎ প্রকাশের কি ফল তাহাও কেহ জ্ঞাত হয়েন নাই—আমরা প্রথমেই ইহার পথপ্রদর্শক হইলাম'।—কবিজীবনী, পৃ ৩৩৪

পৃ ২২

'ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ'

বস্তুতঃ ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত ঈশ্বর গুপ্তের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক নয়। প্রথম পুস্তক রামপ্রসাদের কালীকীর্তন। এ-সম্বন্ধে আলোচনা 'রচিত গ্রন্থ' অধ্যায়ে করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের রচিত বলে কথিত 'কলি নাটক'টির উল্লেখ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এর সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বঙ্গভাষার ইতিহাসে (১৮৭০) এবং হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থে সংকলিত ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীতে বইটির উল্লেখ করেছেন। সুশীলকুমার দে History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1962 গ্রন্থেও ('the fragment of a dramatic attempt entitled Kali-natak, ···written in prose and verse', পৃ ৫৭১) এর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি এর আখ্যাপত্রের কোনো পরিচয় দেন নি। সাহিত্যসাধকচরিতেও ব্রজেনবাবু এর কোনো উল্লেখ করেন নি। বইটি কোথাও পাই নি। বোধেন্দুবিকাশ নাটকে

অবশ্য 'কলি'র অল্পক্ষণস্থায়ী অবতারণা আছে। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে এই চরিত্রটি নেই।

পৃ ২৫

'রহস্য ও ব্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় সহচর ছিল।'

এ বিষয়ে দুটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। একটি তাঁর বাল্যরচনা। এই রচনাটি দীনেশচন্দ্র সেন ঈশ্বর গুপ্তের ঘনিষ্ঠ পরিচিত উমেশচন্দ্র পরামাণিকের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছেন। ছড়াটি 'শ্রীবাস ঈশ্বর গুপ্ত' প্রবন্ধে (বঙ্গবাণী, ১৩২৯, বৈশাখ) প্রকাশ করেন।

হায় কি আশ্চর্য্য কাণ্ড যত সব ঘোর পাষণ্ড
কর্ম্মকাণ্ডে দিয়া বিসর্জ্জন।
বলেন 'মরা গরুর কাটি ঘাস' ব'লে করেন উপহাস
ভাবেন আমি বড় বিচক্ষণ।
পড়ে পাতাদুই ইংরেজী বই সদা ঐ কথা কই
বাঙ্গালা কথা কন না আর মুখে।
বসেন না ব্যতীত চেয়ার সদাই মুখে ড্যাম শূয়ার
সভ্য হন শহরেতে থেকে।
হয় যদি যথার্থ বিদ্যে তাহলে তার মনোমধ্যে
কুসংস্কার কদাপি থাকে না।
অল্প বিদ্যা হলে পরে অত্যন্ত যাতনা বাড়ে
অহঙ্কারে মৃত্তিকায় পা দেন না।
আহার করেন পায়ে জুতো পৈতাকে বলেন সামান্য সুতো
... ...
ভাবেন আমি জ্ঞানে পরিপক্ক বাপের সঙ্গে নাই সম্পর্ক
* * লয়ে করেন কাল যাপন
বাবুর কালিয়া কোপ্তা তৈরী হল বাবুর্চিতে লয়ে এল
খেতে বসেন এয়ার ছত্রিশ জেতে।
এখন হয়েছে চাল লাগে না দিশী ভাল
আসনে বসেন না ভোজন করতে।
বলেন ব্যঞ্জনেতে থাম্‌চে থাম্‌চে পরিশ্রমে গা ঘাম্‌চে
চাম্‌চে হলে সুবিধা হয় খেতে॥

রাজনারায়ণ বসু বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য (সম্বৎ ১৯৩৫), পৃ ৩২ বইতে লিখেছেন 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রহস্যজনক কবিতাতে অদ্বিতীয় ছিলেন। গরীব যে আমি আমার সম্বন্ধে তিনি এক কবিতা লেখেন, তাহাতে এই বাক্য আছে—'বেকন পড়িয়া করেন বেদের সিদ্ধান্ত'।

'পুরাতন প্রসঙ্গে'র দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবীণ নাট্যাচার্য রাধামাধব কর স্মৃতিকথা-প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন। কোনো বড়োলোকের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হলে তাঁকে একটি থেলো হুঁকায় তামাক দেওয়া হয়েছিল। সে হুঁকাও আবার সছিদ্র। কবির দল গান আরম্ভ করবার আগে ঈশ্বর গুপ্ত এই গানটি গাইতে বলেন—

নাইক আর তেলের কেঁড়ে
এখন বেড়ে তেতালা
পেয়ে রামগোপালের গোপাল দাদন
বেড়েছে খুব বোলবোলা।
এরা ছিল নড়ী বেচত চুড়ী
হিঁদুর বাড়ী যেত না।
এখন বাড়ছে rank পাচ্ছে thank
ট্যাঁকে ব্যাঙ্কনোট ধরে না!
কবির হাতে থেলো হুঁকো
বাবুর সামনে আলবোলা॥

পৃ ২৬

'এক দুই তিন চাবি ছেড়ে দেহ ছয়'

এই লাইন কয়টি 'পাঁটা'-কবিতার অন্তর্গত।

এর টীকা বঙ্কিম-কৃত। কবিতাসংগ্রহে এর শেষ দুই লাইনের পাঠ কিছু ভিন্ন—

পাত্র হোয়ে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি চাটি।
ঝোলমাখা মাস নিয়া চাটি কোরে চাটি॥

কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নে এবং গ্রন্থাবলীতেও (১ম ও ২য় একত্রে) কবিতাসংগ্রহের পাঠ।

পৃ ২৬

'যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়'

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য স্মৃতিকথায় বলেছেন, 'তিনি নিজে কোথাও গান বড়

একটা গাহিতেন না, তাঁহার গলাটাও ভাঙ্গা ভাঙ্গা গোছ ছিল। কিন্তু সেকালে তাঁহার গান বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত।'

বঙ্কিমজীবনীতে শচীশ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ভিটা দেখতে যান। সেখানে বসে চোখের জল ফেলেন।

পৃ ২৬

দ্বারকানাথ অধিকারী

তিনি কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ছিলেন। 'সুধীরঞ্জন' নামে তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। অল্প বয়সেই মারা যান। তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পৃ ২৯

'মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে'—'নীলকর' সম্বন্ধীয় তৃতীয় গীত।

'বধুর মধুর খনি…'—পৌষ-পার্বণ

'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী…'—ইংরাজী নববর্ষ

'সিন্দুরের বিন্দুসহ…'—পূর্বোক্ত কবিতা

'তুমি মা কল্পতরু ‥' —নীলকর সম্বন্ধীয় প্রথম গীত। কবিতাসংগ্রহের বানান 'রাঙা' এবং 'ভাঙে'।

'যখন আসবে শমন…'—দুর্ভিক্ষ প্রথম গীত।

'গুরু গুরু গুম গুম…'—ইংরাজী নববর্ষ

'তেড়া হোয়ে তুড়ি মারে…'—বড়দিন। কবিতাসংগ্রহে 'গাঙে'।

'কষিত কনক কান্তি…'—এণ্ডাওয়ালা তপস্যামাছ। এই কবিতাটি কবিতাসংগ্রহে সংকলিত হয় নি। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের সংস্করণে নাম শুধু 'তপ্‌সী মাছ'।

পৃ ৩৪

'চোর কবি, চোর পঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া…'

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সুন্দর ধরা পড়লে

চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া॥

অতঃপর

দুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায়।
বুঝিবে পণ্ডিত চোর পঞ্চাশী টীকায়॥

ভারতচন্দ্র বিহ্লন-রচিত চোর-পঞ্চাশতের পঞ্চাশটি শ্লোক কালীপক্ষে ও বিদ্যা-পক্ষে দ্ব্যর্থ ব্যাখ্যা করে বাংলায় অনুবাদ করেন। কিন্তু হরিমোহন সেনগুপ্ত ভারতচন্দ্র রায় প্রবন্ধে বিবিধার্থসংগ্রহ (১৭৭৬ শক জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৬২-৬৪) বলেন অধুনা পূর্ণচন্দ্রোদয় ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকে চোর-পঞ্চাশত নামে একখানা পুস্তক অন্নদামঙ্গলের মধ্যে প্রবেশিত হইয়াছে। এ দেশের লোকের রচনার গুণ-দোষ বিচার শক্তির অভাবে তাহাকেও অনেকে ভারতচন্দ্র কর্তৃক প্রণীত বলিয়া কল্পনা করেন। কিন্তু রায়গুণাকর চোর-পঞ্চাশত কাব্যের কতিপয় শ্লোক-মাত্র অনুবাদ করেন এবং তাহাও একার্থক মাত্র।' বঙ্কিমচন্দ্র এই লেখাটি দেখে থাকবেন। সেইজন্য এখানে স্পষ্টত ভারতচন্দ্রকে রচয়িতা বলে উল্লেখ করেন নি।

'উৎসবগুলি অশ্লীল'

সেকালের আমোদপ্রমোদ সম্পর্কে 'কবিজীবনী' গ্রন্থের পৃ ৪১৭-৪১৮ দ্রষ্টব্য। নবমীর রাত্রির কাদাখেউড়ের সময় নবদ্বীপের রাজা এবং রাজপুত্রেরা স-কার ব-কারের খেউড রচনা কবতেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন কৃষ্ণচন্দ্র নবকৃষ্ণ প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই এই খেউড়ের প্রবর্তন ও প্রচলন করেন।

'যাত্রার সঙ'

এ সম্পর্কে কবিজীবনী, পৃ ৫৬ দ্রষ্টব্য।

পৃ ৩৫

'কালিদাস কোন পর্বতশৃঙ্গকে…'

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণী সবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ॥

—মেঘদূত, পূর্বমেঘ, ১৮

পৃ ৩৮

'কাতর কিঙ্কর আমি…'—নির্গুণ ঈশ্বর। কবিতাটি কবিতাসংগ্রহের ৫৮ পৃষ্ঠায় আছে।

পৃ ৩৯

'তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত…'—পূর্বোক্ত কবিতা। উদধৃত কবিতার দ্বিতীয় পদের পর দু'লাইন সংকলিত হয় নি।

'তোমার বদনে যদি…'—পূর্বোক্ত কবিতা

পৃ ৪০

'লক্ষ্মীছাড়া হও যদি…'—হিতমালা। এই কবিতাটি কবিতাসংগ্রহে নেই। গ্রন্থাবলীতে (১ ও ২য়) আছে।

পৃ ৪০

'আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্য…' ভগবদ্গীতা, অধ্যায় ১৭, শ্লোক ৮
অর্থ: যে সকল আহার আয়ু, উদ্যম, বল, আরোগ্য সুখ ও প্রীতি বৃদ্ধি করে এবং সরস স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর এবং মনোরম সেইগুলি সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়।

পৃ ৪১

দাশরথি রায়
এঁর সম্পর্কে চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'দাশরথি রায়ের জীবনচরিত' (১২৮৩), এবং শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী-প্রণীত দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালি, ১৩৬৭ দ্রষ্টব্য।

'বিবিজান চলে যান…'—ইংরাজী নববর্ষ

পৃ ৪১

'কে রে বামা বারিদবরণী…' এবং 'কে রে বামা ষোড়শী…'
এই দুটি গানই বোধেন্দুবিকাশ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে কাপালিনীবেশধারিণী রাজসী শ্রদ্ধার গান। কবিতাসংগ্রহে এই গান দুটি সংকলিত হয় নি।

পৃ ৪৪

'নবজীবনে বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত…'
বঙ্কিম-উল্লিখিত লেখাটি 'কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' এবং 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্য' এই দুই নামে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত নবজীবনে যথাক্রমে ভাদ্র ১২৯২ এবং আশ্বিন ১২৯২-তে প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় দেবেন্দ্রবিজয় বসুকে নবজীবনের প্রবন্ধ লেখক বলা হয়েছে।

পৃ ৪৪

রামমোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
এঁদের সম্পর্কে S. D. Collet, *Life and Letters of Raja Rammahun Roy* edited by Prabhat Chandra Ganguli and Dilip Kumar Biswas, Calcutta 1962; Ramchandra Ghosh, *A Collection of Portraits* 1876; সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'রামগোপাল ঘোষ', ১৯০৫; G. P. Pillai, *Representative Indians*, London, 1902; রামগোপাল সান্যাল-

প্রণীত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী, ১৮৮৭। কালীময় ঘটক-প্রণীত চরিতাষ্টক ১ম ও ২য় খণ্ড।

পৃ ৪৪

'বর্ষাকালের নদী'

আসলে কবিতাটির নাম 'বর্ষার নদী'। কবিতাসংগ্রহে (পৃ ২৬৩) অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে 'বর্ষার নদী' নামেই আছে।

'প্রভাতের পদ্ম'

বসুমতী গ্রন্থাবলী, বিবিধ খণ্ডে, এর নাম 'প্রভাতে পদ্ম'; কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের গ্রন্থাবলীতে 'প্রভাতের কমলিনী' এবং কবিতাসংগ্রহে 'প্রভাতের পদ্ম' (পৃ ২৮১)

পৃ ৪৪

'ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে···'—স্বদেশ

কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের গ্রন্থাবলীতে কবিতার নাম 'জন্মভূমি'।

পরিশিষ্ট

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুবাদ বলে অনুমিত কবিতা

এক

যোদ্ধার স্বপ্নদর্শন

তামস্ ক্যাম্বেল নামক ইংরাজী কবি প্রণীত উক্ত বিষয়ক
কবিতার মর্ম্ম অনুবাদ।

ত্রিপদী।

এলো কাল বিভাবরী, ভেরীর ঘোষণা করি
সেনা সব ক্ষান্ত হোলো রণে।
আকাশ প্রহরিতারা নিজ ২ স্থানে তারা,
অবিলম্বে উঠিল গগনে॥
সমাধান হোলে রণ, সহস্র সহস্র জন,
ক্লান্ত হোয়ে পড়ে ধরাপরে।
যুদ্ধ পরিশ্রান্ত যারা, নিদ্রা যাইবারে তারা,
অস্ত্রাহত মরণের তরে॥
তাড়াইতে ব্যাঘ্রগণ, জ্বালাইয়া হুতাশন,
শব রক্ষা করিছে যেখানে।
তাহার নিকটে গিয়া, তৃণশয্যা বিছাইয়া,
করিলাম বিশ্রাম সেখানে॥
আঁখিবদ্ধ নিদ্রাজালে, শব্দহীন নিশাকালে,
দেখিলাম সুখের স্বপন।
প্রকাশ না হোতে দিন, পুনঃ পুনঃ বার তিন,
হোলো সেই স্বপ্ন দরশন॥
মনেতে হইল হেন, রণক্ষেত্র হোতে যেন,
অতিদূরে করেছি গমন।
দিগ্ সব আলো করি, বিমল গগনোপরি,
উঠিয়াছে শারদ তপন॥
ভয়ানক পথ দিয়া, উপস্থিত যেন গিয়া
যথা মম পিতার আলয়।

১৬ই জুন ১৮৫১, ৩ আষাঢ় ১২৫৮

জনকের নিকেতন, পুনঃ পেয়ে দরশন,
আমারে আদর করি লয় ॥
জীবন অরুণোদয়ে, মনের উষা সময়ে,
করিতাম যথা পর্য্যটন।
ধেয়ে যাই সেই ক্ষেত্রে, শোভা তার হেরি নেত্রে,
কত তায় পুলকিত মন ॥
মম অজাগণ যত উচ্চরবে ডাকে কত
তাহা যেন শুনিবারে পাই।
সুমধুর মিষ্ট স্বরে, কৃষকেরা গান করে,
শ্রবণেতে শ্রবণ জুড়াই ॥
গৃহে আসি তার পরে, সুরাপাত্র করি করে,
পানকালে এই পণ করি।
যাবৎ জীবিত রব, আর না প্রবাসী হব
প্রিয় আর পুর পরিহরি ॥
তাহে মম শিশু যত, নাহি জানে কত শত,
চুম্বন করিল বার বার।
নিকটে আইল দারা, তারাকারা প্রেমধারা
কেঁদে কহে অভিলাষ তার ॥
থাক থাক প্রিয়বর, সুখেতে বিশ্রাম কর,
জীর্ণ তব হইয়াছে কায়।
যেও না সমর স্থানে রহ মম সন্নিধানে,
প্রাণপণে তুষিব তোমায় ॥
প্রেয়সীর প্রেমভাষে সলিলে নয়ন ভাসে,
উপজিল আনন্দ অপার।
শরীর বিশীর্ণ রণে সাধ বড় হোলো মনে
গৃহ কভু ছাড়িব না আর ॥
কিন্তু নিশি পোহাইল, সুখ আশা ফুরাইল,
হৃদয়ে জাগিল দুঃখভার।
স্বপনের কথা যত, জুড়াইতেছিল কত
মিলাইয়া গেল পুনর্ব্বার ॥

দুই

আলেকজেণ্ডার সেলকার্কের উক্তি।

ইংরাজী হইতে অনুবাদ।

ভূমিকা

আলেকজেণ্ডার সেলকার্ক নামক এক ব্যক্তির জাহাজ দৈবাধীন সমুদ্র সলিলে নিমগ্ন হইবায় তিনি ভাসিতে ভাসিতে এক জনশূন্য উপদ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক দিবস বাস করিয়া ছিলেন, অধুনা উক্ত উপদ্বীপ "জুযান ফার্নাণ্ডিজ" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পূর্বে তথায় কেবল পশু পক্ষির বাস ছিল, মনুষ্যের নাম মাত্র ছিল না। একারণ সেলকার্ক যদবধি তৎস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, তদবধি তিনি মানবের মুখাবলোকন করিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার মনে এমত ভরসাও ছিল না যে পুনরায় লোকালয়ে আগমন কবিবেন। এইহেতু তাঁহার ভাব লক্ষ্য করত সুবিখ্যাত ইংলণ্ডীয় কবি কৌপার সাহেব নিম্ন প্রকাশিত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহার প্রধান তাৎপর্য্য এই, যে মনুষ্য ঘোবতর বিপদে পতিত হইলেও জগদীশ্বরের করুণা চিন্তা দ্বারা সুখী হইতে পাবেন।

পদ্য

এখন যা দেখি আমি, বাজা হই তাব।
আমার স্বত্বেব অরি, কেহ নাই আর॥
এঅবধি চারিদিগ, জলধির ধার।
ভূচর খেচব সব অধীন আমার॥

হে নির্জন! কোথা তব, সেরূপ এক্ষণে
যা দেখেছে যোগিগণ তোমার বদনে?
তবু ভাল কোলাহল, স্থানে অবস্থান।
এ দুর্গমে রাজ্যভোগ, নহে সুবিধান॥

লোকালয় ছাড়া আমি হোয়েছি যখন
করিব এ দেহ যা[illegible], [illegible] সমাপন॥
মধুর মানব ধ্বনি, [illegible] শ্রবণে।
আপনি চমুকে উঠি, আপন বচনে॥

---
২০ আষাঢ় ১২৫৯, ২ জুলাই ১৮৫২

করিতেছে যত পশু কাননে বিহার।
দেখিয়া না দেখে তারা, আমার আকার॥
মানুষ কিরূপ তারা, কভু জ্ঞাত নয়
পশুর অহিংসা হেরে, মনে ঘৃণা হয়॥

সমাজ সখ্যতা আর প্রেম আলাপন।
যাহা হয় মানবের, দেবদণ্ড ধন॥
কপোতের সম যদি, পক্ষ হোতো যোগ।
উড়ে গিয়া পুন তাহা, করিতাম ভোগ॥

ধর্ম্ম আর সত্য পথ করিয়া আশ্রয়।
করিতাম আপনার, শোক পরাজয়॥
প্রবীণের উপদেশে, পাইতাম জ্ঞান।
যুবকের হাস্যরসে, জুড়াতাম প্রাণ॥

আহা মরি ধর্ম্ম এই, স্বর্গীয় বচন।
যাহাতে অমূল্য কত, আছে গুপ্ত ধন॥
স্বোনা রূপা তার কাছে, নহে মূল্যবান।
পৃথিবী কি দিতে পারে? তাহার সমান॥

গিরিজা প্রবেশহেতু, ঘন ঘণ্টারব।
কভু শুনে নাই, এই, গিরি গুহা সব॥
সমাধির স্বরে নহে, শোকের সঞ্চার।
পুলকিত নহে পেয়ে, বিশ্রামের বার॥

কৌতুক আমারে নিয়ে করেছ পবন
এখন এ সিন্ধুতীরে, কর আনয়ন॥
স্বদেশের সুধাময়, শুভ সমাচার।
যে দেশ নয়নে আমি, দেখিব না আর॥

যেখানে এখন যত, প্রিয়বন্ধু বরে।
আমার ভাবনা মনে, কখনো কি করে॥
যদিও পাব না আর, বন্ধু দরশন।
বন্ধুহীন নই আমি, শুনারে পবন॥

মানব মনের ভাব কিবা বেগে ধায়
পোড়ে থাকে তার কাছে, ঝড় খণ্ডপ্রায়।
আলোকের কর শর, কত দ্রুত যায়।
মনের গতির কাছে সেও লজ্জা পায়॥

জন্মভূমি মনো মাঝে হইলে উদিত।
ক্ষণমাত্রে যেন তথা, হই উপনীত॥
কিন্তু হোলে পুন এই, অবস্থা স্মরণ।
পুনরায়, নিরাশায়, মগ্ন হয় মন॥

নিজ নিজ নীড়ে উড়ে, গেল দ্বিজগণ।
বিবর আগারে পশু, করিল শয়ন॥
তবে তো বিশ্রামহীন, নহে এই দেশ।
আমি করি আপনার কুটিরে প্রবেশ॥

পরিপূর্ণ সব স্থান, যাঁহার কৃপায়।
মনের উদ্যম বাড়ে, যাহার প্রভায়॥
দুঃখেরে সে মনোহর, মূর্ত্তি দান করে।
নিজ নিজ ভাগ্য প্রতি তুষ্ট রাখে নরে॥

ইংরাজী কবিতার অবিকল মর্ম ও অর্থ এবং যথার্থ অভিপ্রায় রক্ষা করিয়া বঙ্গ ভাষায় তাহার প্রত্যেক চরণের কবিতা রচনা করা যদ্রূপ কঠিন, তাহা বিদ্যানুরাগি কবি ও কাব্যপ্রিয় মহাশয়েরাই বিবেচনা করুন। অতএব এই অনুবাদে যে যে দোষ হইয়াছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সকলে তাহা মার্জ্জনা করিবেন, যেহেতু অন্যান্য অনুবাদকের ন্যায় কৌপারের পদ্যকে বধ করা আমার মনের বাসনা নহে।

হিন্দু থিয়ফিলানথ্রপিক সোসাইটিতে প্রদত্ত ঈশ্বর গুপ্তের বক্তৃতা

এক

[108] যথার্থ প্রেম এবং ভক্তিদ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য

এই জগন্মধ্যে সর্ব্বস্থানস্থিত পরমেশ্বর প্রণীত যে সকল কার্য্য কিম্বা পদার্থ আছে, তাহা সামান্য বুদ্ধির অতীত এবং তুলনারহিত, জগদীশ্বরের কিবা আশ্চর্য্য লীলা, কি সুন্দর নিযমে এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে না। এবম্প্রকার নিরুপম সুচারু চিরদীপ্তিমান ঈশ্বরীয় সংসার মধ্যে মনুষ্য জাতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অন্যান্য জন্তু বিশেষ চৈতন্যবিহীন ও সদসদ্‌বিবেচনাশূন্য, কেবল এক ঈশ্বরদত্ত নিরূপিত সামান্য জ্ঞান মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা সর্ব্বদেশীয় বিচক্ষণ সমাজে স্বীকার্য্য বটে। ফলতঃ চমৎকার দেখুন মানবেরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অথচ আদিকাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরকৃত অনির্ব্বচনীয় কার্য্যের অনুসন্ধানপূর্ব্বক নানা প্রমাণে নানা প্রকার গ্রন্থ রচনা করত অদ্যাবধি সমুদয় অংশের মীমাংসা করা দূরে থাকুক, ক্ষুদ্র অংশের একাংশও স্থির করিতে পারেন নাই। যেহেতু স্বভাবতঃ মনুষ্যবুদ্ধির এমত উচ্চতর শক্তি নাই যে তদ্দ্বারা তাঁহার কার্য্যের যথার্থ মর্ম্মাবধারিত হইতে পারে আমারদিগের মনের অভিমান এরূপ বলবান যে যাহার যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি ও যুক্তির সীমা তাহাতে পরস্পর বাদানুবাদে ও তথ্যাতথ্য নির্ণয় বিষয়ে ক্ষণমাত্র বিরত নহি। ঈশ্বর এক সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদেহের অন্তরাত্মা, কোন প্রকার বিচার দ্বারা তাঁহাকে যথার্থরূপে জানা যায় না। তিনি সকলের কারণ, তাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত কেবল বিশ্বাস এক প্রধান কারণ হইয়াছে। সেই বিশ্বাসের মূল শ্রদ্ধা ও প্রণয়, যদ্দ্বারা তাঁহার স্মরণে অন্তঃকরণে অখণ্ড আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি বিষয়ের আসক্তিবিহীন হইয়া নিয়ত সেই আনন্দযুক্ত তিনিই জীবন্মুক্ত, এবং তাঁহাকেই সত্য সুখ বলা যায়। হা, এতদ্রূপ অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় জগৎকর্ত্তা, যিনি সমুদয় ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়াও উপাসকগণের উপাসনাপথের অতীত নহেন, আমরা তাঁহার বিষয়ে অনর্থক বিবাদ করিয়া মিথ্যা অহঙ্কার করি ইহা সামান্য ভ্রমের কর্ম্ম নহে।

যে প্রকারে হউক যথার্থ ভক্তির সহিত প্রেম পূর্ব্বক তাঁহাকে চিন্তা করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া অভীষ্ট ফল প্রদান করেন।

[109] যথা। যিনি পণ্ডিত তিনি কহেন বিষ্ণবে নমঃ। শাস্ত্রজ্ঞান-

বিহীনতাজন্য মূর্খ ব্যক্তি কহে বিষ্ণায নমঃ ইত্যাদি। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্য্যামি পরম বিভু উভয়ের ভাব লইযা সমান স্নেহ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত বলিয়া অধিক স্নেহ বা বা মূর্খ বলিযা অল্প দয়া প্রকাশ করেন না।

পরন্তু যখন যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানরূপ নির্ম্মল চন্দ্রের কিরণ দ্বারা মানবদিগের মানস-মন্দির পুলক আলোকে পরিপূর্ণ হয, সেই সমযের এক স্বতন্ত্র ভাব, কোন স্বভাব সিদ্ধ ভাবের প্রভাবে সে ভাবের অনুজ্ঞ হইতে পারে না। শুদ্ধ অধিকারভেদে তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তিই তাহাব মর্ম্মজ্ঞ, যেমন কোন সুগন্ধি পুষ্পের আঘ্রাণ গ্রহণকালীন তাহাব সৌরভসুখ আপনিই জানা যায, অন্যকে প্রকাশ কবা যায না। সেইরূপ ব্রাহ্মানন্দেব সুখ ব্রহ্মজ্ঞানি মহাশযেবাই মনে২ লক্ষ্য করেন, পবের নিকট ব্যক্ত করিতে পারেন না অতএব ব্রহ্ম বিষযে পরস্পর বিচাব দ্বারা দ্বন্দ্ব কেবল নিরানন্দের হেতু হইযাছে।

বেদস্বরূপ দধিসমুদ্র মথিত হইযা যে নবনীত উত্থিত হয, ঈশ্বরজ্ঞানি সাধু লোকেরা তাহাই ভক্ষণপূর্ব্বক পরম সন্তোষ সঞ্চয় করিতেছেন, অভিমানি তর্কশালি পণ্ডিতেরা অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ শুদ্ধ ঘোল খাইযা গোল করিতেছেন।

আমরা মনকে অন্যান্য চিন্তা হইতে স্বতন্ত্র কবিযা ঈশ্বরেব কার্য্য ও গুণ যত স্মরণ করি ততই অধিক আহ্লাদের উদয হইতে থাকে। কিন্তু তাহাতে বিবাদ-সূচক বিতর্ক করিলেই সেই সুখেব ব্যাঘাত জন্মে। কেননা মনে বিতর্ক উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধা ও প্রেমের আবির্ভাব থাকে না। অতএব আমরা তাহার কৃত কার্য্যে উপকৃত হইযা যত কৃতজ্ঞতা স্বীকার কবিব, ততই প্রেম ও ভক্তিকে বিশ্বাসের সহিত সংযোগ কবিতে পারিব।

পরমেশ্বর এই প্রকাণ্ড অখণ্ড বা খণ্ড বিখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কবিযা সমুদয় জগতের আলোক জন্য স্বীয তেজঃ প্রভা আকাশমণ্ডলে গ্রহ নক্ষত্রাদি রূপে বিস্তার পূর্ব্বক তন্মধ্যে সূর্য্যাকারে বিশেষ উপকার অর্থাৎ জীবেব জীবন ও জীবিকার নির্ব্বাহ এবং আমাবদিগের অভীষ্ট লাভার্থে নানাদিগে নানা সুখেব হেতু নির্ম্মাণ কবত কি অনির্ব্বচনীয় দযা প্রকাশ করিতেছেন এবং আমরা প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহাব দ্বারা কি মহোপকাব প্রাপ্ত [110] হইতেছি, সেই উপকাব ঋণে আমরা কোনক্রমেই মুক্ত হইতে পারিব না।

পরমেশ্বরের সত্তা ব্যতীত আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত কেহ ক্ষণকাল অবস্থিতি করিতে পারে না। কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ, যাবদীয় সচেতন বা অচেতন পদার্থ সকলি তাঁহার অধীন, তাঁহার সত্তা ব্যতিরেকে কাহারো কোন শক্তি নাই, কেবল ঈশ্বরের শক্তি

দ্বারা অস্মদাদির অনন্ত চিন্তাশক্তি, বাক্‌শক্তি, দর্শনশক্তি, স্পর্শনশক্তি, পাকশক্তি ও চলনশক্তি প্রভৃতি তাবৎ শক্তিই প্রকাশ পায়। তিনি এই দেহের অধ্যক্ষ আত্মাস্বরূপ, তিনি ইন্দ্রিয় সকলকে যথা নিয়মে পরস্পর স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন। তিনি মৃত্তিকা, বারি, বহ্নি, বায়ু ও শূন্য এই পঞ্চ প্রকার প্রপঞ্চ রচনা করত কি আশ্চর্য্য কৌশলে স্বজন পালন ও সংহার করিতেছেন। তিনি অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ বিতরণার্থে আমারদিগের বুদ্ধিকে তত্ত্বপথে প্রেরণ করিতেছেন। তিনি হৃদয়াকাশে বিকাশপূর্ব্বক চিত্তপ্রসাদ জন্মাইতেছেন। তাঁহার মহিমার শতাংশের একাংশ ও বেদ শ্রুতি স্মৃতিতে কহিতে পারে নাই। আমরা অল্পবুদ্ধি অধুনা কি কহিব ও কি বুঝিব, ধন্য ২ জগদীশ্বরের অপার মহিমার পার নাই।

জগতের সংপূর্ণ শোভা রক্ষা পূর্ব্বক আপনার কার্য্য ও অসীম শক্তির পরিচয় প্রদানার্থে করুণাময় বিভু মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট এই চারি প্রকার উপায়ে সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে শরীর এবং ক্ষমতার অংশ অধিক ও অল্প পরিমাণে বিতরণ করত অবস্থান ও গমনাগমনার্থে জল স্থল ও শূন্য এই ভিন্ন ২ তিন স্থান নির্ম্মাণ করিয়া কি চমৎকাররূপে আমারদিগের অভিমান ও গর্ব্বকে খর্ব্ব করিতেছেন। তিনি স্থাবর যোনিতে বৃহৎ পর্ব্বত ও নদনদী, সমুদ্রাদি নানাবিধ সৃষ্টি করিয়া প্রাণিগণকে কি অসংখ্য সুখ বিতরণ করিতেছেন। আমরা তাঁহার সৃষ্ট, তিনি আমারদিগের স্রষ্টা, তাঁহার অনন্ত রচনার অন্ত কেহই পায় নাই, আমারদিগের অল্পবুদ্ধির কি সাধ্য যে সেই জ্ঞানাতীত পরম ব্রহ্মের সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা বুঝিতে সমর্থ হই।

যে রূপ খরতর প্রভাবিশিষ্ট প্রভাকরের নিকট খদ্যোতের দ্যুতি ও যে রূপ অগাধ অপার সমুদ্র সমীপে সামান্য জলাশয় ও [111] কূপাদি ও যেরূপ বৃহৎ পৃথিবী সম্বন্ধে তন্মধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র ধুলিকণা পরমাণু, ও যে রূপ মহাকাশের সম্বন্ধে ঘটাকাশ এবং যে রূপ মহাকাল সম্বন্ধে এক মুহূর্ত্তকাল, সেই রূপ নিত্য নিয়ন্তা নির্ম্মল নিখিলনাথের নিকট আমরা এক অতি ক্ষুদ্র জীব, অতি ক্ষুদ্রকাল স্থায়ি, সুতরাং তাঁহার মহিমা বোধে অবোধ বালকের ন্যায় অত্যন্ত অযোগ্য।

করুণাময় পরমেশ্বরের করুণার সংখ্যা হয় না। অস্মদাদি অত্যন্ত অভিমান-বিশিষ্ট জীব, রাগ দ্বেষে এতাদৃশ পরিপূর্ণ যে আমারদিগের সম্বন্ধে কেহ কিঞ্চিন্মাত্র দোষ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার হিংসা করি, ও যথাশক্তি দণ্ড দানের চেষ্টা করি, কে না মানিলে তাহার নিকট মান রক্ষার্থে যথাসাধ্য অভিমান প্রকাশ করি, কিন্তু তিনি আমারদিগের প্রকৃতি বৈগুণ্য দেখিয়া অর্থাৎ আত্মস্বার্থপরতা ও

পরদ্রোহ ও পরহিংসাদি পুঞ্জ ২ দোষ দেখিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা করেন, কিছুমাত্র অভিমান করেন না, হা, কি চমৎকার তাঁহার কৃপা তিনি এই চরাচরব্যাপক এক পরমেশ্বর সকলের কর্ত্তা, কত লোক তাঁহাকে মান্যমান করে না বরং তিনি আছেন বলিয়াও জানেন না এবং মানে না, কিন্তু কারুণিক বিভু তাহারদিগো এক শত বৎসরের উপযুক্ত অন্ন জল বস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করিতেছেন। যদি কেহ প্রজা হইয়া এক সামান্য রাজার নিন্দা করে সেই রাজা তৎক্ষণাৎ ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া তাহার শিরশ্ছেদন করেন, দেখুন পরমেশ্বরের নিন্দকেরা পরমেশ্বরের সন্নিধানে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে আহার বিহার প্রাপ্ত হইয়া সুখি হইতেছে।

সামান্য বাজার নিকট অপরাধী ব্যক্তি দোষ মার্জ্জনা জন্য ভিন্নাধিকারে দেশান্তরে নিঃক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের অসীম অধিকারস্থ কেহ অধিকারেব বহিষ্কৃত হইতে পারে না। যেহেতু কি স্বর্গ কি নরক সর্ব্বত্রই তাঁহার রাজ্য।

সামান্য রাজা যদিস্যাৎ কাহারো কিছু ভাল করেন, তবে তাহার অভিমান কতই করিতে পারেন, কিন্তু অখিলরাজ্যের রাজা ঈশ্বর সমস্ত জগতের মঙ্গল করেন অথচ কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান করেন না। হা, পরমেশ্বরের এতাদৃশী অপরিমিতা দয়ার সূচনার্থে আমি কিরূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকাব করিব। তাঁহার গুণ গরিমা ও মহিমা মনোবাক্যেও সীমা হয় না। অসিত গিরিতুল্য যদি মসী [112] হয়, ও অগাধ সিন্ধু যদি মস্যাধার হয় ও কল্পবৃক্ষের শাখা যদি লেখনী হয় এবং সেই লেখনী দ্বারা যদি সরস্বতী আপনি লিপিকর্ম্ম করেন তবে তাঁহার অপার গুণেব পার লিখিতে সামর্থ্য হয় কিনা সন্দেহ।

যেমন এই ভূগোলস্থ জীব আমরা এই সকল আশ্চর্য্য সৃষ্টি রচনার আলোচনা পূর্ব্বক তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি, এমত কত শত গোলাকার বস্তু চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি গগনে দেদীপ্যমান এবং সেই সমুদয় ভুবনস্থিত জীব তাঁহার কত শত আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত ও বিস্মৃত হইতেছেন। আর এই এক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ভূগোল ও খগোল ও তন্মধ্যে নানা চিত্রপুত্তলীর ন্যায় দেখিতেছি, এই ব্রহ্মাণ্ডই বা তাঁহার কত আছে, তাহারো নিশ্চয় হয় না। ঈশ্বরের বৃহত্ত্ব, মহত্ত্ব, কি পর্য্যন্ত তাহার তত্ত্ব কাহারো বুদ্ধির গোচর হয় না।

জীবের অভীষ্ট দানে তিনি ব্যতীত আর কে সমর্থ হইবেক, কাহারো কিছু সামর্থ্য নাই। সূর্য্য, চন্দ্র, পবন, বরুণ যে যেখানে আছেন সকলেই তাঁহার সামর্থ লইয়া তাঁহারি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। অব্যবসায়ি ব্যক্তির বুদ্ধি, দেবতায় ও দেবপ্রতিমায় হয়, কিন্তু ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক তাঁহাকেই অবলম্বন করে

মাত্র, তাহা ব্যতীত আর অবলম্বন ও আশ্রয় কে আছে, তিনি অখিল রসামৃত সিন্ধু, অখিলনাথ, অখিলেশ্বর, যেমন উদয়াচল নামক পর্ব্বত সূর্য্যোদয়কালে সূর্য্যের কিরণ পাইয়া রজতাকার হয়, বস্তুতঃ সে পর্ব্বতের স্বভাবতঃ এতাদৃশ চাকচক্য নাই, তাদৃশ ঈশ্বরের তেজ পাইয়া কি দেব, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি কিন্নর, কি মনুষ্য এবং তন্মধ্যে কি রাজা, কি প্রজা তাবতেই তেজীয়ান হয়। অতএব এমত মহামহিম যে ঈশ্বর, তাঁহা ভিন্ন আর কাহাকে ভজনা করিব, আর ভজনীয়ই বা কে আছে।

আমারদিগের কর্ত্তব্য যে আমরা আমারদিগকে ঈশ্বরের বস্তু জানিয়া সর্ব্বদা অভিমানশূন্য হই ও যেন এমত বিবেচনা হয় যে তাঁহার চৈতন্যঅংশে জীবরূপে এই দেহপিণ্ডে বাস করি এবং ইহা জানিয়া যেন রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদি বহির্বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ পূর্ব্বক অন্তরাত্মা তাঁহাতেই লীন হই।

হে মানবাভিমানি ভ্রাতাগণ, আমরা যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকি এবং যখন যে যে কর্ম্ম করি, আমারদিগের সেই ২ অবস্থায় ও [113] ভিন্ন ২ কার্য্য সূত্রে পরম পিতা পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য হয় এবং অদ্য আমরা যে সকল বন্ধু এই যে এক সভা উপলক্ষে পরস্পর একত্র হইয়া তাঁহারি বিষয় আন্দোলন করিতেছি, এইরূপ একত্র করণের কারণই তিনি ও এইরূপ সভা সৃজনের উৎসাহ দানেব কারণই তিনি, এবং এইরূপ তাঁহার গুণানুবাদ বিষয়ক সদভিপ্রায়ের বীজ চিত্তক্ষেত্রে রোপণ করণের কারণই তিনি। অতএব বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা কবি, হে বাঞ্ছাফলপ্রদ কল্পতরু দীন দয়াময় জগদীশ্বর আপনি এতৎ কার্য্যে অনুকূল হউন, এবং এই সভাস্থ সমস্ত বান্ধব সভ্যকে অরোগি ও দীর্ঘায়ুঃ করিয়া উৎসাহ এবং যত্নকে এরূপে চালনা করুন যেন আমারদিগের এই সদভিপ্রায় বিনাশের গ্রাসে পতিত না হয় ইত্যলংবিস্তরেণ।

দুই

[132] পরোপকাব

জগদীশ্বর আমারদিগের অন্তঃকরণে যে সমস্ত সৎসংস্কারের বীজ রোপণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই আমরা পৃথিবী মণ্ডলে পশু পক্ষী প্রভৃতি তাবৎ প্রাণি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছি ঐ সংস্কার বীজ অনুশীলন রূপ বারি সেচনে অঙ্কুর বিশিষ্ট হইলে আমার দিগের বিবেচনাশক্তি বৃদ্ধি হয় এবং সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র রত্নাকরাদি ক্ষুদ্র বৃহৎ শোভাকর ও ভয়ঙ্কর পদার্থের দ্বারা সেই নিত্য নিয়ন্তা নিখিলনাথের

অসীম মহিমার পরিচয় পাইয়া পরমপ্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার নিশ্মল নামোচ্চারণে পুলকিত হই, এবং কৃতজ্ঞতাজন্য ঐ সময়ে অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয়াদি এক ভাবাপন্ন হইয়া এক প্রকার চমৎকার ব্যগ্রতা প্রকাশ করে এবং আর আমারাদিগের এমত দৃঢ বোধ হয় যে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রত্যেক ২ দেশে শ্বেত শ্যাম ও রক্তবর্ণ বিশিষ্ট যে যে মনুষ্যজাতি বিরাজমান আছেন তিনি সকলের রক্ষাকর্ত্তা ত্রাণকর্ত্তা ও পরম পিতা, তাঁহার সম্বন্ধে তাবৎ লোকেরি পরস্পর ভ্রাতৃ সম্বন্ধ ও আমারদিগের পরস্পর প্রণয় পরম সুখের কারণ, আমরা যত তাহাতে সংযুক্ত হই ততই [133] প্রবৃত্তির সহিত কদাশা ও কুমতির বিচ্ছেদ হইতে থাকে এবং পৃথিবীর অবস্থা ক্রমে ২ উত্তম হয়।

কোন ব্যক্তির দুঃখ ও যন্ত্রণা দেখিলে স্বভাবতঃ আমারদিগের অন্তঃকরণ যখন এক আশ্চর্য্য সংযোগ দ্বারা তৎক্ষণাৎ দুঃখ ও যন্ত্রণা যুক্ত হয়, তখন আমারদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে পৃথিবীর সৃজন সময়ে পরমাণু পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থবিরচক পরমব্রহ্মের এমত অভিলাষ অথবা ইচ্ছা ছিল যে মনুষ্য মাত্রেই পরস্পর প্রণয়ে পরস্পর সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত থাকিবেক, অতএব আমরা যদি শক্তি সত্ত্বে পরের দুঃখ সন্দর্শন পূর্ব্বক তদ্বিমোচনে বিরত হই, তবে আমারদিগকে তাঁহার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করণাপরাধে দোষি হইতে হয়, আহা স্বামিহীনা কামিনী কাঙ্গালিনী হইয়া জঠরানল শীতল করণাভিলাষে দ্বারে উপস্থিতা হইলে এবং পিতা মাতা হীন শিশু সন্তানগণ ম্লান বদনে শরীরকে বেষ্টন করিলে, আমারদিগের অন্তঃকরণে কি এক আশ্চর্য্য স্নেহরসের সঞ্চার হয়, এবং শীঘ্র তাহারদিগের মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে যত্ন ও উৎসাহ কিরূপ ব্যাগ্রতা প্রকাশ করে এবং তাহার-দিগকে যথাদরে পরিতুষ্ট করিতে পারিলে কি পরমানন্দ প্রাপ্ত হই, এবং শক্তির ক্ষীণতা জন্য তাহারদিগকে বিদায় করিতে হইলে কি এক প্রকার ক্লেশকর দুঃখ আসিয়া দুঃখিত করে, যে ব্যক্তি শক্তি সত্ত্বে পরোপকারজনক পরম ধর্ম্ম উপার্জ্জন না করেন, এবং পরদুঃখ সন্দর্শনে কাতর না হয়েন এবং পরপীডনে যাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে, তাঁহার মন কি কঠিন মন এবং তাঁহার সংস্কার ও স্বভাব কি ভয়ানক ইহা বিবেচনা করিলে তাঁহার শরীরকে রসহীন কাষ্ঠের পুত্তলির ন্যায় বোধ হয়, সুখ্যাতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করে এবং সে ব্যক্তি ইহকালে লোকসমাজে কলঙ্ক কণ্টকে আবৃত হইয়া পরকালে পরমেশ্বরের নিকটবর্ত্তি হইতে পারে না।

যে ব্যক্তি দীন জনের দুঃখ দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হন, তাঁহার অন্তঃকরণ কি উত্তম, দয়া প্রেম শ্রেদ্ধাদি [?] উত্তম ভূষায় তাঁহার মন অত্যন্ত সুশোভিত থাকে

সাধারণে তাঁহাকে দেখিবামাত্র পুলক প্রকাশ করে এবং তিনি সকলের প্রাতঃস্মরণীয় হন, পরহিংসা প্রতারণা পক্ষপাত ইত্যাদি কেহই তাঁহার মনের শরীরকে স্পর্শ করিতে পারে না, পৃথিবী মণ্ডলে তাঁহার সুখ্যাতি অখণ্ড হয়। [134] সন্তোষ তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ থাকে, এবং তিনি কায়া পরিত্যাগ করিলে দয়াময় পরমেশ্বর তাঁহাকে আপন অনুগ্রহের ছায়ার মধ্যে গ্রহণ করেন।

দয়া, স্নেহ ও তৎসহকারিণী মমতা এই ত্রিবিধ প্রকার সংস্কার মনের রাজ্য অধিকার করিলে মনুষ্য পরোপকার কার্য্যের আচার্য্য হয়েন, এবং সরল স্বভাবে দীন হীন উপায বিহীন মনুষ্যদিগের মঙ্গল করিতে এমত যত্নবান হন যে অকাতরে আনন্দ চিত্তে স্বীয় সমূহ সম্পত্তি দুঃখি ভাতৃদিগকে বণ্টন করিয়া দেন, এবং দয়ার স্রোতে ভাসমান হইয়া পবম ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। কোন অবস্থায় মনুষ্য আপন লাভাংশ পরিত্যাগ করেন না। কিন্তু দয়া প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সংস্কারত্রয় মন মন্দিরে উদয় হইলে আপন সুখানুষ্ঠান বিস্মৃত হইয়া পবের সুখ জন্য দানেব দ্বারে সমূহ সম্পত্তি ও শক্তিকে স্থাপিত করিযা আনন্দ পূর্ব্বক দুঃখিদিগের ক্রোড়ের উপর নিক্ষেপ করিতে থাকেন, এবং তাহারদিগের কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া ধর্ম্মের পথমুক্ত করেন।

পরোপকার রূপ পরম ধর্ম্ম যে শুদ্ধ ধনেব দ্বারাই হয় এমত নহে যেহেতু শারীরিক ও মানসিক শক্তি দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ কবা যায়, যথা যে ব্যক্তি বিদ্যা বিতরণ করেন সদুপদেশ দেন মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মপথে নীত করেন তাঁহারা পরোপকারক শ্রেণী মধ্যে অগ্রগণ্যরূপে পরিগণিত হয়েন, যেহেতু তাঁহারা যে পবোপকার করেন তাহা পবস্পর সম্বন্ধে মনুষ্য সমাজে বিতরিত হইলে দেশ মধ্যে জ্ঞানেব প্রভা উদ্দীপন হয, বিশেষতঃ পবোপকারে যাহাব মন আছে তিনি ধনকে অতি সামান্য বোধ করেন, ইহার প্রমাণ স্বরূপ অনেক মহাত্মা লোকের দৃষ্টান্ত দর্শান যায়, কিন্তু একজন স্কাটলেণ্ড দেশীয় মহাপুরুষ যিনি এই বঙ্গরাজ্যের মঙ্গলার্থ আপন সকল সম্পত্তি সকল যত্ন অনুবাগ ও সময় বিতবণ করত পরিশেষ আপন দেহকে এতদ্দেশের মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত কবত মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন আমি সুদ্ধ তাঁহারি নামোচ্চাবণে ইচ্ছা করি হে স্বদেশীয় বিদ্যানুরাগি ভ্রাতৃগণ, আমরা যখন ডেবিড হেয়ার সাহেবের নামোচ্চারণ করি, তখন আমারদিগের মনে কি রূপ আনন্দের উদয় হয়, ঐ মহাপুরুষ এতদ্দেশে আগমন করত বালকদিগকে বিদ্যাধন বিতরণ করিবায় এতদ্দেশীয় লোকেরা তাঁহাকে সাধারণ পিতাজ্ঞান [135] করিয়াছিলেন, তিনি বিদ্যাকাঙ্গালি বালক দেখিলেই আহ্লাদিত হইতেন

এবং বিদ্যালয় দ্বারা জ্ঞান দান করিয়া কত শত পরিবারের সুখের পথ মুক্ত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য, হেয়ার সর্ব্বদা হাস্যবদন ছিলেন, এইক্ষণেও আমরা তাঁহার নাম স্মরণমাত্র তাঁহাকে সেইরূপ হাস্যবদন দেখিতেছি তাহার মৃত্যুতে সকলেই দুঃখি হইয়াছেন, কিন্তু ঐ মহাপুরুষ পরোপকার কার্য্য দ্বারা স্বর্গীয় সুখের দ্বার মুক্ত করত পরদুঃখে দুঃখিত থাকিয়া পরম সুখকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং যতকাল চন্দ্র সূর্য্য নিজ ২ নিয়মে প্রভা প্রকাশ করিবে ততকাল তাঁহার কীর্ত্তি এই পৃথ্বিতলে ঘোষণা থাকিবেক।

এই পৃথিবী মধ্যে মনুষ্যদিগের অবস্থা অনেক প্রকারে অনেকের সহিত অনেকের অনেক বিভিন্ন দৃষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ কেহ স্বচ্ছন্দতার সহিত কাল যাপন করিতেছেন কেহ বা অতুল ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট হইয়াছেন, এবং কেহবা ক্লেশ কূপে মগ্ন রহিয়াছেন, কিন্তু এই অবস্থাভেদের কারণ জগদীশ্বরের ইচ্ছা ও নিয়ম ব্যতীত আর কিছুই নহে, তিনি তদ্দ্বারা এই অবনী রাজ্য শাসন করেন, কিন্তু তাঁহার করুণার এমত চমৎকার ক্রম যে তিনি কোন লোককে সম্পূর্ণ দুঃখিত করেন না এজন্য স্বভাবতঃ মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে দয়ার স্থাপন করিয়াছেন, অতএব মনুষ্য যদি ধন সত্বে ভাতৃতুল্য দুঃখিদিগের দুঃখমোচন না করেন, জ্ঞান সত্বে অজ্ঞানি বোধান্ধ মনুষ্যদিগকে জ্ঞান বিতরণ করিতে অনুরাগি না হন, তবে তিনি জীবের অপকার করত জগৎ পিতার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করেন, বিশেষতঃ যখন কুরঙ্গ ছাগ মেষাদি বন্য পশু স্বীয় মাংশ্য চর্ম্ম শৃঙ্গ দিয়া আমারদিগের উপকার করিতেছে যখন ধেনুগণ স্বীয় সাবকের জীবন ধারণোপযোগি যৎকিঞ্চিৎ দুগ্ধ দিয়া আমারদিগের উপকার নিমিত্ত অবশিষ্ট সমস্ত দুগ্ধ দান করিতেছে তখন আমরা মনুষ্য হইয়া ধনের দ্বারা মনের দ্বারা ও প্রযত্ন দ্বারা পরের উপকার না করিলে আমারদিগকে পশ্বাদি অপেক্ষা ঘৃণিত হইতে হয়,।

আমরা যখন প্রত্যক্ষদৃষ্টিকরিতেছি যে মনুষ্য সমূহ অতি অল্প কালের নিমিত্ত সৃজিত হইয়া পৃথিবী দর্শনানন্তর পুনর্ব্বার ধ্বংস হইতেছে, তখন অবশ্য বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর অনন্তলীলা নিমিত্ত এই বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরচনা [136] পূর্ব্বক আমারদিগকে মানব রূপে সৃজন করিয়াছেন, এই অবনীর আশ্চর্য্য সুখ এই সুচারু শোভা যুক্ত শরীর সদন আমারদিগের চির প্রাপ্য নহে, আমরা পরীক্ষা প্রদানার্থে আগমন করিয়াছি পরীক্ষক কর্ত্তৃক পরীক্ষা গৃহীত হইলে পরিশেষ প্রস্থান করিব সম্প্রতি গৃহমধ্যে যে এক প্রদীপ প্রদীপ্ত হইতেছে সেই দীপ শিখা নির্ব্বাণ হইলে সমুদয় অন্ধকার হইবেক যে পর্য্যন্ত ঐ আলোক

থাকিবেক সে পর্য্যন্ত চক্ষু প্রকটিত থাকিয়া দৃষ্টি পথ লক্ষ করিতে শক্ত হইবেক, যদিস্যাৎ মনুষ্য মাত্রেই মৃত্যুর অধীন হইলেন তবে পরস্পর সকলেরই এক অবস্থা কহিতে হইবেক, কেহ দুই চারি বৎসর বা চারি মাস বা দিবস বা দণ্ড অধিক জীবিত থাকুন কিন্তু কালের হস্ত হইতে কদাচ মুক্ত হইতে পারিবেন না, অতএব কিছুদিনের নিমিত্ত কেহ অধিক বলিষ্ট, কেহ অধিক ধনি কেহ অধিক বিদ্বান, হইলে দুর্ব্বল ধন হীন মূর্খের প্রতি ঘৃণা করিয়া অনাদর করা কদাচ উচিত হয় না যেহেতু জগদীশ্বর প্রসন্ন হইলে দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবান ও দরিদ্র ব্যক্তি ধনশালি এবং মূর্খ মনুষ্য অনায়াসে পণ্ডিত হইতে পারেন, সেইরূপ ধনির ধনক্ষয় ও বলবানের বল বিনাশ ও বুদ্ধিমানের বুদ্ধি ধ্বংস হওনের নানা প্রকার সম্ভাবনা আছে, এই পৃথিবীতে কত ২ বলিষ্ঠ ব্যক্তি ক্ষুদ্র এক পীড়ায় একবারে এরূপ ক্ষীণ হইতেছেন যে তিনি আপনার হস্ত আপনি চালনা করিতে পারেন না, রসনার দ্বারা বাক নিঃর্গত করিতে শক্তি থাকে না। কত শত কুবের তুল্য ধনি অন্ন জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়া দৈন্য দশায় আদরশূন্য হইয়া ভিক্ষার্থে মলিন বেশে পথে ২ পাগলের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন! কত সুবিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তি চিত্তের চাপল্য হেতু বুদ্ধি ভ্রমে হতাদর হইয়া সাধারণসমাজে উপহাস্য হইতেছেন! অতএব স্থিররূপে এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মনুষ্যদিগের পরস্পর, স্নেহ করা কর্ত্তব্য হয় যদি যথার্থ যুক্তিমতে সমুদয় সমান হইল তবে দম্ভ, অভিমান ক্রোধাদিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর সম্ভব ও প্রণয় দ্বারা জগতের হিতকার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে, কেননা তাহার বিপরীত হইলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরীক্ষক কর্ত্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে পারিব না অতএব যাহাতে তাহার নিকট প্রশংসা প্রাপ্ত হই এমত কার্য্য যদি আমারদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় তবে সর্ব্বাগ্রেই পরোপকার করা উচিত।

[137] পৃথিবীর সমস্ত কাণ্ড আমার সম্বন্ধে স্বপ্নবৎ কিছুই স্থায়ি হয় না কিন্তু পরোপকার কীর্ত্তি চিরকাল স্থাপিত থাকে এজন্য সকল দেশীয় সকল ধর্ম্মাবলম্বি মনুষ্যদিগের মঙ্গলার্থ সকল শাস্ত্রেই পরোকার করিবার পুনঃ ২ উপদেশ লিখিত হইয়াছে, কি খ্রীষ্টান কি যবন কি হিন্দু যিনি পরোপকার করেন পরকালে তাঁহার প্রতুল হয়, এবং পরম সুখ তাঁহার প্রতি প্রতীক্ষা করিতে থাকে, পরোপকারক ব্যক্তি মাত্রেই পরমেশ্বরের কৃপা প্রাপ্ত হয়েন, হে সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বান্তর্যামি সচ্চিদানন্দ জগৎপতি তোমার অসীম রচনা মধ্যে আমি এক ক্ষুদ্র জীব, তোমার মোহ মায়া প্রভাবে অজ্ঞান কূপে মগ্ন হইয়াছি, বায়ু অপেক্ষা দ্রুত বেগে মরণের

দিন নিকটবর্ত্তি হইতেছে, কোন দিবস কাল করালবেশে জীবন ধন অপহরণ করিবে, তাহার কিছুই নিশ্চিত নাই পদ্মদলে, যেমন জলের সঞ্চার এই দেহপিণ্ডে সেইরূপ প্রাণের অবস্থান হইয়াছে অতএব হে বিভো পরোপকার করিতে আমার যেন মতি হয় তবেই চরমে সমহ শঙ্কট ও শঙ্কা হইতে উত্তীর্ণ হইযা ত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পাবি।

দ্বারকানাথ অধিকারী

'সুধীরঞ্জন'-প্রণেতা দ্বারকানাথ অধিকারীর নাম আজ বাঙালি পাঠকের তেমন পরিচিত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বাল্যকালে সংবাদপ্রভাকরে সাহিত্যলীলার উল্লেখ করতে গিয়ে দ্বারকানাথের সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন। দ্বারকানাথ দীনবন্ধু এবং তিনি নিজে—এই তিনজনে মিলে সংবাদপ্রভাকরে এক কৌতুককর অধ্যায় রচনা করেছিলেন। কবিতাযুদ্ধ এবং কবিতাপ্রতিযোগিতা প্রভাকরের পাঠকদের মধ্যে উৎসাহ এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সেকালের অনেকেই স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের উত্তেজনা স্মরণ করেছেন।

এঁদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র বাংলা সাহিত্যে নাট্যকার হিসাবে সুপরিচিত কিন্তু দ্বারকানাথের নাম বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি ছাড়া দ্বারকানাথ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। বর্তমান লেখক দ্বারকানাথ সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করেছিলেন। যে কয়েকটি সংবাদ জানতে পেরেছি বর্তমান প্রবন্ধে সেগুলি গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করব।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত আলমডাঙ্গাব চার মাইল উত্তরপূর্বে গোস্বামী-দুর্গাপুর নামে একটি গ্রাম আছে। কমলাকান্ত গোস্বামী নামে এক তরুণ সন্ন্যাসীর নামে এই স্থানের নাম হয় গোস্বামী-দুর্গাপুর। এখানে রাধারমণের মন্দির আছে। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার অন্তর্গত জয়দিয়ার রাজা মুকুটরায়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় এই মন্দির নির্মাণ কবেন। দ্বারকানাথ অধিকারী এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বারকানাথ কৃষ্ণনগর কলেজে পড়াশোনা করেন। তিনি কোন্ বছর সেখানে ভর্তি হন জানা যায় না, তবে ১৮৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ লাভ করেন। স্কলারশিপ-প্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে দ্বারকানাথের স্থান চতুর্দশ। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি যে নম্বর পেয়েছিলেন তার বিবরণ[১]—

১। *General Report on Public Instruction for the year 1854*, **Result of the Junior Scholarship Examination of the Krishnagar College for 1853-54.**

DWARKANATH ODHEKARRY

Calcutta

PRINTED BY [illegible]

PROBHAKUR PRESS

1856

Price 1 rupee
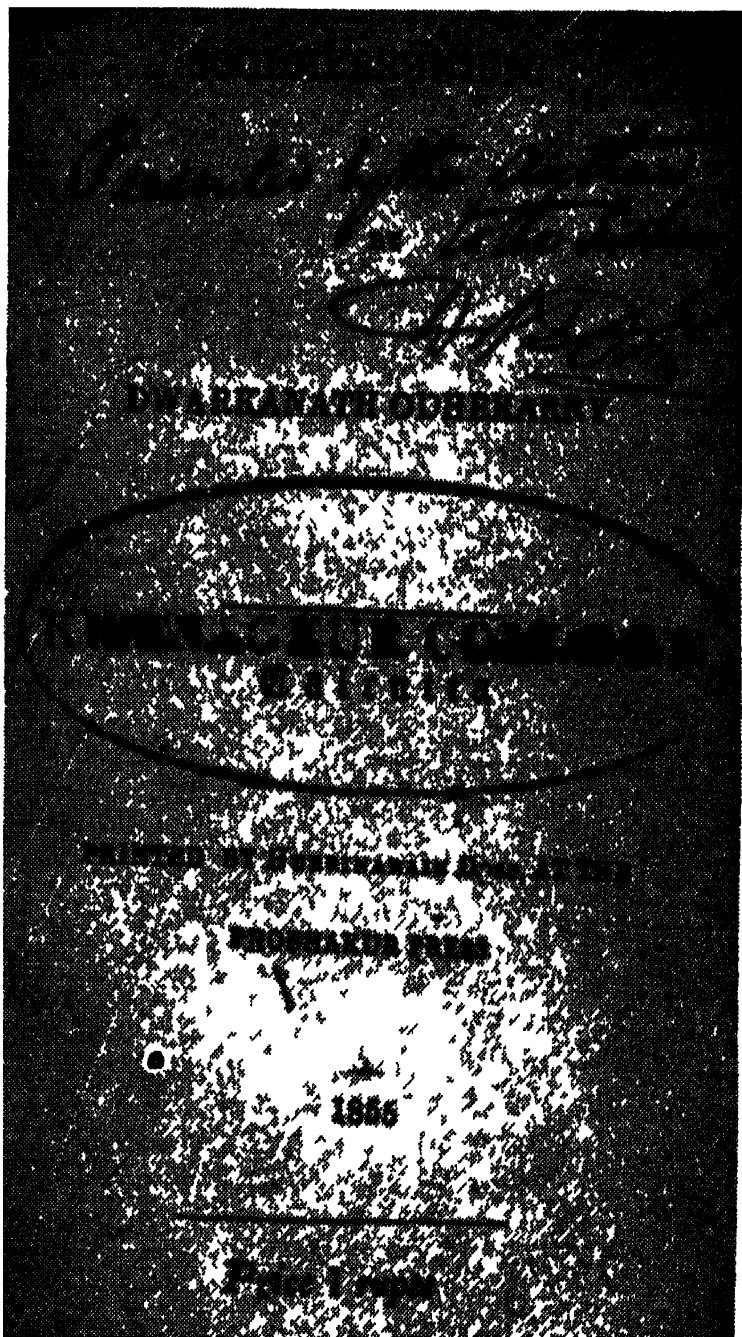
Grammar	29
History	24
Mathematics	$34\frac{1}{2}$
Geography	$29\frac{1}{2}$
Translation	28
Literature	22·5
Viva Voce	40
	207·5

এই বছরেই হুগলি কলেজ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি মোট নম্বর পেয়েছিলেন ২৭৫·৫।

পরের বৎসরের স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকায় দ্বারকানাথের নাম নেই। রাধিকপ্রসাদ মুখার্জির নাম আছে। তিনি পূর্ববৎসরে দ্বারকনাথের সঙ্গে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। দ্বারকানাথের 'সুধীরঞ্জন' বইতে কৃষ্ণনগর এবং হিন্দু কলেজের মধ্যে কাল্পনিক কথোপকথন বিষয়ে একটি কবিতা আছে। তাতে সমসাময়িক কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্রের উল্লেখ আছে। অম্বিকাচরণ ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, নীলকমল ভাদুড়ী এবং ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়—এঁরা সকলেই কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ছিলেন।[২] একটি ছাত্র সিনিয়র স্কলারশিপ পেয়ে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে হিন্দু কলেজে চলে যায় আইন পড়বার জন্য।[৩] তার সম্পর্কেও দ্বারকানাথের এই কবিতাটিতে উল্লেখ আছে। কৃষ্ণনগর কলেজ হিন্দু কলেজকে অনুরোধ করেছে সেই ছাত্রটির যত্ন নিতে। হিন্দু কলেজ উত্তরে বলেছে—

ভেবো না লো চন্দ্রাননি তাহার কারণ।
সে আমার প্রাণতুল্য অতি প্রিয়জন॥

দ্বারকানাথের ছাত্রজীবন সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দ্বারকানাথ সংবাদপ্রভাকরে কবিতা প্রকাশ করতে

২। এঁদের সম্বন্ধে *History and Register of Krishnagar College (1846 1945)*, Part II, 1950, Compiled by N. K. Majumdar দ্রষ্টব্য।

৩। One Senior Scholarship-holder was transfered to the Hindu College at his own request, that he might have an opportunity of attending law lectures.—*General Report on Public Instruction for the year 1854, p. 120.*

থাকেন। তাঁর প্রথম প্রভাকরে প্রকাশিত কবিতা আমরা পেয়েছি 'তত্ত্ব-প্রকরণ', ৬ জুলাই ১৮৫২-তে বেরিয়েছিল। এই কবিতাটি 'সুধীরঞ্জন' বইয়ের দ্বিতীয় কবিতা। বইয়ের প্রথম কবিতা 'পরমেশ্বরের মহিমাবর্ণন' তত্ত্বপ্রকরণের পূর্বে প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে। সম্ভবত 'বঙ্গভাষার সহিত ইংরাজী ভাষার কথোপকথন' কবিতাটি সংবাদপ্রভাকরে তাঁর শেস (১৬ই আগষ্ট, ১৮৫৪) কবিতা। মধ্যবর্তী কালে তাঁর যে-সব কবিতা প্রভাকরে বেরিয়েছিল, তার কিছু কিছু 'সুধীরঞ্জন' বইতে সংকলিত হয়েছিল। সুধীরঞ্জনে সংকলিত হয় নি, এ রকম কবিতার একটা তালিকা দেওয়া গেল—

১.	আশা	৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩
২.	বসন্ত	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩
৩.	সতীত্বের আক্ষেপোক্তি	১৫ এপ্রিল ১৮৫৩
৪.	অসভ্য ও তদীয় পালকপুত্রের বিবরণ	৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩
৫.	ছাত্র হইতে প্রাপ্ত। রূপক	৭ অক্টোবর ১৮৫৩

[কোন এক বিরহকাতর প্রবাসী পতি স্বীয় প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত পত্র লিখিতেছেন।

দীর্ঘ ত্রিপদী

প্রেয়সি তোমার তরে অন্তর যেমন করে
কেমনে কহিব একমুখে।]

দ্বারকানাথ অধিকারীর একমাত্র বই 'সুধীরঞ্জন' ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ১২৬২ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। এতে ইংরেজি ও বাংলায় দু'টি আখ্যাপত্র আছে। বাংলা আখ্যাপত্র এই রকম—

সুধীরঞ্জন / গোস্বামী দুর্গাপুর নিবাসী / শ্রীদ্বারকানাথ অধিকারী / প্রণীত / কলিকাতা / সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রে / শ্রীহরিনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত হইল / সন ১২৬২ সাল তারিখ ২৯ শ্রাবণ / এই গ্রন্থের মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

বইটির বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করলাম—

'অস্মদ্দেশে বালকবৃন্দের পাঠোপযুক্ত নীতিগর্ভ কাব্য পুস্তকের অসদ্ভাবে আমার কয়েকজন পরমবন্ধু একখানি পুস্তক প্রস্তুত করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদিগের আদেশানুরূপ এবং স্বদেশ-মঙ্গলের একান্ত ইচ্ছানুবর্তী হইয়া কতিপয় গদ্য পদ্য পরিপূরিত "সুধীরঞ্জন" নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

সাধ্যানুসারে রচনা করিয়াছি, কিন্তু ইহাতে কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইব তাহা পাঠকপুঞ্জের বিবেচনাধীন। এই পুস্তক সর্ব্বসাধারণের সম্যক পাঠোপযোগি করণাশয়ে ইহাতে নীতিবোধ সৎ প্রবন্ধ সকল প্রকটন পূর্ব্বক নানাছলে উপদেশ-বাক্য বিন্যস্ত করিলাম। ইহাতে যে সকল বিষয় লিখিত হইল তন্মধ্যে কয়েকটা প্রবন্ধ পূর্বে প্রভাকর-পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল।

পাঠক মহাশয়েরা গ্রন্থকারের নাম দেখিয়াই ঘৃণাপ্রকাশপূর্ব্বক পুস্তকখানি পরিত্যাগ করিবেন না, অনুগ্রহ করিয়া একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলেই পরিশ্রম ও যত্নের সার্থকতা বিবেচনা করিব। যদিও ইহার রচনা মন্দ হউক এবং স্থানে স্থানে ভাবের অপারিপাট্য থাকুক ফলত আমার অভিপ্রায় কখনই মন্দ নহে, বিশেষ এই আমার প্রথম উদ্যম। আমি গ্রন্থকারের পদবীতে আর কখনই পদার্পণ করি নাই সুতরাং এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইব তাহা কোনক্রমেই ভরসা করিতে পারি না, তবে আমার মধ্যে এই যে মহানুভব ব্যক্তিবাহ দুর্গন্ধ পঙ্ক পরিহার পূর্ব্বক তজ্জনিত পঙ্কজ লইয়াই আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন, পাঠক মহাশয়েরা মল্লিখিত পঙ্কের ন্যায় দোষ কদম্ব পরিত্যাগপূর্বক অবশ্যই অভিপ্রায় রূপ পঙ্কেরুহ গ্রহণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিবেন। এই স্থলে অবশ্য কর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করত মুদ্রিত করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন।

শ্রীদ্বারকানাথ অধিকারী
কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র

সুধীরঞ্জনে তিনটি অধ্যায় আছে যদিও এই অধ্যায়-ভাগ একান্তই অর্থহীন। প্রথম অধ্যায়ে আছে 'পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন', 'তত্ত্বপ্রকরণ' (সংবাদপ্রভাকর ৩ জুলাই ১৮৫২), 'মনের প্রতি উপদেশ' (সংবাদপ্রভাকর ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩), 'মাতৃস্নেহ', 'রাজার আদি কারণ। তৃতীয় কবিতাটির নীচে প্রভাকর-সম্পাদকের মন্তব্য ছিল 'এই পদ্য অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে'।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে 'মনের রাজত্ব' দীর্ঘ সংলাপাত্মক কবিতা। এই কবিতাটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া অনুচিত হবে না। কবিতাটি বিশুদ্ধ রূপক এবং বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও ঈশ্বর গুপ্তের বোধেন্দুবিকাশের সঙ্গে তুলনীয়। গল্পটি সংক্ষেপে এই—

অখিলেশের অধীন মন তার সেনাপতি কামদেবের সহায়তার সকলের থেকে কর আদায় করতে থাকে। কাম প্রচ্ছন্নভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে পরে স্বরূপ প্রকাশ করে। কামের সহকারী লোভ এবং মোহ। মিথ্যা ও প্রতারণা এদের গোয়েন্দা। মনের আদেশে আশা জমি জরীপ করতে বের হয়েছে। মন হঠাৎ অজ্ঞাতভয়ে আতঙ্কিত। দম্ভকে ডেকে ভয়ের কথা বললে দম্ভ তাকে অভয় দেয়। মন কিন্তু দম্ভকে বিভুর নিয়ম বাঁচিয়েই চলতে বলেছিল। কিন্তু দম্ভের প্রবর্তনায় মন বিভুকে অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করল। মনের অত্যাচারের কথা শুনে বিভু বিবেককে পাঠালেন মনের কাছে তার বক্তব্য জানাবার জন্য। কামের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হলে সে মনের আজ্ঞা পালনের কথাই বললে। লোভ মোহ ক্রোধ আশা অহংকার সবাইকে ডাকা হল।

বিবেক পরম গুণী সব বিবরণ শুনি
বিবেচনা করিলেন স্থূল।
কাম ক্রোধ লোভ আদি সকলেই অপরাধী
কিন্তু মন অনর্থের মূল।
তাদের আদেশ মত অধীনেরা অবিরত
পীড়ন করিল প্রজাগণে
শাসন করিলে তারে আর কেহ এ সংসারে
ডুবিবে না যন্ত্রণা জীবনে॥

অতএব মনকে দুঃখরূপ দ্বীপে নির্বাসিত করা হল।

সুধীরঞ্জনের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে 'ভারতবর্ষের বিলাপ। রূপক'। ভারত-জননী ভারতবর্ষের অধঃপতনের জন্য বিলাপ করছেন— এই স্বপ্নই এই কবিতার বিষয়।

বিদেশীয় রাজা আসি আমার হৃদয় বাসি
পুত্র সবে করি পরাজয়।
হরিয়া সকল ধন করিলেক বিসর্জ্জন
বেদ বিদ্যা আদি ধর্ম্মচয়॥
মম নব্য পুত্র চয় নাহি ভাবে ধর্ম্ম ভয়
অতিশয় হীনবল সবে।
আমি ভাসি আঁখি জলে তারা কিছু নাহি বলে
এই দুঃখ কবে দূর হবে॥

অনেকে সুরার ভক্ত পরপ্রিয় প্রেমাসক্ত
মিছা কথা ভিন্ন নাহি কয়।
ছাড়িয়া প্রাচীন রীতি পর ধর্ম্ম প্রতি প্রীতি
বৃথা কাটে সুখদ সময় ॥

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় কবিতা 'সত্যবতীর সহিত পাপিনীর বিবাদ' (১৬ই এবং ১৭ই মার্চ ১৮৫৩ প্রভাকরে প্রকাশিত)। কবিতাটির একটু ইতিহাস আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে কবিতা লিখে পুরস্কার পাওয়ার কথা বলেছেন, এটা সেই কবিতা। এই কবিতা-প্রতিযোগিতা হয় ১৮৫৩-র মাচ মাসে। ১৪ই এবং ১৫ই মার্চ দীনবন্ধু মিত্রের 'দম্পতি-প্রণয়' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ১৬ই এবং ১৭ই দ্বারকানাথের কবিতা এবং ১৮ই মার্চ বঙ্কিমচন্দ্রের 'তোমাতে লো ষড়ঋতু' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই তিনজনের কবিতা সম্পর্কে বিশ্বম্ভর দাস বসু সংবাদপ্রভাকরে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন।[১]

ঈশ্বর গুপ্তও ১২ই এপ্রিল তিনজনের রচনার উদ্যমের প্রশংসা করে নাতি-দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য করেন। অতঃপর ১৪ই এপ্রিল সংবাদপ্রভাকরে রঙ্গপুরের কুণ্ডীর সাহিত্যিক জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর একটি পত্র প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত তিনি বলেন,

'...আমি এইস্থলে প্রফুল্লচিত্তে প্রকাশ করিতেছি হিন্দু কলেজের বিদ্যার্থী শ্রীযুত দীনবন্ধু মিত্রের বিরচিত কবিতার ভাব অতি উৎকৃষ্ট। কৃষ্ণনগর কালেজের পাঠার্থী শ্রীযুত দ্বারকানাথ অধিকারির গদ্য-পদ্য-রচনায় প্রসাদগুণ বিলক্ষণ আছে এবং ভাষাও অতি কোমল সুতরাং সর্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। বর্তমান কালের নানা ঘটনা লেখাই কবিদিগের উচিত কর্ম। হুগলি কালেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পদ্য অতি উত্তম বটে কিন্তু ভাব কিছুই নূতন নহে।...'

কালীচন্দ্রের মতে দ্বারকানাথের কবিতাই সর্বোৎকৃষ্ট। দ্বারকানাথকে তিনি ১৫৲ টাকা পুরস্কার দেন, দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্র দু'জনে প্রত্যেক পান ১০৲ টাকা করে।

'সত্যবতীর সহিত পাপিনীর বিবাদ' কবিতার বিষয়বস্তু বর্তমান দেশে পাপের প্রসার। পাপিনী এবং সত্যবতী— দু'টি কাল্পনিক চরিত্রের বিবাদ এবং

১। সংবাদপ্রভাকর, ৯ই এপ্রিল ১৮৫৩। বর্তমান গ্রন্থ পৃ ১৯৬-১৯৭

কথোপকথনের সাহায্যে কবি দীর্ঘ কাহিনী রচনা করেছেন ; উপসংহার করছেন—

ওহে প্রিয় হিন্দুদলে ভবসাগরের জলে
তরিতে তরণী যদি চাও।
ধরিয়া যুদ্ধের বেশ সহিয়া কিঞ্চিৎ ক্লেশ
সত্যবতী আনিবারে যাও।

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় কবিতা 'দ্বেষ এবং ক্রোধের সহিত সুশীলের বিবাদ-সূত্রে দ্বেষের প্রতি প্রকৃতি সতীর উপদেশ' (সংবাদপ্রভাকর, ২১ এবং ২২-এ নভেম্বর ১৮৫৩)। চতুর্থ কবিতার নাম 'কৃষ্ণনগর কালেজের রোদন ও হিন্দু কালেজের সহিত কথোপকথন'। এই কবিতায় কৃষ্ণনগর কলেজ কয়েকজন কৃতী ছাত্রের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করছে—হিন্দু কলেজ তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। নবপ্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতি হিন্দু কলেজের কটূক্তি—

ছেলেধরা এক মাগী আসিয়াছে তথা।
শিশু ভুলাইয়া লয় না কহিয়া কথা॥
বিগুণে মণ্ডিতা মেট্রোপলিটান নাম।
লোকে সুরূপসী বলে আমি বলি বাম॥
বুক ফাটে তার কথা করিলে স্মরণ।
নিয়েছে অনেক মম নবীন নন্দন॥

'বঙ্গভাষার সহিত ইংরাজী ভাষার কথোপকথন' (সংবাদপ্রভাকর, ১৬ই আগষ্ট ১৮৫৩) কবিতটি সম্পর্কে পত্রিকায় সম্পাদকের মন্তব্য ছিল 'ছাত্রের রচিত এই বিষয়টী সবতোভাবে উত্তম হওয়াতে আদরপূর্বক মাসিকপত্রে প্রকাশ করিলাম'। কবিতাটি দীর্ঘ। নব্যশিক্ষিত যুবকেরা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে—তারই সংলাপাত্মক বিবরণ।

'সুধীরঞ্জন' বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে একটি কবিতা 'পরদার'। এই কবিতার শিরোনামের একটি ফুটনোট ছিল : 'Adultery'। কবিতাটি রূপকরীতিতে রচিত। পরদার নামক রাণীর তিন সহচরী—কুমতি, গুঞ্জনা, সঙ্কোচিনী। পরদারের সেনাসজ্জা। জ্ঞানচন্দ্রের সঙ্গে অজ্ঞানের সাক্ষাৎ ও সংলাপ। অজ্ঞানের মনে জ্ঞানের উদয়। অতঃপর জ্ঞান ও অজ্ঞানের পরদারের সভায় গমন। জ্ঞানচন্দ্রকে দেখে পরদারের পলায়ন।

সুধীরঞ্জনের কবিতাগুলি নীতিমূলক। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসৃষ্টি এর উদ্দেশ্য ছিল না। ১৮৭৭-এ সুধীরঞ্জনের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করেন দ্বারকানাথের পুত্র নীলরতন অধিকারী। সে-সময় সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায়[২] এর একটা সমালোচনা বের হয়:

'সুধীরঞ্জন। ৺দ্বারকানাথ অধিকারী প্রণীত তৎপুত্র শ্রীনীলরতন অধিকারী কর্তৃক প্রকাশিত। দ্বারকানাথবাবু যখন কালেজে অধ্যয়ন করিতেন সেই সময় বালকদিগের নিমিত্ত এই পদ্যগুলি প্রকাশ করেন এবং বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন যে 'পাঠক মহাশয়ের গ্রন্থকারের নাম দেখিয়াই ঘৃণা প্রকাশ পূর্বক পুস্তকখানি পরিত্যাগ করিবেন না অনুগ্রহ করিয়া একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিবেন। কিন্তু তাঁহার এই অনুরোধ কতদূর রক্ষা হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না। বহুকালের পর আবার সুধীরঞ্জন প্রকাশ হইয়াছে। গ্রন্থকর্তার পুত্র লিখিয়াছেন যে "আমার স্বর্গীয় পিতার এক অতুল কীর্তি বিলুপ্ত হয় দেখিয়া উহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" এখানে পিতৃভক্তি অতি প্রবল, সমালোচনার আর স্থান নাই। ঈশ্বর গুপ্তের সময় দ্বারকানাথবাবু সবল কবি বসিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন, বালকেরা তাহার কবিতা পড়িতে ভালবাসিত। এখন ভাল বাসিবে কিনা, আমরা নিশ্চয় অনুভব করিতে পারিতেছি না।'

কবি হিসাবে দ্বারকানাথ স্মরণীয় নন। বঙ্গদর্শনের সমালোচনা কঠিন হলেও সত্য। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের যুগে এবং তারও কিছুকাল পর বাংলা-কবিতার যে আদর্শ প্রচলিত হয়েছিল দ্বারকানাথের কবিতায় তার কিছু কিছু লক্ষণ ছিল, ঐতিহাসিক কারণেই তা স্মরণ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছেন, তাঁর কবিতায় ধরনটা ছিল ঈশ্বর গুপ্তের মতো, সে মন্তব্যের যুক্তিযুক্ততা ছিল দুই কারণে। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে দ্বারকানাথের কোনো সাদৃশ্য ছিল না বটে, নৈতিক এবং পারমার্থিক কবিতায় দু'জনের মিল ছিল। দ্বিতীয়ত দ্বারকানাথ যে প্রধানত রূপক রীতিতে কবিতা লিখতেন, সেই রীতিটাও উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে ছিল একটা সুলভ রীতি। এ বিষয়ে অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধান করতে গেলে দ্বারকনাথকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে সুফল লাভের সম্ভাবনা।

দ্বারকানাথের স্বল্পকালস্থায়ী জীবনে কোনো সুদূরপ্রসারী কীর্তি গড়ে ওঠে নি। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র এবং দীনবন্ধুর মতো সুপরিচিত লেখকদের প্রসঙ্গেই

২। বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪, পৃ ৯৬।

তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। কবিতা-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার-প্রাপ্তি তার একটা দৃষ্টান্ত। কিন্তু এ ছাড়াও আরও একটি কারণে তিনি এঁদের নামের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তারও সংক্ষিপ্ত উল্লেখ অসঙ্গত হবে না। দ্বারকানাথ সংবাদ-প্রভাকরের পৃষ্ঠায় কবিতাযুদ্ধের আরম্ভ করেন। 'সরস্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ' নামে কবিতা লিখে দ্বারকানাথ কবিতাযুদ্ধের সূত্রপাত করেন।

এতে আছে বুনো কবি (দ্বারকানাথ) শহুরে কবি (দীনবন্ধু) এবং চট্টোকবি (বঙ্কিমচন্দ্র) এই তিনজনের কাল্পনিক সংলাপ। দীনবন্ধু এই উপলক্ষে তিনটি রচনা লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন একটি— বিচিত্র নাটক। অতঃপর দ্বারকানাথই ৩১-এ জানুয়ারী ১৮৫৪ 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের সন্ধিপত্র' রচনা করে এর উপসংহার ঘটান। তাতে তিনি লেখেন :

'আমি রাগান্ধ হইয়া প্রথমত পবিত্র মিত্রদ্বয়ের সহিত বাক্‌বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি, এই ঘৃণিত বিবাদের সূত্রপাত আমা হইতেই হয়, এ জন্য আমি ইহাতে সংম্পূর্ণ দোষী তাহা স্বীকার করিয়া উক্ত কবি-ভ্রাতাদ্বয়ের বিশেষত মিত্র-মিত্রের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি।…'

দ্বারকানাথ অধিকারী অকালে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর তারিখ সঠিক নির্ধারণ করতে পারি নি। তবে ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৮-এর মধ্যে কোনো এক সময় তাঁর মৃত্যু হয়। দ্বারকানাথের মৃত্যুতে তাঁর গুরু ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা লিখে স্মৃতি তর্পণ করেছিলেন।[৩]

অধিকারি কিছুদিন থাকিলে জীবিত।
হইত অশেষরূপে জগতের হিত ॥
জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থগুলি করিয়া প্রকাশ।
পুরাইত আপনার যত অভিলাষ ॥
নাটকেব প্রথাপথ করিলে প্রচার।
পাঠকের হত তায় কত উপকার ॥
যে করিত কতরূপ কুশল সাধন।
অকালে কালের করে সে হলো পতন ॥
হায় হায় বিধাতার বিচার কেমন।
অকালে কালের করে সে হলো পতন ॥

৩। ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী (বসুমতী) 'অপূর্ব প্রকাশিত' কবিতাবলীর অন্তর্ভুক্ত 'শোকোচ্ছ্বাস' শীর্ষক কবিতা।

দ্বারকানাথ অধিকারীর কবিতা

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত

রূপক

কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ

সরস্বতীর খেদ ও দ্বিতীয় বরপুত্রের সহিত কথোপকথন

দীর্ঘ ত্রিপদী

পুত্রে করি বর দান দেবী নিজ বাসে যান
তথা তাঁর মায়ার উদয়।
আকুলা হইযা অতি আপন সখীর প্রতি
কহিছেন করিয়া বিনয়॥ ১

ওলো প্রাণ সহচরি সন্তানের শোকে মরি
কি যাতনা জলে জলে কায়।
প্রিয় সুতে দূরে রাখি কেমনে এ ঘরে থাকি
বল না ললনা সদুপায়॥ ২

ছলনা কোরো না মোরে চল না লো ত্বরা কোরে
যাই সেই সরসীর কূলে।
যথা তারা দুইজন, করিতেছে আলাপন
সুখার সুধার তান তুলে॥ ৩

এতেক বলিয়া সতী চঞ্চল চরণে অতি,
চলিলেন সরোবর-তীরে।
উপনীতা হোয়ে তথা, শুনিতে না পান কথা
অমনি অশনি পড়ে শিরে॥ ৪

সুতের বদন শশি না দেখিয়া সুরূপসী
বসিলেন বিষাদিত হোয়ে।
দারুণ দুখেতে মার চক্ষে বহে শতধার,
কাঁদিছেন নানা কথা কোয়ে॥ ৫

হেন কালে সেইখানে আরোহি আকাশযানে,
কল্পনা দেবীর আগমন।

সংবাদপ্রভাকর, ২৫ জুলাই ১৮৫৩। সোমবার ১১ শ্রাবণ ১২৬০।

ধরিয়া যুগল করে, সতীকে সান্ত্বনা করে
বহুবিধ বলিলা বচন ॥ ৬
পরিহর সব দুখ এখনি সুতের মুখ,
ওলো সতি পাইবে দেখিতে।
তব পদ সরষীজে প্রণাম করিয়া নিজে
যাই আমি তাদের আনিতে ॥ ৭
শুনে দেবী সরস্বতী হরষিত হোয়ে অতি
কল্পনা দেবীর প্রতি কন।
আমারে করিতে সুখী, যদি যাবে শ···খী
শুন শুন বিনয় বচন ॥ ৮
জ্যেষ্ঠে প্রয়োজন নাই, কেবল ক······ই,
সেই মম অতি প্রিয়জন।
মম কোলে পোঁছা ছেলে দুখ যা······লে
সুস্থ হবে বিচঞ্চল মন ॥ ৯
শুন শুন প্রাণ সই, তোমার নিকটে কই,
যে উপায়ে তার দেখা পাবে।
অতি সুমধুর রবে, সদা এই কথা কবে,
যখন যথায় তুমি যাবে ॥ ১০
ভারতে ভারত ব্যাস দেবী পুত্র কালিদাস
ইহারা কবির শিরোমণি।
যদ্যপি শুনিতে পায়, না সহিবে তার গায়
অবশ্যই আসিবে তখনি ॥ ১১
স্বভাব তাহার বেশ, মনে পরিপূর্ণ দ্বেষ,
শহরের মিত্র কবি নাম।
শুনিয়া কল্পনা সতী চলিলেন শীঘ্রগতি
দেবী পদে করিয়া প্রণাম ॥ ১২

পয়ার

মায়ের আদেশে দেবী দেশে দেশে ভ্রমে।
তথাপি কবির দেখা, নাহি কোন ক্রমে ॥

প্রখর রবির করে, শ্রান্তা হোয়ে অতি।
এক সরসীর কূলে বসিলেন সতী ॥
সেই কালে বুনো কবি দিল দরশন।
ক্ষণকাল দুইজনে, হয় আলাপন ॥
সুধান না পেয়ে, দেবী সরস উত্তর।
জান জান কোথা আছে, মিত্র কবিবর ॥
বুনো কবি বলে তাহা জানিব কেমনে।
থাকেন শহরে তিনি, আমি বেণাবনে ॥
তবে এক মাত্র জানি, বলি তব কাছে।
কমলিনী কামিনীর, ঘরে বুঝি আছে ॥
শুনি শূন্য যানে গিয়ে, কামিনী আগার।
দেবীর কথিত কথা, কন বার বার ॥
তথা ছিল কবিবর, তাহে ক্রোধী হোয়ে।
কল্পনা দেবীরে কন, নানা কটু কোয়ে ॥

তুই বেটী কম কভু নোস্
দাঁড়া তো দাঁড়া তো মাগী, যে কথায় আমি রাগি
সেই কথা মোর কাছে বার বার কোস্।
রোস্ রোস্ রোস্ ॥
এখনি পাইবি তুই টের।
কা'র জোরে কর জোর নাসিকা কাটিব তোর,
দেখিতেছি কপালে ঘটিল ঘোর···
ফের ফের ফের ॥

পয়ার

ঈষৎ হাসিয়া সতী লাগিল কহিতে।
আসিয়াছি আমি বাপু, তোমারে লইতে ॥
তোমার বরদামাতা, দেবী সরস্বতী।
না দেখিয়া তব মুখ বিচঞ্চলা অতি ॥
বিলম্ব কোরো না যাদু চল চল চল।
শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পাছে জননীরে ছল ॥

মনোগত কথা তব যে সকল আছে।
একে একে কহ গিয়া জননীর কাছে॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট অতি.........
দেবীকে দেখিতে অতি গমন সত্বর॥
যখন সরসী কূলে উত্তরিল আসি
সরস্বতী কহিছেন প্রেমানন্দে ভাসি॥

রাগিনী বিভাষ
তাল আড়া

এসো এসো যাদুমণি, দুখিনী মায়ের কোলে
মা বলিয়া চাঁদমুখে, ডাক আধো আধো বোলে।
অন্ধের যষ্টির সম, তুই সম [মম] প্রিয়তম জানি
য়া কি ভ্রমে যাদু আমারে বিস্মৃত হোলে!
তিলেক তোমার মুখ, না হেরিলে দহে বুক,
জেনেছি যাবে না দুখ, এ দুখিনী নাহি মোলে॥

ত্রিপদী

স্থতে কোলে লোয়ে সতী, হরষিত হোয়ে অতি
সুধালেন সুমধুর স্বরে।
বল বল কি কারণ জননীরে বিস্মরণ
করিয়াছ পাষাণ অন্তরে॥
যখন শমন গ্রাসে, প্রিয় পুত্র কালিদাসে
শেল সম শোক ছিল বুকে।
মুখে না সরিত রব, ভুলিয়াছি সেই সব
হেরিয়া তোমার শশিমুখে॥
[স] ব গুণী গুণ তার করিয়াছ অধিকার
অধিকের মধ্যে আরো দ্বেষ।
তুমি বাছা বেঁচে থাক, মা বোলে ডাক না ডাক
তাহা হোলে যাবে মম ক্লেশ॥

পয়ার

কবি মিত্র বলে আর, কহিয়া কি করি।
ইচ্ছা হয় জননী গো বিষ খেয়ে মরি॥

বুনো কবি নাম ধরে, বেণাবনে বাস।
আমার কবিতা রত্নে, করে উপহাস॥
ভাষাকে সরল বলে, না জানি কি ভাবে।
একবারার না ভাবিল, সুকোমল ভাবে॥
রাগ উপস্থিত মম, তাহার বচনে।
রোষেতে দিয়েছি দোষ, তাহার স্বপনে॥
পণ করিয়াছি মাগো, মনে করি ক্রোধ।
অবশ্য তাহার আমি দিব প্রতিশোধ॥
যত দিন পালিতে না, পারি অঙ্গীকার।
মানব সমাজে মুখ, দেখাব না আর॥
বিষম বেদনা মম, যাহা ছিল মনে।
নিবেদন করিলাম, তোমার চরণে॥
ইহার বিহিত যদি না কর জননি।
জীবন জীবন মাঝে, ত্যজিব এখনি॥

দেবী

অবশ্য করিব আমি এর প্রতিকার।
এখন কোলেতে যাদু ঘুমাও আমার॥
এত বলি কোলে মাতা, করিয়া কবিরে।
ঘুমাও ঘুমাও বলি কহিছেন ধীরে॥
কবির না হয় ঘুম, রাগ মনে আছে।
ধীরে ধীরে কহিছেন, জননীর কাছে॥
না করিলে এখন মা, তার প্রতীকার।
যাইব, তোমার কাছে, রহিব না আর॥

দেবী

একাকী যেও না যাদু, ছাড়িয়া আমারে।
আসিয়াছে পশুপতি, পশু ধরিবারে॥
বিষম বিক্রম তার সদা শূলধারী।
বাহুবলে হইয়াছে, পশু অধিকারী॥

কবি

কি বলিলে জননি গো, যদি আমি পশু।
কি লাভ হইবে তবে রাখিলে এ অসু॥

দেবী

কি বুঝিতে কি বুঝিলে তুমি পশু নয়।
ভূতের শরীর তব ভূত যদি কয়॥
সে সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
... ... বৈকুণ্ঠ ভবন॥
মন দেশে দ্বেষ তথা প্রবো না হবে।
সদাকাল সাধু সহ মন সুখে রবে॥

কবি

তোমার সহিত আমি যদি তথা যাই।
কবিগণে উপহাস, করিবে সবাই॥

দেবী

তোমাব বয়স কাঁচা, মোর কথা ধর।
উপদেশ শুন বাছা, দ্বেষ পরিহর॥

কবি

যাবে না যাবে না মাগো, স্বমনের দ্বেষ।
যত দিন বুনো কবি না ছাড়িবে দেশ॥

দেবী

সুতেব কথায় সতী, মোহিত মায়ায়।
সুধালেন সুমধুর স্বরে পুনবায়॥
সে পোড়া কপালে তোরে, কি বলেছে বল।
এখনি তাহাব আমি দিব প্রতিফল॥

কবি

ওগো মাতা কি বলিব, মাথা গেছে কাটা।
এখন বৃথায় আর আটা দিয়ে আঁটা॥
ভাব না ভাবিয়া দেখে, বলে অহঙ্কারে।
মিত্রবাবু মিত্র হবে ভাষা ব্যবহারে॥

দেবী

বারণ করিয়া তারে, ··· ··· কুমার।
বেণাবনে মুক্ত সেই, ছড়াবে না আর॥
ভাব না বুঝিয়া তুমি কবিতার তার।
মিছে কেন কটু কথা কর ব্যবহার॥
হিংসা পরবশ হোয়ে, না দেখিলে যেই।
বিশেষ প্রশংসা তব, করিয়াছে সেই॥
স্বভাব প্রকাশ করে, সুকোমল ভাষে।
সেই ত সুকবি বলি আপনা প্রকাশে॥
যে হোক্ বাসনা তব, পেরেছি জানিতে।
কথনো যাবে না তুমি, আমার সহিতে॥
গুটীকত কথা বলি, থাকে যেন মনে।
বিবাদ কোরো না বাছা, আর কারো সনে
মাঝে মাঝে এইখানে, অবশ্য আসিয়া।
দুখিনীরে চাঁদমুখ, যাবে দেখাইয়া॥
গিয়াছিল সব দুখ, তোরে কোলে পেয়ে।
আবার থাকিতে হোলো, পথপানে চেয়ে॥
গ্রাম্য কবিগণে আর নাহি তব ভয়।
আমার বরেতে সবে হবে পরাজয়॥
আজি হোতে নাম তব গ্রামের কেশরী।
মন সুখে নাশ কত আপনার অরি॥
লেখনী তোমার অতি, লিখিবে জলদ।
কবির মাঝারে তুমি হইবে বলদ*।
বর দিয়া বাগ্‌দেবী যান নিজাগার।
ভাবি···কবি মিত্র, নিজ অঙ্গীকার॥
·· নিবেদন, গ্রামবাসি কবিগণ
সদা সবে সাবধানে রবে।
··· বিপদ একি, চারিদিক শূন্য দেখি,
নাহি জানি কি হইবে কবে॥

* যিনি বল দেন।

·· হরের কবিবর পাইয়া দেবীর বর,
হোলেন গ্রামের পঞ্চানন।
না বুঝিয়া অনুরাগে, আছেন বিষম রাগে,
পাগল হোয়েছে তার মন॥
ইতি সংক্ষেপ বৃত্তান্ত

মিলন

মনোতিহাস

বর পেয়ে কবিবর, নিজ পণে করি ভর
চলিলেন ভাবিতে ভাবিতে।
আমি অতি সংগোপনে ছিলাম বেণার বনে
পাইলাম তাঁহারে দেখিতে॥ ১
··· কাছে শীঘ্রগতি গিয়া সবিনয়ে অতি
সুধালাম ওহে কবি ভাই।
একি অসম্ভব শুনি, নিজে হোয়ে মহাগুণী
রাগিয়াছ আমার কথায়॥ ২
বল দেখি গুণধাম, করিয়া তোমার নাম,
কহিয়াছি কটু কথা কটা।
নাম শেষে ধরি মিত্র হইলে সবার মিত্র
কেবল আমার ভাগ্যে চটা॥ ৩

শহুরে কবি

বেণাবনে থেকে তোর চোকে লাজ নাই।
কেমন সাহসে মোরে, বল কবি ভাই॥

বুনো কবি

ভেবে দেখ আপনার মনে একবার।
এক বিভু সৃজিলেন, জগৎ সংসার॥
সেই স্রষ্টা ঈশ্বরের সৃষ্ট মোরা সবে।
তবে কেন অভিমান, ভাই ভাই রবে॥

শহুরে কবি

যাও মেনে নহে তব ভদ্রের স্বভাব।
আমার কবিতা রত্নে, বল, নাই ভাব॥

বুনো কবি

বৃথায় আমার প্রতি, করিয়াছ রোষ।
সে নয়, আমার, তব বুঝিবার দোষ॥
এসো যাই দোঁহে আদি, কবির নিকটে।
যদ্যপি বলেন তিনি, তবে দোষ বটে॥

শহুরে কবি

বল দেখি তার চেয়ে, কিসে আমি কম।
তাহার নিকটে যাব, শুধিবারে ভ্রম॥

বুনো কবি

তোমা হোতে শ্রেষ্ঠ যদি, নহে কোন জনা।
যাও ভাই কর গিয়া, ঈশ্বর সাধনা॥
হইলে তাঁহার কৃপা, ভ্রম দূরে যাবে।
কাহার প্রথম দোষ জানিবারে পাবে॥

—

হেনকালে আদি কবি, আসিয়া তথায়।
সুধান অমৃত মাখা, মধুর কথায়॥
একি অসম্ভব ভাব, দেখিবারে পাই।
বেণাবন ছেড়ে তুমি, এলে কেন ভাই॥

বুনো কবি

তপন চিনিতে নারে, একি চমৎকার।
বেণাবনে থেকে ভাই সুখ নাই আর॥
কি দোষে দিনেশ কাণা, মনে ভাবিতাম [?]।
দাঁড়াইয়া নেত্র তুলে, মিত্র পানে চায়॥

শহুরে কবি

"যাও যাও বোসো গিয়া, আপনার স্থানে।
চেয়ে কেহ কাণা হও বিভাকর পানে॥

বুনো কবি

দিনপতি তপনের, নাহি সেই দিন।
কামিনীর আচরণে, ভাবিয়া মলিন॥
তেজোময় হোত যদি, তার কলেবর।
ত্রিভুবন মাঝে নাহি, থাকিত ভ্রমর॥
যদি বল তেজহীন তবে কেন তাপ।
বিষম ভাবনা জ্বরে, গাত্রে উঠে তাপ॥

আদি কবি

বড় দায় ভাই তব, ভাব বুঝা মেন। Man
নিশিতে শুইয়া এত স্বপ্ন দেখ কেন॥

বুনো কবি

বিদায় লইয়া মিত্র বিদেশে আসিয়া।
মাঝে মাঝে সুধাকরে দেহ পাঠাইয়া॥
না দেখিয়া সখা মম, সত্নপায় আর।
ভাবিয়া নিশির স্বপ্ন করিয়াছি সার॥

আদি কবি

কেহ কেন মিত্র ভাই, বিরস বদনে।
সদালাপ নাহি কর, মধুর বচনে॥
ভুলিয়াছি আদি কবি, দিতে সমাচার।
জননীর জ্যেষ্ঠ পুত্রে, সুখ নাহি আর॥

বুনো কবি

আগত হইল দেখে ষষ্ঠীর সময়।
ভাবিছেন মিত্র বুঝি, বেশের বিষয়॥

—

'বেলা নাই আর ভাই, নিজবাসে যাব।
·· লন উপায় গিয়া, আদি কবি ভাব॥
মিত্র মিত্র পরিহরি, আপনার রোষ।
স্বগুণে ক্ষমহ এই পাগলের দোষ॥

ভেব না ভেব না কিছু মুখে যাহা কোই।
প্রণয়ের পাশে যেন, মনে বাঁধা রোই ॥
সবিনয়ে সবাকার লইয়া বিদায়।
চলিলাম গৃহে আজ then good by ॥

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৬০ শ্রীদ্বারকানাথ অধিকারী।
কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র।

কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ।
অসভ্য ও তদীয় পালক পুত্রের বৃত্তান্ত।

পয়ার

প্রবল প্রতাপশালী, অসভ্য রাজন।
সসাগরা ধরা নিজে, করিল শাসন ॥
তাহার সখের ছিল দুই পাট-রাণী।
অবিদ্যা একের নাম, দ্বিতীয়া দুর্ব্বাণী ॥
পতির হইল প্রিয়ে, দ্বিতীয়া কামিনী।
মনের হরিষে থাকে, দিবস যামিনী ॥
কিন্তু কি বিধির বিধি, অতি চমৎকার।
অবিদ্যা হইল সুখী, পাইয়া কুমার ॥
পুত্রগুণে পাইলেক, রাজ-অনুরাগ।
ঘুচিলেক দুর্ব্বাণীর, স্বামির সোহাগ ॥
পতির স্বভাবে অতি, মনে পেয়ে দুখ।
অভিমানে রাজরাণী, না দেখায় মুখ ॥
মনের বেদনে স্বামী, সদন ছাড়িয়া।
বিরল বিপিনে ভ্রমে, রোদন করিয়া ॥
বন্ধ্যারাণী একদিন, সন্ধ্যার সময়।
এক সরোবর তীরে, হইল উদয় ॥
দেখিল তথায় এক, শিশু সুকুমার।
বসিয়া তরুর তলে, চক্ষে বহে ধার ॥
শিশুর বদন দেখে, মোহিত মায়ায়।
ত্বরায় নিকটে আসি, সুধাইল তায় ॥

ধন্যরে পাষাণ তোর মায়ের পরাণ।
কেমনে তোমায় রেখে করেছে পয়ান॥
কোন অভিমানে বনে, কাঁদে যাদুধন।
এস এস কোলে করি জুড়াই জীবন॥
মা বলিয়া মনের বেদনা, কর দূর।
ওরে মোর বাপধন, বাপের ঠাকুর॥
যাহা চাহ তাহা তোরে, দিবরে এখনি।
তুমি মোর আঁধার ঘরের নীলমণি॥
কবির সরল ভাব, মন খল নয়।
দেবীর তনয় তাহে, সর্ব্বদা অভয়॥
রানীর বাণীতে অতি, মোহিত হইয়া।
মাম্মা বলি উঠে কোলে, গলাটি ধরিয়া॥
আধ আধ বোলে বলে, ওমা দুদু কাব।
চাঁদের সহিত আমি আকাশেতে যাব॥
ঈষৎ হাসিয়া রাণী, ছেলের কথায়।
গোপাল নাচেরে বলি, কবিরে নাচায়॥
আই আই চাঁদ আই, আই আই আরে
মণির কপালে মোর, চিক দিয়ে যারে॥
এরূপ সোহাগ করি, তুষিয়া তনয়।
পুলকে দুর্ব্বাণী রাণী, আইল আলয়॥
তখনি রাজার কাছে, গেল সমাচার।
ছোট রাণী পাইয়াছে, সুন্দর কুমার॥
শুনিয়া ভূপতি অতি, হরিষ হইয়া।
বিনা আয়াসের পুত্রে, দেখিলেন গিয়া॥
সুতের মোহন মূর্ত্তি, হেরিয়া নয়নে।
কোলে করি বসালেন, রাজসিংহাসনে॥
অসভ্যের অঙ্কে শোভিলেন, ভাল কবি।
ঈষৎ মেঘের কোলে, যেন বাল রবি॥
মন সুখে মহারাজ করি আশীর্ব্বাদ।
আপন শহর তারে, দিলেন প্রসাদ॥

সেই হোতে মিত্র, মিত্রতার প্রতি বাম।
ধরিলেন স্বেচ্ছায় শঙ্করে কবি নাম॥
এইরূপে কিছুদিন বিগত কবির।
দুর্ব্বাণীর গুণে দিব্য, হইল শরীর॥
একদা কবির ভাই, অবিদ্যা তনয়।
জননীর কোলে বসি, মৃদু ভাষে কয়॥
ওমা ওমা হেদে দেখ, দাদার এখন।
রাজভোগ খেয়ে দেহ, ফুলেছে কেমন॥
অবিদ্যা বলিল উহা, বলোনারে আর।
ও পোড়া কপালে কাল, হয়েছে তোমার॥
সব কথা শুনিতে না পেয়ে কবি ভাল।
মনে মনে কাল অর্থ, ভাবিলেন কাল॥
হইল বিষম মনে, অভিমান বোধ।
মায়ের নিকটে যান, দিতে প্রতিশোধ॥
ধীরে ধীরে কহিলেন. জননীর কাছে।
অবিদ্যা আমারে মাগো, কাল বলিয়াছে॥

দুর্ব্বানী

"কে তোমারে কাল বলে, ওরে, নীলমণি।"
অন্ধকার ঘরে তুই মানিকের খনি॥
মম ঘরকন্না যাদু, তোমা ধনে নিয়ে।
তুমি আছ তেঁই আছি, চালে মাথা দিয়ে॥
কেমন সুন্দর বাছা মায়ের দুলাল।
ব্রজের গোপাল মোরে, তুই রে গোপাল॥
নিজসুত মুখ নাহি, দেখে চোখখাগী।
তোমারে বলেছে কাল, কালামুখে মাগী॥
ইচ্ছা করে সতীনের, মুখে দিই ছাই।
ষাট ষাট কাল কেন আমার কানাই॥

গদ্য

এইরূপ, দুর্ব্বানী রানীকে জননী ও অসভ্যকে জনক সম্বোধন করিয়া কবিবর তাহাদিগের পরম স্নেহাস্পদ ও সমস্ত ঘরের সোহাগ হইয়া বলিল। অসভ্য রাজা

স্বীয় প্রাণপণে সুশিক্ষিত করিয়া আপনার ভার লাঘবের নিমিত্ত তৎপ্রতি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার ভার সমর্পণ করিল। এই সময়ে সভ্য নামক এক রাজা একদল সৈন্যের সহিত আগমন করত বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আপনার জয় পদবী বিস্তার করিতে লাগিলেন। যখন এই বিষম ক্লেশকর বার্ত্তা অসভ্যের শ্রবণগোচর হইল তখন সে অভিমানী হইয়া স্বকীয় প্রাণাধিক সন্তানকে আহ্বান করত কহিল, পুত্র তুমি না হইলে ইহার নিরাকরণের আর কোন সদুপায় নাই, অতএব সত্বরে গমন করিয়া সভ্যের সহিত সংগ্রাম কর, আমার আর এ-অপমান সহ্য হইতেছে না। কবিবর পিতৃআজ্ঞায় সম্মত হইয়া স্বীয় জননীর নিকট বিদায় লইতে গেলেন এবং বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, জননি প্রসন্না হইয়া অনুমতি করুন আমি জনকাদেশে দূরদেশে যুদ্ধার্থে গমন করিতেছি। কবিবরকে বহুকাল প্রতিপালন করিয়া দুর্ব্বাণীর মনে প্রগাঢ় প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল, সুতরাং সে তনয়ের ঈদৃশ অসম্ভাবিত প্রার্থনা শ্রবণে একান্ত অধীরা এবং শোকাকুলা হইল, এবং কোন ক্রমেই সম্মতা না হইয়া কুমারের সহিত বিদেশ যাত্রা করিল। অসভ্য-সুত, স্বীয় প্রসূতীর সহিত মহাসমারোহে সমাগত হইয়া হিন্দু কালেজে আপনার শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক এই ঘোষণা করিয়াছিল, আমি পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে আগমন করিয়াছি। যে ব্যক্তি আমার সহায় হইয়া সভ্য রাজাকে বিনাশ করিতে পারিবে, আমি তাহাকে কলিকাতা ও পিতৃ প্রসাদস্বরূপ দুর্ব্বাণীর করস্থিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিব।

লঘু ত্রিপদী

একদিন কবি, না উঠিতে রবি
গেলেন ভ্রমিতে পথ।
কি হইবে রণে, ভাবিছেন মনে,
আরোহিয়া চিন্তারথ॥
মুখে মৃদু হাসি, হেনকালে আসি,
উদয় হইয়া তথা।
চট্টো মহামতি, মৃদুভাবে অতি
কহিলেন এই কথা॥
ওহে মহাশয়, তব রণজয়,
জানিয়াছি আমি খাঁটি।

রচনা তোমার, অতি সুকুমার,
ভাবগুলী পরিপাটী ॥
বুনো কবি তার, না পাইবে তার,
আমরা বুঝিতে নারি।
বিশেষত কটু, কহিবারে পটু,
নহে সেই অধিকারী ॥
কভু কুবচন, করিলে শ্রবণ,
উঠে পলায়ন করে।
মানবের মাঝ, পাছে পায় লাজ,
এই ভয়ে ভেবে মরে ॥
যথা অধ্যয়ন, তার কোন জন,
কুকথা শোনে না কাণে।
বিশেষ পণ্ডিত, বিগুণে মণ্ডিত
গালাগালি নাহি জানে ॥
গুরু গুণ ভার, কবিলে প্রচার,
নিমিষ মাঝারে দেখি।
দেবতা যেমন, তাহার বাহন,
বিধাতা করেছে ঢেঁকি ॥
অতএব ভাই, গালি তুমি তাই,
মা বাপ তুলিয়া দেহ।
ঘৃণায় তোমার, কটু কবিতার,
উত্তর দেবে না সেহ ॥
করিয়া কৌশল, আশারূপ ফল,
পাইবেহে অনায়াসে।
নিজ দল সব, জয় জয় রব
করিবে তোমার পাশে ॥

পয়ার

শহুরে কবি

ভাল বলিয়াছ ভাই, সদুপায় বটে।
এবার করিব তাই, যদি রণ ঘটে ॥

আমার কশুর কিছু, নাই গত বারে।
কথায় কথায় কটু, কহিয়াছি তারে॥
সে যদি মানুষ হয় জ্ঞান থাকে তার।
আমার সহিত রণ, করিবে না আর॥

চট্টো

তাই তাই তাই বটে, অতি সুখময়।
এমন কবিতা আর, হইবার নয়॥
ভাগ্যে তুমি বেঁচে আছ, তাই ভাই মোরা
কবিতা দেখিতে পাই, মূর্খ মনচোরা॥
কিন্তু কবিবর আমি, তার ঠাঁই ঠাঁই।
তব মনোগত কটু, ভাব বুঝি নাই॥
কৃপা করি কহ স্বীয়, সরল স্বভাবে।
"শাখায় কুরঙ্গ তুমি, বলেছ কিভাবে॥

শহুরে

হা হা ভাই বুঝিতে, পারনি এই গাল।
এর ভাব ঠিক যেন, পাড়াগেঁয়ে ডাল॥
"শাখায় কুরঙ্গ আমি, এভাবে লোয়েছি।
কৌশল করিয়া মিত্র, বানর বোলেছি॥
আর এক ঠাঁই দেখ, করি অনুমান।
কহিয়াছি তারে আমি, বীর হনুমান॥
বুক চিরে রাম লিখে, কে বেঁধেছে ঋণে।
রামচন্দ্র, দীনবন্ধু, হনুমান বিনে॥

চট্টো

জ্ঞান কেন অধিকারী, কবিতা মাঝারে।
মোরে আদি কবি বলে, দ্বিতীয় তোমারে

শহুরে

তাহার কারণ তুমি, জাননারে ভাই।
একমন হয়ে তবে, শুন মোর ঠাঁই॥
দ্বিতীয় দুর্ব্বাণী রাণী, তাহার সন্তান।
তেকারণে দ্বিতীয় আমার অভিধান॥

বিশেষতঃ আমি অসভ্যের অতি প্রিয় ।
সোহাগে আমার নাম, থুলেন দ্বিতীয় ॥
আমার সহিত তব, প্রথম মিলন ।
আদি কবি বলে বুঝি এই সে কারণ ॥
কিম্বা তুমি আদিরস বিরচন কর ।
তেকারণে আদি কবি, অভিধান ধর ॥

চট্টো

বাহবা বাহবা, এ, যে, বুদ্ধি চমৎকার ।
শহরের মাঝে হেন, খুঁজে মেলা ভার ॥
তোমার সহিত কভু, না পারিবে বুনো ।
তার চেয়ে তুমি ভাই, বুদ্ধি ধর দুনো ॥
তবে কটু কথা আগে করিয়া রহিত ।
কোমল সরল ভাষে, সুধানো উচিত ॥
অভিলাষ যদি থাকে, থাকিবারে মানে ।
পরাজয় মেনে থাক, এসে এইখানে ॥
সহজে হইবে শেষ, সমরের ক্লেশ ।
ঈশ্বরের প্রেমলাভ করিবে বিশেষ ॥

শহুরে

বুনোরে যদ্যপি আমি বলি কুবচন ।
তাহাতে ঈশ্বর রুষ্ট হবে না কখন ॥
কারণ ভূলোক মাঝে, ইহা জানে কে না ।
ঈশ্বর আমার কাছে চিরকাল কেনা ॥

চট্টো

এই বিবেচনা তব, বড় ভাল নয় ।
ঈশ্বর নিকটে সম, তোমরা উভয় ॥
অতএব উপযুক্ত, ন্যায় পথে চলা ।
পরাজয় হেতু তারে একবার বলা ।

শহুরে

নেহাত্ না ছাড় যদি, ওহে কবি ভাই ।
দেখ দেখি একবার, সুধাইয়া তাই ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী

ভ্রমণের অভিলাষি, হেনকালে তথা আসি
উদয় হইল বুনো কবি।
দেখে তারে কবিবর, নিজ রোষে করি ভর,
গেলেন খাইতে যেন রবি॥
নিরুপায় অধিকারী, পালাইতে নাহি পারি
বড় ঘোর সঙ্কটে পড়িল।
ভয়েতে হইয়া নত, নীচের লিখিত মত
মিত্রে স্তব করিতে লাগিল॥

মিত্রের স্তোত্র

জয় জয় দিনপতি, সুদীন জনের গতি
দীনবন্ধু দয়ার সাগর।
জগতের তমোহারী, অশেষ সুগুণধারী,
কমলিনী সতীর নাগর॥
সব-গুণ কব কায়, হিংসাহীন তব কায়,
দাতা নাই তোমার সমান।
পূরাতে নরের আশ, আপন নারীর বাস,
করিয়াছ সবাকারে দান॥
যখন সুখের তরে নিজ বন্ধু রাথ করে
মধুকরে মধু করে পান।
ইহাতে তোমার কভু, মনে দ্বিধা নাই প্রভু
তাই তুমি দেবের প্রধান॥

—

দেহ ধর তেজোময় ত্রিলোকে নাহিক ভয়,
অতিশয় বলী তুমি বটে।
মল মূত্র যত পাও, করেতে তুলিয়া যাও
যেই দিন যেথানে যা ঘটে॥
তথাপি না মেটে খাই, সদা কর খাই খাই
মহাব্যস্ত পেটের লাগিয়া।

চড়ি এক চক্ররথে, বেড়াও আকাশপথে
সদাকাল আহার খুঁজিয়া ॥
ছাড়িয়া সমুদ্র সুধা, হরিতে পেটের ক্ষুধা,
বিনাশিলে বৃক্ষের পরাণ।
ইহাতে তোমার প্রভু, মনে দ্বিধা নাই কভু
তাই তুমি দেবের প্রধান ॥

—

সিংহ সহ রণ করি, তাহার জীবন হরি
অশ্বিনীর উপর চড়িয়া।
আইলে কন্যার পাশ, পূরাইতে অভিলাষ,
একমাস তথায় রহিয়া ॥
কিন্তু সে লাজুক মেয়ে, তোমার বদন চেয়ে
নাহি দিল স্বকীয় সম্মতি।
তথাপি আপনি ছলে, তাহাকে ধরিয়া বলে,
কোলে করি তুষিলে স্বমতি ॥
তবে এই মহাযশ, প্রবেশিল দিগ্‌দশ
সবে তব গুণ করে গান।
ইহাতে তোমার কভু, মনে দ্বিধা নাই প্রভু
তাই তুমি দেবের প্রধান ॥

—

মহাশয় নিজে খর, তাহে সদা গুণ ধর,
ক্ষীণ মোরা কি বলিতে পারি।
কন্যাসহ করি বাস, না পূরিল অভিলাষ,
পরিশেষে হরিলে পুমারী ॥
মন সুখী হতে অতি, হোলে কুমারীর পতি
কিন্তু নাহি কুলালেন কালী।
স্বরূপ স্বগুণ যুত, অনেক ত্বদীয় সুত
তোমার সে গুড়ে দিল বালী ॥
দুই চোকে লাজ নাই, পিতাপুত্রে এক ঠাঁই,
মদন আহুতি দিলে দান।

ইহাতে তোমার কভু, মনে দ্বিধা নাই প্রভু,
তাই তুমি দেবের প্রধান ॥

কায়স্থ কিরণে তব, যত গুণ অনুভব,
কে পারে করিতে এই ভবে।
একা ধর সাত বর্ণ, বল বলি কোন্ বর্ণ
কর্ণ তাত কর্ণ দেহ রবে ॥
ভূতের প্রধান তুমি, তবাধীন জলভূমি,
আকাশ পবন আদি করি।
সুতের পূরাতে আশ, বিমানে করিয়া বাস,
লহ লোক পরমায়ু হরি ॥
বানর বগলে মিত্র, ত্রেতায় করিয়া চিত্র,
ধরিয়াছ মিত্র অভিধান।
ইহাতে তোমার কভু, মনে দ্বিধা নাই প্রভু
তাই তুমি দেবের প্রধান ॥

হে মিত্র, বারম্বার এরূপ বিচিত্র করিয়া আর স্বীয় কালেজের সুখ্যাতি বিস্তার করিবেন না, ঈশ্বরের পরম পবিত্র প্রেমলাভ বিষয়ে যত্নবান হউন। আমি আপনার রাজ্য যে অভিপ্রায়ে আক্রমণ করিয়াছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া আপনি স্বীয় রচনা মধ্যে কতকগুলী কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, সে ভালই, রাহু সূর্য্যদেবকে গ্রাস করিলে তাহার মানের হানি হয় না, বরং রাহুকে সকলে ঘৃণা করে। আপনি অসভ্যতা বিষয়ে উত্তমরূপ সুশিক্ষিত হইয়াছেন, ও বিষয়ে আপনার সহিত সংগ্রাম করা মাদৃশ লোকের উপযুক্ত নহে, অতএব বিনীতভাবে নিবেদন সাম্প্রতি আর ঈদৃশ দুর্ব্বাক্যবাণ প্রহার করিবেন না, আমি বিশেষরূপ জ্বালাতন হইয়াছি, ভাবিয়া দেখুন ইহাতে উভয়েরই মূঢ়তা প্রকাশ ব্যতীত অন্য কোন গৌরব নাই, যদি পুনরায় আপনি এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন, আমি তাহার উত্তর প্রদান না করিয়া কেবল করুণাকর ঈশ্বরের নিকট এই মাত্র কহিব, যথা "নীচ যদি উচ্চভাবে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"।

শ্রীদ্বারকানাথ অধিকারী।
কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র।

কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের সন্ধিপত্র

পরমেশ্বর কি করুণাকর! তিনি আমাদিগকে পরাধীন করিয়াও সর্ব্ব প্রকারে স্বাধীন রাখিয়াছেন। অস্মদাদির সদসৎ কর্ম্ম সকল পরীক্ষা করিতে অন্যের বিচার সাপেক্ষ করে না, আমরা আপনারাই তত্তদ্বিষয়ের সুবিচার করিতে পারি, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে স্বতই আমাদিগের মন সন্তোষরূপ স্নিগ্ধ সলিলে প্লাবিত হয়। কিন্তু রিপুগণের পরামর্শ ক্রমে কোন লোক বিনিন্দিত গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে যদিও আপাততঃ অসুখ বোধ না হয় তথাপি কিয়ৎকাল পরেই দুঃখরূপ প্রদীপ্ত দাবানলে শরীর কানন দগ্ধ করিতে থাকে। বর্ত্তমান কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রকৃত প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। আমি রাগান্ধ হইয়া প্রথমতঃ পবিত্র মিত্রদ্বয়ের সহিত বাক্ বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি, এই ঘৃণিত বিবাদের সূত্রপাত আমা হইতেই হয়, এজন্য আমি ইহাতে সংপূর্ণ দোষী তাহা স্বীকার করিয়া উক্ত কবি ভ্রাতা দ্বয়ের বিশেষতঃ মিত্র মিত্রের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি। মিত্র বাবু লিখিয়াছেন এক হাতে কখনই তালি বাজে না "ইহাতেই বোধ হইতেছে যে তিনিও আপন দোষ জানিতে পারিযাছেন। আমি ভ্রমেও একবার আপনাকে প্রধান বলিয়া গণ্য করি নাই, বরং ক্ষণকালের নিকট মদীয় মনঃপ্রদেশের মধ্যে দ্বেষের প্রতিভা মাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমি কি কারণে দ্বেষ করিব ইহা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই জানিতে পারিবেন। দীনবন্ধু বাবু আমার শেষ লিখিত স্বপ্নটাকে যখন বিচার বিরুদ্ধ বিবেচনা করিলেন তখন কি মিত্রভাবে তাহার ভ্রম সংশোধন করিতে পারিতেন না? মহাশয় যদিও প্রধান তথাপি লোকের নিকট আত্মগুণ শ্লাঘা করিয়া বলা কি উচিত? আমি আপনা-দিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রথম প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম কিন্তু আলাপ করিতে গিয়া অদৃষ্ট ক্রমে বিষমতর বিলাপ উপস্থিত হইল।

"চাহিয়া অমৃতফল, পাইলাম হলাহল,
খুঁজিয়া সকল রত্ননিধি॥

মহাশয় প্রথম কবিতায় লিখিয়াছিলেন।

আঁখি মুদে ভাব গিয়া আপনার স্থানে।
কেন চেয়ে কানা হও বিভাকর পানে॥

সংবাদপ্রভাকর ১৯ মাঘ ১২৬০ ৩১ জানুআরি ১৮৫৪ মঙ্গলবার।

স্বপনের বিবরণ বুঝিয়াছি সার।
দিও না দ্বেষের ফুট নয়নেত আর॥
নিজ গুণে নিজ আভা না হোলো প্রবল।
পর আভা ঢাকা দিলে কি হইবে বল॥

হা দীনু বাবু। ইহাতে কাহাকে আত্মাভিমানী বুঝায়, আমি কি আত্মাভা প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া আপনাদিগের বিমলকর সমূহ প্রকাশ বিষয়ে প্রতিবন্ধক হইয়াছিলাম না দ্বেষাদ্বেষি করিয়া নিন্দাবাদ করিয়াছিলাম? এ সকল বিষয়ের বিচার আপনারাই করুন। মহাশয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রিকায় যে সকল গালাগালি দিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। কারণ সে সমস্ত কথা রসনাগ্রে আনা অনুচিত, বিশেষ মহাশয়ের দোষ দর্শাইয়া ভৎর্সনা করা আমার অভিলাষ নহে। বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষেরই অনিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বকৃত দোষসকল মার্জ্জনা করিয়া মাম্প্রতি নামের গুণ ব্যক্ত করিলে পরম পরিতুষ্ট হই। আমারদিগের হুগলি কালেজীয় নবীন সুকবি শ্রীযুত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এ বিষয়ে আমি সংপূর্ণ অপরাধী নই। তিনি স্বীয় মনঃকল্পিত দোষে আপনাকে কলঙ্কিত বোধ করিয়া মধ্যে একবার হানা দিয়া নানারূপ কটু কহিয়া গিয়াছেন। প্রথমে বোধ ছিল বঙ্কিমবাবু যুদ্ধবিষয়ে বিশেষ পারদর্শী নন। কিন্তু সে দিবসের বিক্রম দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশারদ বলিয়াছেন। এ দেশে অনেকেই কহিয়া থাকেন "যে গরুটা দুধ দেয় সে চাট মারিলেও সহ্য হয়" বঙ্কিমবাবু সুকবি, বিশেষ সুবোধ, তাঁহার কথায় রাগ করিবার বিষয় কি? যদিও গালাগালি বিষয়ে কবিভ্রাতার নিকট সংপূর্ণ অপরাধী নই তথাপি তিনি আমাব অন্যান্য দোষ পাইয়া থাকিবেন। যাহা হউক, তাঁহার নিকটেও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, এবং বোধ করি তিনি অবশ্যই আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। আমরা কবিতা বিষয়ে তিনজনেই একজনের শিষ্য। ইহাতে পরস্পর কলহ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে, বরং অন্য কাহারো সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনমনে ঐক্য হইয়া তাহার নিরাকরণ করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমি আপনাদিগের মিত্রতালাভের নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইয়া অদ্য এই সন্ধিপত্র প্রেরণ করিতেছি, মহাশয়েরা কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক এ দীন অপরাধির দোষ সকল মার্জ্জনা করত প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইয়া পরম-বাধিত করিবেন, সুকবি মহোদয়েরা দুর্গন্ধ পঙ্ক পরিহার পূর্ব্বক তজ্জনিত পঙ্কজ লইয়াই আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন, আপনারা উভয়েই

সুকবি। অতএব মল্লিখিত পঙ্কস্বরূপ দুর্গন্ধ দোষ সকল পরিহার পূর্ব্বক অবশ্যই সদুপদেশ রূপ সরোরুহ গ্রহণ করিবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ অধিকারী।
৮ মাঘ
কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র।

কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী

রংপুরের কুণ্ডী পরগনার জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর নাম বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। সংবাদপ্রভাকর পত্রিকার কবিতা-প্রতিযোগিতায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু এবং দ্বারকানাথ অধিকারীকে পুরস্কৃত করেছিলেন—শুধু এই জন্যেই নয়। বাংলা সাহিত্যের উন্নতিসাধনে ও সামাজিক সংস্কারসাধনে তাঁর যথেষ্ট দান ছিল। তিনি নিজে সুকবি ও সুলেখক ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা করেছেন।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার বুকানন লক্ষ্য করেছিলেন, রঙপুরে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অন্যায় ও শাস্ত্রবিরোধী মনে করা হত। রঙপুর বার্তাবহ স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিল। গোপালপুরে প্রথম বালিকাবিদ্যালয়ে স্থাপিত হলে কুণ্ডীর জমিদারের শিক্ষিত কন্যা শিক্ষিকার কাজ নেয়। বালিকাদের পাঠ্যপুস্তক রঙপুরেই প্রথম প্রবর্তিত হল। কুণ্ডীর কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী পাতিব্রত্য সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনার জন্য পঞ্চাশটাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে পতিব্রতোপাখ্যান নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।[১]

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নবেম্বর সংবাদপ্রভাকরে এই সম্পর্কে কিছু মন্তব্য এবং বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়—

'রঙ্গপুরস্থ কুণ্ডী পরগণার ভূম্যধিকারি দেশহিতৈষি-বিদ্যানুরাগী শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের সদ্‌গুণসূচক বৃত্তান্ত বৃহৎ আমরা বারম্বার এই প্রভাকর পত্রে প্রকটন করিয়াছি। তৎপাঠে তাবতেই তন্মহাত্মাকে বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন সুতরাং পুনরুল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। ঐ মহাশয় সংপ্রতি রঙ্গপুর বার্তাবহ পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম।

১ *Eastern Bengal and Assam District Gazetteer*, Rangpur, 1911, p. 135

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞপ্তি ৫০ টাকা পারিতোষিক।

বঙ্গীয় ভাষায় প্রবন্ধ রচনা।

এই বিজ্ঞপ্তি পত্রদ্বারা সর্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে যিনি "পতিব্রতোপাখ্যান" ইত্যাভিধেয় এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সংকল্পিত ৫০ পঞ্চাশটাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক স্ত্রীজাতি স্বপতির মতাৰলম্বিনী হইয়া দেহযাত্রা নির্বাহ করণে দম্পতী প্রীতি বর্ধন হওতঃ সৃষ্টিপ্রবাহের প্রতি প্রতিবন্ধকতা ছেদনপূর্বক কি নিগূঢ় ইষ্ট ফলোৎপত্তি হইতে পাবে। তদন্যথাতেই বা কি অনিষ্টতা অথবা শান্তির ব্যাঘাত জন্মে? বিবিধ প্রমাণ ও বিহিত সৎযুক্তির দ্বারা প্রবন্ধ মধ্যে ইহাই প্রতিপন্ন করা প্রশ্নকর্তার মূলাভিপ্রেত। রচক মহাশয়েরা আগত আষাঢ় মাস শেষ না হইতে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধ রীতি মত প্রেরণ করিবেন।

রঙ্গপুর — শ্রীকালীচন্দ্র রায়চৌধুরী

বঙ্গাব্দা ১২৫৮ সাল — কুণ্ডী পং জমিদার

তারিখ ৬ কার্তিক।

অতঃপর ১৮৫২-র ২৮এ আগস্ট-এর সংবাদপ্রভাকরের সংবাদে জানা যায় কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্ন ওই পুরস্কার পেয়েছেন।—

'রঙ্গপুর বার্তাবহ পত্রে দৃষ্ট হইল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের স্বীকৃত ৫০ টাকা পারিতোষিক লাভাকাঙ্ক্ষায় যে সকল মহাশয়েরা 'পতিব্রতোপাখ্যান' প্রসঙ্গে প্রবন্ধ রচনা পূর্বক পেবণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যায়ি শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ শর্মার রচিত পুস্তকই সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। যে হেতু তদীয় পুস্তক পরিমাণে অন্যান্যাপেক্ষা বৃহৎ হইয়াছে এবং তিনি নানা পুরাণ উদ্ধৃত রচনা দ্বারা স্বীয় যুক্তির দার্ঢ্য দর্শাইয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহার রচনাশক্তি উত্তমা হইয়াছে অতএব পারিতোষিকের পঞ্চাশ মুদ্রা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

কালীচন্দ্র নিজে দুখানা বই লিখেছিলেন—গীতমালা এবং স্বভাবদর্পণ। এ ছাড়া 'কাব্যসেবধি' নামে কাব্যতত্ত্বের একখানা বই তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। তার উপক্রমণিকাও সংবাদপ্রভাকরে ছাপা হয়েছিল, কিন্তু খুব সম্ভবত শেষ পর্যন্ত বইখানা প্রকাশিত হয় নি।

কালীচন্দ্রের অনেক গান সংবাদপ্রভাকরে মাঝে মাঝেই বেরিয়েছে।[১] তিনি প্রধানত শাস্তরসাশ্রিত চতুষ্পপংক্তিক গানই লিখতেন। তাঁর রচিত টপ্পাও ছিল। ১৮৫৩-র ২৩ এ ফেব্রুয়ারি A cento of proverbs—দৃষ্টান্তশতকং—একশত দৃষ্টান্ত নামে ছয়টি স্তবকের চৌপদী প্রকাশ করেন। ২৭ মে ১৮৫২ ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদপ্রভাকরে লিখলেন,

'রঙ্গপুরস্থ কুণ্ড্যধিপতি গুণাকর কবিবর শ্রীযুত বাবু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের বিরচিত কতিপয় কাব্যরসঘটিত গীত তত্রস্থ দেওয়ানী আদালতের উকীল শ্রীযুত বাবু ব্রজসুন্দর বিশ্বাস কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া আমারদিগের প্রভাকর যন্ত্রে অতি উত্তমাক্ষরে ও উত্তম কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে। সংগ্রহকর্তা উক্ত গীতমালা নামক গ্রন্থ পাত্র বিশেষে বিনামূল্যে বিতবণ করণের অনুমতি করিয়াছেন।'

এই সঙ্গে গীতমালার দুটি গানও উদধৃত করলেন। ওই বছরের আটই জুনের বিজ্ঞাপনে জানা যায় যে গীতমালা ফুরিয়ে গিয়েছে। কালীচন্দ্রের স্বভাবদর্পণ[২] ১৮৫২-র জুলাই মাসে বের হয়। বইখানা নীতিমূলক রচনা। ভূমিকায় বলা হয়েছে পরমেশ্বর বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান লাভ করে ধার্মিক ও সুশীল হতে পারে সেইজন্যই বইখানা লেখা হয়েছে। কোনো প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থের অভিপ্রায় সঙ্কলন পূর্বক বাংলা ভাষায় করা হয়েছিল। বইখানা সাত ভাগে বের করবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বোধহয় একটিই খণ্ড প্রকাশিত হয়।

কালীচন্দ্র 'কাব্যসেবধি' নামে একটি বই করবেন বলে পরিকল্পনা করেছিলেন। বস্তুত বইটি ছাপতেও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫২-র ২৬ এ আগস্ট সংবাদ-প্রভাকরে একটি চিঠি দিয়ে তিনি জানান কাব্যসেবধি রচনা করতে করতে কিছু 'উৎকর্ষ বিষয়' বেরিয়েছে। যেহেতু এখন সেগুলি পুনর্বিন্যাস করা সহজ নয়, সেজন্য পূর্ব কথামত তিনি বই ছাপতে দিতে পারছেন না। কালীচন্দ্র কাব্য-সেবধির উপক্রমণিকা ১৪ জুলাই ১৮৫২-র সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশ করেন—

'সংস্কৃত শাস্ত্রের নিয়মানুসারে শ্রুতবোধ ছন্দমঞ্জরী বৃত্তরত্নাবলি সাহিত্যদর্পণ কাব্যপ্রকাশাদি গ্রন্থের ন্যায় বঙ্গভাষায় এরূপ কোন গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না, যাহা বাঙ্গালা কবিতা রচকদিগের পথদর্শক রূপে গণ্য হইতে পারে। অনেকেই

১ দ্রষ্টব্য সংবাদপ্রভাকর ১০ মার্চ, ২৪ মার্চ, ১৫ মে, ১ জুলাই ১৮৫২ ; ৭ অকটোবর ১৮৫৩ ; ১১ জুলাই ১৮৫৪ প্রভৃতি।

২ জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি 'স্বভাবদর্পণ' আছে।

কুসংস্কারপরতন্ত্র হইয়া অম্লানবদনে উক্তি করিয়া থাকেন, গৌড়ীয় ভাষায় কবিতা রচনা করণে শক্তির প্রয়োজন করে না। তাহাতে লঘু গুরু বর্ণের বিচার নাই কোনরূপে মিতাক্ষরে মিল দিলেই হয় কিন্তু আমি এ কথা কোনরূপেই স্বীকার করিতে পারি না, বিশেষতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বাঙ্গালা কবিতাতেও যোতি দোষ [যতিদোষ] লঘু গুরু বর্ণের দোষে কবিতা সতী লাবণ্যহীনা দৃষ্ট হয়, অতএব আমি বহুকাল যাবৎ পর্যালোচন করিয়া সম্প্রতি গৌড়ীয় ভাষায় 'কাব্যসেবধি' ইত্যভিধেয় এক গ্রন্থ প্রযুক্ত করিতেছি। ইহাতে কবিতার দোষগুণ ও কবিতা চেনা করণের প্রণালী এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের মূল ও স্থূলভাগ সমুদয় বিস্তারিত রূপে লিখিত হইবেক এবং উদাহরণ স্বরূপ এক ২ টী কবিতা প্রদর্শিত হইবে। এই পুস্তক আগামি শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজার অব্যবহিত পরেই যন্ত্রারূঢ় হইবেক।'

এই সঙ্গে কালীচন্দ্র পরিকল্পিত বইয়ের নমুনাস্বরূপ পয়ার আলোচনার খানিকটা অংশ তুলে দেন।

"পয়ার রচনা করিবার ধারা

…অনেকের এই কুপ্রবোধ আছে চতুর্দশটী অক্ষর হইলেই পয়ার ছন্দের কবিতা হয়। বস্তুতঃ তাহা নহে অনেক স্থানে দৃষ্ট হয় চৌদ্দটী অক্ষর বর্তমানের কেবল বর্ণের শক্তির ব্যতিক্রমে ছন্দভঙ্গ ও তজ্জন্য শ্রুতিকটু হইয়াছে যথা।

তথাপি মদনরসে হইয়া বিভোল।
পাণ্ডু না শুনিলেন মাদ্রীর যত বোল॥

এই স্থলে শেষ চরণে চৌদ্দটী অক্ষর থাকিয়াও বর্ণের লঘুত্ব ও গুরুত্ব জন্য ছন্দপাত দোষে জড়িত হইয়াছে অতএব চৌদ্দটী অক্ষর হইলেই যে কবিতা হয়, তাহা নহে বর্ণপুষ্প যথানিয়মে গ্রথিত না হইলেই কবিতামালা আদরহীনা হয় এবং তদ্বিপরীতে সুরচনা হইলে সমাদৃতা হয় যথা।

গুরুবাক্য তখনি টানিয়া ধনুর্গুণ
পক্ষিপ্রতি দৃষ্টি করে রহেন অর্জুন॥"

দুঃখের বিষয় কাব্যসেবধি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সন্ধান করে বইটি পাওয়া যায় নি। বইটি প্রকাশিত হলে লালমোহন বিদ্যানিধির পূর্বেই আমরা বাংলা ছন্দ-অলংকারের একটি বই পেতাম।

কালীচন্দ্র ১২৬১ সালের ২৪ এ ফাল্গুন মৃত্যুমুখে পতিত হন। সংবাদপ্রভাকরে (১৭ মার্চ ১৮৫৫। ৫ চৈত্র ১২৬১) এই খবর ছাপা হয়।

'রঙ্গপুর বার্তাবহ পাঠ করত বিপুল বিলাপসাগরে নিমগ্ন হইয়া রোদন বদনে প্রকাশ করিতেছি জিলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি কুণ্ডীপরগণার বিখ্যাত ভূম্যধিকারি বাবু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় গত ২৪ ফাল্গুন বুধবার রাত্রিযোগে এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত যোগ্যধামে যাত্রা করিয়াছেন। এই মহাত্মা সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ বহুগুণ বিশিষ্ট দেশহিতৈষী পুরুষ ছিলেন। ইহার অভাবে সর্ব্বত্রই হাহাকার রব উঠিয়াছে।'

২০-এ মার্চ ১৮৫৫র সংবাদপ্রভাকরে সম্পাদকীয়তে ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন—

'এই মহাশয় কি মহাত্মা ছিলেন, ইনি এক অমূল্য রত্ন ছিলেন, সংবাদপত্র বিদ্যালয় সাধারণ হিতকর ব্যাপার এবং সভা প্রভৃতির উন্নতিসাধন পক্ষে কত চেষ্টা কত যত্ন ও কত পরিশ্রম করিতেন, দেহের দ্বারা মনের দ্বারা ও ধনের দ্বারা আনুকূল্যের ত্রুটি করিতেন না, ইনি সুকবি ও সংগীতবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন, সকল প্রকার বিদ্যার সমাদর করিতেন, সকল বিদ্যাতেই কিছু কিছু সংস্কার ছিল। সদ্বিদ্বান্ ও সৎকবি এবং গুণি ব্যক্তি লইয়াই সর্ব্বদা আমোদ করিতেন, "রঙ্গপুর বার্তাবহ" নামক সংবাদপত্র প্রকাশপূর্বক রঙ্গপুরের গৌরব কত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন...'

কালীচন্দ্রের একটি সঙ্গীত—"রঙ্গপুরস্থ কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুর প্রেরিত একটী সংগীত" (সংবাদপ্রভাকর ৭ অকটোবর ১৮৫৩)

রাগিনী কেদার

তাল ঠেকা

তবে কায কি প্রণয় বাড়াইয়ে
যদি দিয়ে যাক মন পরেরে সঁপিয়ে।
বলনা ললনা তবে ছলনা কি করে হবে
মিছে তবে কান্দি কেন অরণ্যে বসিয়ে॥

কবিতাসংগ্রহের সূচী

প্রথম খণ্ড

নৈতিক ও পরমার্থিক

দ্বিতীয় খণ্ড

সামাজিক ও ব্যঙ্গাত্মক

তৃতীয় খণ্ড

ঋতুবর্ণন

চতুর্থ খণ্ড

যুদ্ধবিষয়ক

পঞ্চম খণ্ড

বিবিধ বিষয়ক

ঘটনাপঞ্জী

১৮১২	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম
১৮১৭	হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা
১৮১৮	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য-সম্পাদিত বাঙ্গাল গেজেট
১৮২০	কবিওয়ালা লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের মৃত্যু
১৮২২	ঈশ্বর গুপ্তের মাতৃবিয়োগ এবং কলিকাতায় বাস
১৮২৪	হরুঠাকুরের মৃত্যু
১৮২৫	নীলু ঠাকুরের মৃত্যু
১৮২৬	ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত
	প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ
	হিন্দু কলেজে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজি
১৮২৭	ঈশ্বর গুপ্তের বিবাহ
১৮২৮	রাম বসুর মৃত্যু
	অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন
১৮৩০	ধর্মসভাস্থাপন
	নববিশিষ্ট শিষ্টগণসভা
	ঈশ্বর গুপ্তের পিতৃবিয়োগ
	ডাফের বক্তৃতামালা
১৮৩১	সংবাদপ্রভাকর প্রকাশ
	হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিও অপসারিত
	ডিরোজিওর মৃত্যু
	ঠাকুরবাড়িতে প্রেস
১৮৩২	সংবাদপ্রভাকর বন্ধ
	চন্দ্রকুমার ঠাকুরের মৃত্যু
	হাফআখড়াই প্রবর্তন
	যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যু
	সংবাদরত্নাবলী প্রকাশ
১৮৩৩	রামপ্রসাদ সেন-রচিত কালীকীর্তন প্রকাশ
	ঈশ্বর গুপ্তের কটক গমন (১৮৩৬ পর্যন্ত)

১৮৩৬ বারত্রয়িক সংবাদপ্রভাকর
বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভা
১৮৩৮ সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা স্থাপন
বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয়
১৮৩৯ দৈনিক সংবাদপ্রভাকর
বারাসত স্কুল কমিটি
রামনিধি গুপ্তের মৃত্যু
বাঙ্গালা ভাষানুশীলনী সভা
তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন এবং ঈশ্বর গুপ্ত সভ্য মনোনীত
অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য
১৮৪২ বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকা প্রকাশ
নীতিতরঙ্গিণী সভা
তত্ত্ববোধিনী সভায় ঈশ্বর গুপ্তের বক্তৃতা
দেশহিতৈষিণী সভা
১৮৪৩ রঙ্গলালের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয়
হিন্দু থিয়ফিলানথ্রপিক সভা
১৮৪৬ ঈশ্বর গুপ্তের রাজশাহী ভ্রমণ
পাষণ্ডপীড়ন প্রকাশ
১৮৪৭ সংবাদসাধুরঞ্জন প্রকাশ
১৮৪৮ ঈশ্বর গুপ্তের দ্বিতীয়বার উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ
১৮৪৯ উত্তর ভারত ভ্রমণে যাত্রা
কাশীতে মনোমোহন বসুর সঙ্গে কবির লড়াই
১৮৫০ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন (ডিসেম্বর মাসে)
১৮৫১ লেকস্ লোসি
১৮৫২ সংবাদপ্রভাকরে বঙ্কিমের প্রথম কবিতা প্রকাশ
১৮৫৩ সংবাদপ্রভাকরের মাসিক সংস্করণ
—১৮৫৪ কবিতাযুদ্ধ
বঙ্কিমচন্দ্রের পুরস্কার লাভ
—১৮৫৫ সংবাদপ্রভাকরে কবিজীবনীমালা প্রকাশ

১৮৫৪	বেহালা হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা
	উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যাত্রা
১৮৫৫	ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ
১৮৫৬	বিধবাবিবাহ আইন
	অশ্লীলতা-বিরোধী আইন
	বঙ্কিমচন্দ্রের 'ললিতা ও মানস' প্রকাশ
১৮৫৭	সিপাহিযুদ্ধ
	প্রবোধপ্রভাকর
	সংবাদপ্রভাকরে বোধেন্দুবিকাশ
১৮৫৯	ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু (২৩ জানুয়ারি)
১৮৬১	হিতপ্রভাকর
১৮৬২	—১৮৬৪ কবিতাবলীর সারসংগ্রহ খণ্ডশঃ প্রকাশ
১৮৬৩	গ্রন্থাকারে বোধেন্দুবিকাশ
১৮৬৯	কবিচরিতে ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী
১৮৮৫	নবজীবনে দেবেন্দ্রবিজয় বসুর প্রবন্ধ
	বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত কবিতাসংগ্রহ

নির্দেশিকা